...

ডারউইন
একুশ শতকে প্রাসঙ্গিকতা
এবং ভাবনা

সূ চি

আলী আসগর/ চার্লস ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্বের উদ্ভব ও প্রভাব

এ. এম. হারুন অর রশীদ/ ডারউইনের বিবর্তনভিত্তিক জীবনবৃক্ষ

দ্বিজেন শর্মা/ ডেভিলস্ চ্যাপলিন

বন্যা আহমেদ/ জৈববিবর্তন—বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি

মাহবুবুর রহমান/ প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব কি ভেঙ্গে পড়েছে

আসিফ/ অরিজিন অব স্পিসিজ : মানব জাতির জন্য আলোর ঝলক

মনিরুল ইসলাম/ জৈববিবর্তন তত্ত্ব এত প্রয়োজনীয় কেন

বিরঞ্জন রায়/ জৈববিবর্তন তত্ত্বের আলোকে চিকিৎসাবিজ্ঞান

অভিজিৎ রায়/ ফ্রেড্রিক হয়েলের বোয়িং ৭৪৭

থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি/ জৈববিবর্তনের বোধ ব্যতীত জীববিজ্ঞানে কোনো কিছুই অর্থবোধক নয়

বারবারা ফরেস্ট/ ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও লক্ষ্য : একটি অবস্থানপত্র

অনন্ত বিজয় দাশ/ ঈশ্বর বিশ্বাস বনাম জৈববিবর্তন পাঠ

চার্লস ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্বের উদ্ভব ও প্রভাব

আলী আসগর*

জীববিজ্ঞানে যত তত্ত্ব আছে সেসবের মধ্যে ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্ব (বা প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব) সবচেয়ে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে ও নানা বিতর্কের অবতারণায়। উদ্ভিদ ও জীবজগৎ নিয়ে যে জীববিজ্ঞান সেখানে এমন সব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় বিজ্ঞানীদের যার জবাব-সন্ধান প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। যেমন জীবনের উদ্ভব কেমন করে হল? আমাদের এই পৃথিবীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো জীবন কি উদ্ভূত হতে পারে জড় বস্তু থেকে? যদি আমরা সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে ও তার বিশ্লেষণে এই প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজি, স্বভাবতই উত্তর আসবে শুধু জীবন থেকেই শুধু জীবন উৎপন্ন হতে পারে। জড় বস্তু থেকে জীবন সম্ভব নয় পৃথিবীর বর্তমান পরিবেশে। কিন্তু আমাদের গতানুগতিক সব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সংঘটিত হয় স্বল্প সময়ের পরিসরে।

জীববিজ্ঞানীরা যদি প্রশ্নটি বদলে নেয় এইভাবে যে পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে বিপুল কালের পরিসরে জীবনের উদ্ভব ও রূপান্তর কি সম্ভব? সেই সঙ্গে আমরা যদি পৃথিবীর পরিবর্তনশীলতা ও এর পরিবেশের রূপান্তরের উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করি ভূবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান এমনকি সমাজবিজ্ঞান থেকে, তখন একই প্রশ্ন অনেক গভীর ও জটিল হয়ে উঠে। এর উত্তরটাও বদলে যায়। ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব বুঝতে হলে সেই ব্যাপকতর পটভূমিতেই একে যাচাই করতে হবে।

আমরা লক্ষ্য করব ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের উদ্ভাবন নানাদিক থেকে ভিন্ন এর আবিষ্কারের পটভূমি, পদ্ধতি ও ব্যাপকতার বিচারে। এই তত্ত্বের ধারণা লাভের আড়ালে প্রচুর অভিজ্ঞতা, দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি, পরিব্যাপ্ত কালিক-চেতনা, জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে সংগৃহীত ধারণার সমন্বয় এবং সর্বোপরি একটি সৃজনশীল সত্ত্বা কাজ করেছে। বিজ্ঞানের গবেষণায় বিষয় নির্বাচনে আমরা সাধারণতঃ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের এলাকাকে সংকীর্ণ করে ফেলি গভীরতা ও সূক্ষ্মতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। কারণ গবেষণায় বস্তু ও বিষয় যত সূক্ষ্ম ও নির্বাচিত হয় তত সুসম অবস্থায় কার্যকারণ সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব গভীর ও সূক্ষ্মভাবে। কিন্তু ডারউইনের বৈজ্ঞানিক সমস্যার স্বরূপ ছিল ভিন্ন। নির্বাচিত স্থানে সংকীর্ণ কালের পরিসরে

* ড. আলী আসগর : অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

এমনকি প্রচলিত পদ্ধতি ও পূর্বধারণার ভিত্তিতে প্রাণের উদ্ভব ও প্রাণী জগতের বৈচিত্র্যের রহস্যোদঘাটন সম্ভব ছিল না।

ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্ব শুধু দীর্ঘ অতীত ও বিশাল স্থানিক পরিসর, নানা ধরনের প্রাণী ও জ্ঞানের ও গবেষণার বিভিন্ন বিষয়কেই অন্তর্ভূক্ত ও সমন্বিত করেনি, বিবর্তনের ধারণাকে ছড়িয়ে দিয়েছে জীববিজ্ঞানের বাইরে জ্ঞানের বিচিত্র নানা শাখায়। শুধু দীর্ঘ অতীতকেই ব্যবহার করেনি, পুরানো প্রশ্নের জবাব খুঁজে, অনাগত ভবিষ্যতকেও ধারণ করেছেন নতুন প্রশ্ন ও বিতর্কের অবতারণা করে। বিস্ময়করভাবে আমরা দেখতে পাই শত বছর ধরে অভিনব সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন তাঁর তত্ত্বের অসম্পন্নতাকে তত্ত্বের দুর্বলতারূপে তুলে না ধরে তথ্যের পরিপূরকতা প্রদান করে বিবর্তন তত্ত্বের গুরুত্ব ও সার্বিক পূর্বাভাসের ক্ষমতা প্রদান করেছে।

জৈববিবর্তন তত্ত্বের আগে জীববিজ্ঞানের গবেষণা বিচ্ছিন্নভাবে নানা তথ্যের শুধু বর্ণনামূলক তালিকা সৃষ্টি করেছে। সেদিক থেকে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব এতই মৌলিক ও ব্যাপক যে এই তত্ত্বকে বাদ দিয়ে জীববিজ্ঞানের নানা তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় ও অগ্রগতির কথা ভাবা যায় না। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার আগে এমনটি ভাবা প্রায় অসম্ভব ছিল যে বনের বৃক্ষ, সমুদ্রের মাছ ও কুমির, ডাঙ্গার হরিণ, বাঘ, বানর সবার উদ্ভব দূর অতীতের কোনো অভিন্ন আদি প্রাণী থেকে। এমনকি মানুষের উদ্ভবও সেই অভিন্ন উৎস থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই সাধারণ বিশ্বাসটি কাজ করেছে যে প্রতিটি ভিন্ন প্রাণী পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি হয়েছে, এবং একই সময়ে। মিল্টন তাঁর কাব্যে সৃষ্টির বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন পৃথিবী উন্মোচিত হলো এবং প্রাণীরা বেরিয়ে আসলো আপন আপন ভঙ্গিতে যেমন সিংহ এলো তার ডোরাকাটা কেশর দুলিয়ে।

প্রথমে প্রাণীদের দৈহিক গঠনের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা চলে এবং প্রায় এক ডজন গোত্রে বা বর্গে এদের ভাগ করা হয়। এভাবে যেসব প্রাণীর দেহ খণ্ডকযুক্ত, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, পদ ও উপাঙ্গগুলি সন্ধিল তারা হল আর্থ্রোপোডা। যেমন কাঁকড়া, চিংড়ি, মাকড়সা, ফড়িং, বৃশ্চিক, ইত্যাদি। মেরুদণ্ডী প্রাণী হল, যাদের মেরুদণ্ড আছে। এদের মধ্যে পড়ে মাছ, উভচর প্রাণী, সরীসৃপ, পাখি ও স্ন্যপায়ী প্রাণী। প্রতিটি বর্গ বা ফাইলাকে আবার উপবর্গে ভাগ করা হয়। এই বিভাজনের মূল একক হল এক একটি প্রজাতি। যারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

এই শ্রেণীভাগ কেন সম্ভব? এবং এর আড়ালে কি নিয়ম কাজ করে? এসব প্রশ্নের কোনো বৈজ্ঞানিক জবাব ছিল না অষ্টাদশ শতাব্দীতেও। জার্মানির প্রকৃতি-দার্শনিকরা অভিমত দেন যে সৃষ্টিকর্তা তাঁর সষ্টির কাজে পুরো স্বাধীনতা গ্রহণ করলেও নিজেকে একটি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করেন বিভিন্ন প্রাণীদের শ্রেণীবদ্ধ করার জন্য। ফলে প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকলেও সমান্রাল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম প্রাণীদের মধ্যে। স্বভাবতই এটা ছিল ধর্মীয় উক্তির সমর্থন মাত্র, কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নয়।

একটি ভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন ফরাসি বিজ্ঞানী বাফন (Georges Buffon)। পঞ্চাশ খণ্ডে বিপুল পরিমাণ তথ্য তিনি বিশ্বকোষের ধরনে রচনা করেন। এর মধ্যে বার খণ্ড ছিল চতুষ্পদ প্রাণীদের নিয়ে এবং নয় খণ্ড পাখিদের নিয়ে। বাফনের জন্ম ১৭০৭ খৃস্টাব্দে এবং তিনি বেঁচে ছিলেন ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত। ১৭৪৯ সালে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হবার পর থেকে থেমে থেমে বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশিত হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পরও কিছু খণ্ড প্রকাশিত হয়। বাফনকে যা বিস্মিত করে তা হল, চতুষ্পদ কুকুর, নেকড়ে, খেকশিয়াল ও শৃগালের মধ্যে মিল এবং ঘোড়া ও জেব্রার মধ্যে মিল। তাঁর প্রশ্ন ছিল যদি সব প্রাণী পৃথক পৃথক ভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে তা হলে এই মিল কী প্রয়োজনে এল? বাফনের উপস্থাপন কৌশল ছিল চমৎকার ও আকর্ষণীয়। তিনি জৈববিবর্তন তত্ত্বের একটি ইঙ্গিত দেন তথ্যের আলোকে। যেমন সব চতুষ্পদ প্রাণী অতীতের কোন একক প্রজাতি থেকে আসতে পারে। এরপরই প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপাত্মকভাবে বলেছেন, তবে নিশ্চয়ই এটা ঘটেনি। কারণ, বাইবেল অনুসারে সৃষ্টিকর্তা প্রতিটি প্রাণী সৃষ্টিকর্তার সমান অনুগ্রহ লাভ করেছে। এই কৌশল তিনি গ্রহণ করেছেন রক্ষণশীলদের পাশ কাটাতে।

জৈববিবর্তন তত্ত্বে প্রাণীরা সময়ের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে রূপান্তর লাভ করতে পারে এবং এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপ লাভ করতে পারে। ফলে, যে সব জীব ও উদ্ভিদ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে তাদের মূল আদি উৎস অভিন্ন হতে পারে। পুরানো অনেক প্রাণী হয়তো হারিয়ে গেছে বিবর্তনের এই দীর্ঘ পথে। জৈববিবর্তন তত্ত্ব একটি সম্পন্ন ও অভিন্ন রূপ নিয়ে আকস্মিকভাবে আবিস্কৃত হয়নি, বরং নানা বাঁধা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ধাপে ধাপে উদ্ভাবিত হয়েছে নিজেও বিবর্তনের পথ ধরে। বাফনের পর আরো সরাসরিভাবে জৈববিবর্তনের ধারণা উপস্থিত করেন ডারউইনের পিতামহ ডক্টর ইরাসমা ডারউইন। তাঁর জীবনকাল ছিল ১৭৩১ থেকে ১৮০২ সাল। তাঁর গ্রন্থের একটি অদ্ভুত নাম দেন জুনোমিয়া (*Zoonomia*)। এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য ছিল সব প্রাণীর উৎস হল একক কোনো সূত্র বা শুক্রাণূ। তাঁর যুক্তি ছিল প্রাণীদের শ্রেণীভাগ থেকে। অর্থাৎ একই গোত্রের প্রাণীদের মধ্যে পরিলক্ষিত মিল থেকে একটি অভিন্ন পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আরো যে যুক্তি উপস্থিত করেন তা হল, নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে। যেমন কুকুর, ভেড়া ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে, বদলে দেয়া যায় এদের চেহারা। ব্যাঙাচি যে বড় হয়ে ব্যাঙ হয়ে যায় সেটাও তিনি দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেন কেমন করে প্রকৃতি প্রাণীর রূপান্তর ঘটাতে পারে সেই ঘটনার। ডারউইন পিতামহের বইটি পড়েছিলেন আগ্রহভরে। কিন্তু যথেষ্ট সন্তুষ্ট হতে পারেন না। ডারউইনের কাছে মনে হয়েছে এই গ্রন্থে যে পরিমাণ অনুমানাত্মক ধারণা উপস্থিত করা হয়েছে, সে অনুপাতে সমর্থনযোগ্য উপাত্ত ও তথ্য নেই।

চার্লস ডারউইনের অগ্রদূতরূপে আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী ল্যামার্ক। তাঁর জীবনকাল হল ১৭৪৪ থেকে ১৮২৯ সাল। ল্যামার্ক সমস্ত জীবকে সাজালেন এদের গঠনের জটিলতার ক্রম অনুসারে অর্থাৎ সবচেয়ে সরল গঠনের জীবন থেকে সবচেয়ে জটিল গঠনের জীব পর্যন্ত। তিনি দেখলেন যে সবচেয়ে সরল জীব থেকে সবচেয়ে জটিল গড়নের জীবদের

মধ্যে একটি ক্রমবিকাশের ধারণা পাওয়া যায়, যদিও মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নতা আছে। তিনি এই ধারণা উপস্থিত করলেন যে সরল জীব থেকে ক্রমবিবর্তনের ভিতর দিয়ে জটিলতর জীবের উদ্ভব ঘটেছে। ল্যামার্ক তাঁর মতের সমর্থনে যে প্রক্রিয়া প্রস্তাবনা করলেন তার পিছনে দুটো নীতি তুলে ধরলেন। একটি হল, কোনো বিশেষ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার বা অব্যবহার সেই প্রত্যঙ্গকে রূপান্তরিত করে। দ্বিতীয় নীতিটি হল ব্যবহারের ভিতর দিয়ে অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে টিকে থাকার প্রচেষ্টায় লব্ধ যে পরিবর্তন কোনো জীব লাভ করে তা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। সমকালীন বিজ্ঞানীরা ল্যামার্কের বিবর্তন প্রস্তাবনা মেনে নিতে চাননি। কিন্তু ডারউইন এতে বেশ আকৃষ্ট হন। ফরাসিদের কাছে ল্যামার্ক হচ্ছে তাঁদের শ্রেষ্ঠ প্রাণীবিজ্ঞানী। ১৮০৯ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থে অনেক দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেন তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে। সারস পাখির লম্বা পা লাভের ব্যাখ্যা তিনি দিলেন চলার সময় এদের পা'কে লম্বা করার প্রচেষ্টার ফলরূপে। জিরাফের দীর্ঘ গ্রীবা এবং পিপীলিকাভোঁজী প্রাণীদের লম্বা জিহ্বা একইভাবে অর্জিত। গ্রীবা ও জিহ্বাকে খাবার পর্যন্ত পৌঁছার জন্য লম্বা করার চেষ্টার ভিতর দিয়ে। একইভাবে সাপের হরকিয়ে সরুপথে চলার প্রচেষ্টায় এর পা লুপ্ত হয়েছে এবং শরীর সরু ও দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও পরিবেশের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়। যেমন তৃণভূমি থেকে বাতাসে উড়ে যাওয়া বীজ যখন প্রস্তরময় ভূমিতে বিরূপ পরিবেশে দুর্বল গঠন নিয়ে বড় হয়, এই রূপান্তরিত উদ্ভিদ সেই রুগ্ন গঠন ও শুষ্ক পরিবেশে টিকে থাকার বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমে লাভ করে।

জীবের বিবর্তন সম্পর্কে ল্যামার্কের যে ব্যাখ্যা তা আকর্ষণীয় হলেও তা 'টেলিওলজিকাল' বলে বিবেচিত হয়েছে। ডারউইন নিজেও এই ব্যাখ্যায় প্রথমে চমৎকৃত হলেও পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে প্রমাণ করলেন যে ল্যামার্কের প্রস্তাবনা ভুল। বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা ভুল প্রমাণিত হলেও ল্যামার্ক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে প্রাণীজগৎ যে বদলে যাচ্ছে সেই মতের পক্ষে চমৎকার চিত্র তুলে ধরেছেন। ল্যামার্ক সারা জীবন দারিদ্র্যের চাপে বিধ্বস্ত হয়েছেন। জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি অন্ধ হয়ে যান। মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় সাধারণ কবরে। তাঁর সমাধিতে যে প্রশংসা বাণী লেখা হয় সেখানেও বিদ্রুপ ছিল। তাঁর মতবাদ অবৈজ্ঞানিক ও কল্পনা নির্ভর বলে। কিন্তু ল্যামার্কের মতবাদ ভুল প্রমাণিত হলেও তার কিছু কিছু ধারণা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। যেমন প্রাণীদের জনসংখ্যা সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় পরিবেশের প্রভাবে। বিবর্তনের ফলে প্রাণীজগৎ বদলে যায়। ফলে, অতীতের প্রাণীদের থেকে বর্তমানের প্রাণীরা ভিন্ন। বিবর্তনের পক্ষে ল্যামার্কের সমর্থন এবং চমৎকার উপস্থাপন অবশ্যই অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল ডারউইনের পূর্ণতর ও শুদ্ধতর বিবর্তন তত্ত্ব উদ্ভাবনে। আমরা দেখব বিবর্তন তত্ত্বের সার্বিক রূপ দাঁড় করাবার কাজে ডারউইন প্রধানত তাঁর ব্যাপক পর্যবেক্ষণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করলেও ল্যামার্কের মতন আরো অনেকের অবদান পটভূমি রূপে কাজ করেছে। বস্তুত জৈববিবর্তন তত্ত্ব অনেকের ভাবনা ও অবদানের বিবর্তনকে আত্মস্থ করে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ খৃস্টাব্দে। তাঁর পিতা ছিলেন স্রুয়েজবারির ডাক্তার এবং অত্যন্ত কর্তৃত্বব্যঞ্জক। ডারউইনও একদিন একজন চিকিৎসক হবে এটাই ছিল পিতার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ডারউইন ছোটবেলা থেকেই আকৃষ্ট ছিল শিকারে। ভালবাসতো কুকুর। সহজাত প্রকৃতিবিজ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে গভীর আগ্রহ অনুভব করতো প্রাকৃতিক সংগ্রহে। স্রুয়েজবারি স্কুল শেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভর্তি হলে এডিনরারা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে, বিশেষ করে চিকিৎসা পেশায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। শেষে একজন অলস শিকারিরূপে জীবন কাটাবে–এই ভয়ে ডারউইনের বাবা তাঁকে পাঠালেন ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই লক্ষ্যে যে ছেলে অন্তত একজন যাজক হবে। ডারউইন তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তেমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করছিল না। তাঁর ঝোক ছিল কাঁচপোকা প্রভৃতি সংগ্রহ, বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ানো ও শিকার করা। কিন্তু ডারউইনের প্রতি স্নেহের দৃষ্টি পড়ে ক্যামব্রিজের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক হেনস্লোর। তাঁর পরামর্শেই ডারউইন ভূবিজ্ঞানের উপরে অধ্যাপক সেজউইকের বক্তৃতা শুনতে শুরু করে। এক ছুটিতে ডারউইন প্রফেসর সেজউইকের সঙ্গে উত্তর ওয়েল্‌সে অভিযানে যান এবং কীভাবে ভূবিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করতে হয় সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। পরে যখন এ জায়গাতে আবার অভিযানে যান ডারউইন তখন বুঝতে পারেন ভূবিজ্ঞানের কলাকৌশল জানা না থাকায় কতকিছু তিনি আগের বার উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হয়েছেন। বরফ যুগের ফলে সৃষ্ট যেসব চিহ্ন তা অগ্নিদগ্ধ গৃহের চিহ্নের মতই স্পষ্ট বলে তাঁর কাছে মনে হয়েছে। এর ফলে এই ধারণা ডারউইনের কাছে আরো সুদৃঢ় হয় যে পর্যবেক্ষণ তখনই ফলপ্রসূ হয় যখন তার সঙ্গে যুক্ত হয় স্বজ্ঞা ও তত্ত্ব।

ডারউইনের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটে ক্যাম্ব্রিজে তাঁর শিক্ষা সমাপ্তির পর। ঘটনাটি ছিল বিগল-এ অজানা সমুদ্র অভিযানে একজন অবৈতনিক অপেশাদার ভূবিজ্ঞানীরূপে সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ লাভ। এই পাঁচ বছরের অভিযানে ডারউইন পৃথিবীর অনেক নতুন জায়গা পরিদর্শন এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রাণীদের পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র পর্যবেক্ষণের অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন। এই অভিযানের সুবর্ণ সুযোগ তিনি প্রায় হারাতে যাচ্ছিলেন একাধিক প্রতিবন্ধকতার কারণে। প্রথমত ডারউইনের বাবা প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন এই অভিযানে যোগদানে। শেষ পর্যন্ত ডারউইনের চাচা যোসায়া ওয়েজউডের সুপারিশে অনুমতি মিললো। এবার বাদ সাধলো বিগল্ এর ক্যাপ্টেন ফিজরয়। একজন সম্ভ্রান্ত নৌ-অফিসার হিসাবে তাঁর সহযাত্রীরূপে তিনি চাচ্ছিলেন সম্ভ্রান্ত সব সদস্য। ডারউইনকে দেখে তাঁর মনে হয়েছে সে যথেষ্ট দৃঢ়চিত্ত ও সম্ভ্রান্ত নয়। এটা ছিল তাঁর খুঁতখুঁত স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি খারাপ ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ডারউইনের বিগল-এ যাত্রা নিশ্চিত হল।

১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর প্লিমাউথ বন্দর থেকে বিগলের যাত্রা শুরু হল। ডারউইন তাঁর সঙ্গে নিলেন ভূবিজ্ঞানী চার্লস লায়েলের লেখা *Principles of Geology* (ভূতত্ত্বের মূলনীতি) গ্রন্থটি। খুব দ্রুত তিনি এটি পড়ে ফেলেন। লায়েলের বই থেকে তিনি জানলেন, ভূপৃষ্ঠের বর্তমান রূপ লাভ করেছে বিপুল সময় ধরে। ধীরে ধীরে সংঘটিত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে। ৬ জানুয়ারি টেনেরিফ দ্বীপ ছুঁয়ে ১৫ জানুয়ারি বিগল পৌঁছল কেপভার্ডি দ্বীপপুঞ্জে, ডারউইন এখানে আবিষ্কার করলেন ভূতাত্ত্বিক লায়েলের তত্ত্বের বাস্তব উদাহরণ। পর্বতচূড়া বরাবর

তিনি দেখতে পেলেন সমান্তরালভাবে ছড়িয়ে আছে চুনাপাথর যার মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে আগ্নেয় প্রস্তরের স্তরে স্তরে মৃত প্রাণীদের খোলক। আগ্নেয় প্রস্তরের উপরের স্তর নিশ্চয়ই নিক্ষিপ্ত হয়েছে সমুদ্রে এবং চুনাপাথরগুলো নিচে রয়ে গেছে। বিগলে ডারউইনের অভিযাত্রায় তিনি যতটা প্রকৃতিবিজ্ঞানীরূপে কাজ করেছেন তার চেয়েও বেশি অর্থে তিনি কাজ করেছেন ভূতাত্ত্বিক গবেষকরূপে। বস্তুত তাঁর বিবর্তন তত্ত্বকে দেখে বলা চলে চার্লস লায়েল ভূপ্রস্তরের রূপান্তর সম্পর্কে যে প্রস্তাবনা দিয়েছেন তাকেই যেন প্রয়োগ করা হয়েছে জীবজগতে।

ডারউইনকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করে ব্রাজিলের গভীর ও ঐশ্চর্যপূর্ণ বনের দৃশ্য। সেখানকার উজ্জ্বল সব অর্কিড, সবুজ বৃক্ষের সমারোহ বিচিত্র রঙের সব প্রজাপতি—সব মিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য ডারউইনের মনে গভীর রেখাপাত করলো। তাঁর যাত্রা পথের প্রতিটি স্থান থেকে তিনি সংগ্রহ করলেন পোকামাকড়, ফুল, প্রস্তর ও জীবাশ্ম। নতুন ধরনের পাখি দেখলে তা শিকার করে তাঁর সংগ্রহ সম্ভার বোঝাই করে পাঠালেন ইংল্যান্ডে। বিগল্ জাহাজের ক্যাপটেন ফিজরয় যখন ব্যস্ত সমুদ্র চষে বেড়ানোর কাজে তখন ডারউইনকে নানা দ্বীপে নামিয়ে দেয়া হত। কখনো সপ্তাহ, কখনো মাসব্যাপী তার পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে। ডারউইন কখনো ঘোড়ার পিঠে কখনো স্থানীয় পরিদর্শকের সহায়তা নিয়ে সমগ্র পশ্চাৎভূমি পর্যবেক্ষণ করতেন তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। রাখাল বালকদের সঙ্গে থেকে তাঁদের পশু চড়ানো প্রত্যক্ষ করতেন। সালাদো নদীর দু'পাশে নিম্পাদপ বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে উঁচু বুনো মোটা ঘাসের বিস্তার যা আবার কিছুদূর গিয়ে বদলে গেছে সূক্ষ্ম সবুজ কোমল তৃণভূমিতে। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে ডারউইন অবাক বিস্ময়ে জানলেন বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে ঘাসের এই পরিবর্তন ঘটেছে মাটির বৈশিষ্ট্য বদলে যাবার জন্য নয়, বরং এখানে পশুচারণের ফলে।

উরুগুয়েতে তিনি দেখলেন ইউরোপীয় গাছের উপস্থিতি প্রকৃতির ভারসাম্যকে বদলে দিয়েছে। কোনো বাঁধা না পেয়ে কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ শতশত বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে কোনো মানুষ বা প্রাণী প্রবেশ করতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকার সেন্ট ফি শহরের পারানা নদীর পাড়ে অবস্থিত পাহাড়ের চূড়া থেকে বিশাল সব বিলুপ্ত প্রাণীর জীবাশ্ম সংগ্রহ করেছেন ডারউইন। চিলির সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে ডারউইন প্রত্যক্ষ করেন আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ। এখানে কালো লাভা উত্তপ্ত লাল লাভারূপে নিক্ষিপ্ত হয়েছে চারদিকে। ১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ডারউইন চিলো (Chiloe) দ্বীপের ভালডিভিয়া বন্দরের অদূরে পাহাড়ে অবস্থানকালে প্রচণ্ড ভূমিকম্প অনুভব করেন। দুই সপ্তাহ পরে বিগল্ যখন কনসেপসিয়ন বে-তে ফিরে আসে তখন ডারউইন দেখলেন এক ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর। হ্রদের তলদেশ থেকে মাটি দুই তিন ফুট উঁচু হয়ে জমা হয়েছে পাড়ে। পানির নিচ থেকে পাথর উঠে এসে জমা হয়েছে দশ ফুট উঁচু হয়ে, যা আবৃত হয়ে আছে পঁচে যাওয়া প্রাণীদের দেহ। আন্দিজ পর্বতে ডারউইন দেখলেন প্রস্তরীভূত বৃক্ষ যা সাত হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছে এবং সমুদ্রতল থেকে শামুক জাতীয় প্রাণীদের খোলস উঠে এসেছে ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায়।

এরপর বিগল যাত্রা করলো গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের দিকে। ইকুয়েডোর সমুদ্র উপকূল থেকে এটি প্রায় ছয়শ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার মধ্যে এখানে এসেই প্রথমে ডারউইনের মনে জীবের বিবর্তন ধারণাটি উঁকি দিল। অগ্ন্যুৎপাতের লাভা থেকে উৎপন্ন এই দ্বীপগুলোতে প্রাণীকূলের মধ্যে শুধু সরীসৃপ দেখা গেল। ছোট ইঁদুর ছাড়া এখানে কোনো স্ন্যপায়ী প্রাণী ছিল না; এবং এই ইঁদুরও সম্ভবত কোনো জাহাজে চড়ে এসেছে। বিশাল আকৃতির আদিম কচ্ছপের কালো লাভার দ্বীপে বাস করে ভিন্নতা পেয়েছে অন্য কোনো দ্বীপের কচ্ছপ থেকে, যা দেখামাত্র চোখে ধরা পড়ে। বিবর্তনের পক্ষে সবচেয়ে লক্ষণীয় প্রমাণ মেলে চড়ুই পাখির মতো দেখতে এখানকার ছোট ছোট ফিঞ্চ পাখিদের চঞ্চুর বৈচিত্র্যে। এদের কোনো কোনোটির চঞ্চু ছোট ও সূক্ষ্ম এবং কোনো কোনোটির চঞ্চু লম্বা ও দৃঢ়। প্রায় এক ডজন ভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি ডারউইন প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মনে হয়েছে এই দ্বীপপুঞ্জে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির পাখিগুলো একটি অভিন্ন প্রজাতি থেকে উদ্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন মিটাতে ও ভিন্ন ভিন্ন রকম খাবার প্রাপ্তির পরিবেশে ভিন্নতা নিয়ে টিকে আছে।

বিগল-এ করে বিশ্বভ্রমণ শেষে ফেরার পথে টাহিটি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া হয়ে এবং শেষে কোকাস দ্বীপ, মরিশাস দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন, সেন্ট হেলেনা দ্বীপ, এবং অ্যাসেনসিওন দ্বীপ থেমে থেমে পরিদর্শন করে। ইংল্যান্ডে পৌঁছার আগেই দক্ষিণ আমেরিকা থেকে পাঠানো তার নমুনাগুলো এবং তার লেখা পত্র পৌঁছে যায় সেখানে। ইংল্যান্ডে ইতিমধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায় ডারউইন ও তাঁর অবদান নিয়ে। অভিযাত্রার শেষ পর্যায়ে ডারউইন তাঁর বোনের কাছ থেকে এক চিঠিতে জানতে পারেন, অ্যাডাম সেজউইক ডারউইনের বাবাকে লিখেছেন, ডারউইন বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের তালিকাভুক্ত হতে যাচ্ছে ভবিষ্যতে। ডারউইন তাঁর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এই চিঠি পেয়ে তিনি অ্যাসেনসিওনের পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং তাঁর আনন্দের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় ব্যবহৃত হাতুড়ির আঘাতে সেই পাহাড়ের প্রস্তরগুলোর কম্পনে।

বিগল অভিযান শুরুর সময় ডারউইনকে মূল্যায়ন করা হয়েছে একজন অলস বুদ্ধিগতভাবে বিশৃঙ্খল যুবকরূপে। কিন্তু দীর্ঘ অভিযান শেষে ডারউইন যখন ফিরে এলো তখন সে একজন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক ও গবেষক। উদ্ভাবনী চিন্তায় তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন প্রকৃতিবিজ্ঞানী, এবং তাঁর চেয়েও বেশি একজন ভূতাত্ত্বিক-প্রেরণাপ্রাপ্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত। ইংল্যান্ডে ফিরে এসে ডারউইন বিয়ে করেন তার চাচাতো বোন এমা ওয়েজউডকে এবং লন্ডন থেকে ষোল মাইল দূরে কেন্ট কাউন্টির ডাউন গ্রামে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। বাকী জীবন তাঁর এখানেই কাটে। সমস্ত কোলাহল থেকে নিজেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে একান্তভাবে মগ্ন হয়ে পড়েন গবেষণায়, বিশেষ করে জীববিজ্ঞানে। ডারউইন এই সময় বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হজমজনিত ব্যাধিতে ভুগছিলেন। দীর্ঘদিন বিগলের সমুদ্রযাত্রার বিরূপ ক্রিয়া বা বংশাণুক্রমিক কোনো ব্যাধির কারণে অথবা কর্তৃত্বব্যঞ্জক পিতার জন্য মানসিক চাপে হোক, ডারউইন অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাননি। তখনকার দিনে চিকিৎসা ব্যবস্থায় তাঁর হয়তো বিশেষ কিছু করার ছিল না। মাঝে মাঝে জল-চিকিৎসার জন্য যেতেন চিকিৎসকের কাছে এবং তাঁর পরামর্শে দু'বার গোসল

করতেন প্রতিদিন। কিন্তু ডারউইনের জন্য সবচেয়ে বড় চিকিৎসা ছিল তাঁর নিজস্ব গবেষণার কাজ।

একজন তদ্গত জীববিজ্ঞানী হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে দীর্ঘ আট বছর তিনি জীববিজ্ঞান চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ডারউইন বিশেষভাবে গবেষণা করেন গুগলিশামুক নিয়ে এবং এই আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তাঁর চিলিতে থাকার সময়। তাঁর জানালার পাশে একটি টেবিলে এত মগ্ন হয়ে এবং এত দীর্ঘসময় ধরে তিনি গুগলিশামুক ব্যবচ্ছেদ করতেন যে, তাঁর সন্তানরা একে একটি অনিবার্য কাজ বলে মনে করতেন। ব্যাপারটি এতই সহজাত ব্যাপার মনে হতো তাদের কাছে যে, প্রতিবেশিদের বাড়িতে এই ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা না দেখে প্রশ্ন করতো কোথায় তারা করে এই কাজ?

বিগল অভিযান থেকে আসার এক বছর পর অর্থাৎ ১৮৩৭ সালে ডারউইন তাঁর প্রথম নোটবইটি লিখতে শুরু করেন জৈববিবর্তন সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের কথা। প্রায় গোপনে অনেকটা ভয় ও অপরাধবোধ নিয়ে, যেন তাঁর তত্ত্বের কথা ডারউইন তাঁর বন্ধু লায়েল ও হুকারকে জানান। বিবর্তনের কথা একেবারেই যে তখন বাতাসে ছিল না তা নয়। কিন্তু জানামতে একজন জীববিজ্ঞানীও বিবর্তন তত্ত্বে সে সময় বিশ্বাস করতেন না।

এই সময় ম্যালথাসের একটি বই ডারউইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জনসংখ্যার নীতি বলে তাঁর এই রচনায় ম্যালথাস দেখান যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে। অর্থাৎ কোনো সময়ে যত জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উপরে নির্ভর করে। অন্যদিকে খাদ্যসম্ভার বৃদ্ধি পায় সমান্তর গাণিতিক হারে। ম্যালথাস ব্যাখ্যা দেন, এর ফলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা অভাববোধ ও কার্পণ্য সৃষ্টি হয়। ডারউইন এই বই থেকে যে ধারণায় উপনীত হলেন তা হল, প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার ফলে প্রাণীরা টিকে থাকতে পারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিতর দিয়ে।

ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্বের মূল কথা হল প্রতিটি প্রজাতির মধ্যেই প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক সদস্য পরস্পর থেকে কিছুটা ভিন্ন। ডারউইন অনুমাণ করেছিলেন যে এই পার্থক্যের কারণ হতে পারে জন্মগত অর্থাৎ বংশাণুক্রমিক। দ্বিতীয়ত প্রতিটি প্রজাতির সংখ্যা প্রজনন প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পায় এবং তা জ্যামিতিক হারে। তৃতীয়ত প্রকৃতিতে এই প্রচণ্ড জনসংখ্যার বৃদ্ধি সামাল দেয়া হয় প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে। প্রতিটি প্রজাতির সদস্য খাবারের জন্য আলো, বাতাস, বাসস্থান ও প্রজননের সঙ্গীর জন্য প্রতিযোগিতা করে। চতুর্থত এই প্রতিযোগিতায় বিশেষ বিশেষ জীব তার বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ পরিবেশে আনুকূল্য পাবে। ফলে এদের বিকাশ অর্থাৎ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে কিছু প্রাণী তার বৈশিষ্ট্যের সামান্য পার্থক্যের জন্য বিশেষ পরিবেশে প্রতিকূলতা পাবে এবং এদের সংখ্যা হ্রাস পাবে। বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের জন্য যে ভিন্নতা অবদানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়, তার প্রভাব প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে যাবার সময় বৃদ্ধি পায়। একেই ডারউইন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বলেছেন।

লক্ষণীয় ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন একান্তই যান্ত্রিকভাবে ঘটছে। এখানে কোনো প্রাণীর আপন ইচ্ছা শক্তি বা প্রচেষ্টার ফলে বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হচ্ছে না। জিরাফের গ্রীবা যে দীর্ঘতর তা জিরাফের নিজের প্রচেষ্টার ফসল নয়। জন্মগতভাবে বিভিন্ন জিরাফের মধ্যে যাদের গ্রীবা একটু বেশি লম্বা তারা পরিবেশের আনুকূল্য পেয়ে টিকে গেছে বেশি সংখ্যায়। এরপর এদের বংশ বৃদ্ধি করে দীর্ঘ গ্রীবার জিরাফের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রাণী যে বিভিন্ন পরিবেশে বৃদ্ধি পায় তার কারণ জন্মগতভাবে বিশেষ প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য, তার সঙ্গে পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। এর ভিতর দিয়ে বিবর্তনের একটি বিশেষ দিক নির্ধারিত হয়ে যায়।

১৮৪৪ সালে ডারউইন ২৩১ পৃষ্ঠার একটি গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জীবের বিবর্তনের ব্যাখ্যা করে। তিনি ক্রমাগতভাবে তথ্য সংযোজন করছিলেন তাঁর তত্ত্বের ব্যাখ্যায়। শুধু তার তত্ত্বের সমর্থনমূলক ঘটনাই নয়, যে ঘটনাগুলো তত্ত্বের প্রতিকূলে বলে মনে হতো তাও বিশেষ যত্নে তিনি লিপিবদ্ধ করতেন। আশ্চর্য সততায় ও নিপুণতায় তিনি সমস্ত উপাত্ত সংগ্রহ, বিন্যস্ত, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতেন। সমস্ত উপাত্ত ও তথ্য তিনি চৌত্রিশটি বড় ভাগে ভাগ করে জমা করতেন। এর মধ্যে চিঠির সাহায্যে পাওয়া, পর্যবেক্ষণ থেকে লব্ধ, গবেষণায় প্রাপ্ত, বই পড়ে অর্জিত ইত্যাদি নানা উৎসকে তিনি পৃথকভাবে গুরুত্ব দেবার জন্য নিজস্ব তথ্য বিন্যাস সৃষ্টি করেন। ডারউইনের তত্ত্ব শুধু অসাধারণ এক অবদান নয়। এই তত্ত্বে উপনীত হবার যে পদ্ধতি তিনি অবলম্বন করেছেন, যে বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়ে পার হয়েছেন, যে দৈহিক ও মানসিক শ্রম ও সাহসিকতার প্রদর্শন করেছেন—সবই অনন্য ও আকর্ষণীয়। এ জন্যেই অনেক সূক্ষ্ম ঘটনার উল্লেখ করেছি ডারউইনের জীবনের, যা তাঁর আবিষ্কারের পটভূমিরূপে কাজ করেছে, কখনো প্রত্যক্ষ, কখনো পরোক্ষভাবে।

গৃহপালিত পশুপাখির ক্ষেত্রে একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে যে পার্থক্য সে তথ্য প্রত্যক্ষভাবে পাওয়ার জন্য নিজে কবুতরের মধ্যে প্রজনন ঘটিয়েছেন। ঘোড়ার প্রজনন কাজে নিয়োজিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাঁর জীবনের বছরগুলো গড়িয়ে যাচ্ছিল এবং ডারউইন তাঁর তত্ত্ব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। এতই নিমগ্ন ছিলেন গবেষণায় যে হয়তো তিনি তাঁর তত্ত্ব প্রকাশই করতেন না। যদি না ১৮৫৮ সালে নতুন এক ঘটনা ঘটতো। ১৮ জুন তারিখে একজন তরুণ প্রকৃতিবিজ্ঞানী আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের লিখা একটি চিঠি ও প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ডারউইন পান। প্রবন্ধটিতে জৈববিবর্তন সম্পর্কে ওয়ালেসের বর্ণনা ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়। ডারউইন এই ঘটনায় এতই বিব্রতবোধ করলেন যে বন্ধুদের তিনি বললেন তাঁর বরং নিজের পাণ্ডুলিপিটি পুড়িয়ে ফেলা উচিত। যাতে ওয়ালেস বা অন্য কেউ তাচ্ছিল্য না করে তাঁর অবদানকে। শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের পরামর্শে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর লেখা একটি প্রবন্ধ ওয়ালেসের সঙ্গে একত্রে পাঠ করা হলো লিনিয়ান সোসাইটিতে ১৮৫৮ সালের পহেলা জুলাইতে। প্রবন্ধ

দুটি পাঠের পর কোনো আলোচনা হল না। সবাই নীরব ছিল। সম্ভবত তথ্যের দীর্ঘ তালিকা দেখে বিরোধিতা করার সাহস পায়নি, এমন উক্তি করেন ডারউইনের বন্ধু হুকার।

বন্ধুদের পরামর্শে ডারউইন এরপর শুরু করলেন তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ '*The Origin of Species*' (প্রজাতির উদ্ভব) প্রকাশনার কাজ। ১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর বইটি বাজারে এল। জৈববিবর্তন তত্ত্বটি উদ্ভাবনের প্রায় বিশ বছর পর এটি প্রকাশিত হওয়ায় ডারউইন দীর্ঘসময় ধরে তাঁর গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াস পান বিপুল তথ্যের ও সূক্ষ্ম ভাবনার সংযোজন ঘটিয়ে। প্রথম দিনেই বইটি বাজারমাত করে।

প্রাকৃতিকভাবে যে পার্থক্য দেখা যায় একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে তার ব্যাখ্যা ডারউইনের সময় জানা ছিল না। বংশগতি সঞ্চারণের প্রক্রিয়া জানার ফলে বর্তমানে এর ব্যাখ্যা এখন পাওয়া সম্ভব। ডারউইন বিজ্ঞানসম্মতভাবেই এই তথ্যকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য রূপে উপস্থাপন করেন। এই সামান্য পরিবর্তন কীভাবে জীবের বিবর্তনকে প্রভাবিত করে তা প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি হিসাব করেন যে কোনো বৃক্ষ যদি বছরে দুটো বৃক্ষের জন্ম দেয়, এবং তা চলতে থাকে পর্যায়ক্রমে, তা হলে বৃক্ষের সংখ্যা কী দাঁড়াবে? জ্যামিতিক হারে এই সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিশ বছরে এই জাতের বৃক্ষের সংখ্যা দাঁড়াবে দশ লক্ষেরও বেশি। শুধু হিসাবের প্রশ্ন নয়, বাস্তবে তিনি প্রত্যক্ষ করছেন উরুগুয়েতে কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ (*Cynara cardunculus*) অবাধে বৃদ্ধিলাভের ফলে এমন বিপুল সংখ্যায় বিস্তার লাভ করেছে। হাতির বেলায় তিনি হিসাব করে দেখলেন একটি যুগলের বাচ্চার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হলেও বংশপরম্পরায় টিকে থাকলে সাড়ে সাতশো বছরে এদের সংখ্যা নয় কোটিতে পৌঁছে যাবে। সাধারণ অবস্থায় কোনো বিশেষ প্রজাতির সংখ্যা এভাবে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে আমরা দেখি না। বরং মোটামুটিভাবে জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। এটা ঘটে টিকে যাবার এক প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার জন্য। যদি পরিবেশ একটু বেশি অনুকূল হয় কোনো বিশেষ প্রজাতির জন্য, তাহলে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বংশাণুক্রমে তা চলতে থাকে। ডারউইন যাকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলেছেন। একই প্রজাতির মধ্যে এই টিকে থাকার প্রতিযোগিতা যেমন চলে, তেমনি একই এলাকায় যদি একাধিক প্রাণী ও গাছপালা থাকে তখন জটিল এক প্রতিযোগিতার জন্ম দেয়। ডারউইন অনেকগুলো দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন এমন জটিল প্রতিযোগিতার। যেমন বিড়াল পরোক্ষভাবে ফুলের টিকে থাকাকে প্রভাবিত করতে পারে এই জন্যে যে বিড়াল ইঁদুরকে ধ্বংস করে এবং ইঁদুর ভ্রমরকে যা ফুলের পরাগায়ণে সাহায্য করে।

ডারউইন প্রাকৃতিক নির্বাচন ও কৃত্রিম নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কারণ লায়েল নিশ্চিত করেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজ কোটি কোটি বছর ধরে চলে আসছে যার প্রমাণ রয়েছে ভূপ্রকৃতির বিবর্তনের ইতিহাসে; কিন্তু কৃত্রিম নির্বাচন যা ঘটে সচেতনভাবে বিশেষ প্রজাতির প্রজনন ঘটিয়ে। তার বয়স মাত্র কয়েক সহস্র বছর। বরফ যুগের আবির্ভাব ও অবসানের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর পরিবেশ বিপুলভাবে রূপান্তরিত হয়েছে পরিবর্তনের ধারায়। এর ফলে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনেক প্রজাতির বিবর্তন ঘটেছে প্রচণ্ডভাবে। কোনো প্রজাতির সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন এদের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পায় যা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভিতর দিয়ে টিকে থাকার সুবিধা বেশি লাভ করে।

কোনো প্রজাতি যখন প্রাধান্য লাভ করে তখন তা নতুন পরিবেশের সঙ্গে সহজে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয় এবং দীর্ঘ সময়ের পরিসরে নতুন প্রজাতির জন্ম দিতে পারে আকৃতি ও আচরণের ভিন্নতায়। এই প্রক্রিয়াকে এখন বলা হয় অভিযোজন-পরিব্যাক্তি। যেসব প্রত্যঙ্গ একই ভাবে গঠিত বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন রূপলাভ করে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পাদন করছে সেসবকে রিচার্ড ওয়েল বলেছেন সমসংস্থ প্রত্যঙ্গ। এর দৃষ্টান্ত হল মানুষের হাত, ঘোড়ার পা, শুশুকের প্যাডেল ও বাদুরের ডানা। এসব প্রত্যঙ্গের কঙ্কাল ও আপেক্ষিক অবস্থান প্রায় অভিন্ন। ফুলের ক্ষেত্রে পাপড়ি, পুংকেশর ও গর্ভকেশর ভিন্ন ভিন্ন কাজ সম্পন্ন করলেও এরা একইভাবে গঠিত। রিচার্ড ওয়েন একে দেখেছেন একটি পরিকল্পনার প্রমাণরূপে। কিন্তু ডারউইন এর মধ্যে বিবর্তনের পক্ষে জোড়ালো প্রমাণ দেখতে পেয়েছেন।

পূর্বপরিকল্পনার ভিত্তিতে সবকিছুর সৃষ্টি। এমন মতবাদের সমর্থনে একজনের প্রত্যাশা হবে প্রাণীদের শ্রেণীভাগে সেইসব প্রত্যঙ্গ নির্ধারণী গুরুত্ব রাখবে যা এদের জীবনধারাকে পরিচালনা করে। সেক্ষেত্রে তিমিকে মাছের সঙ্গে ও ইঁদুরকে মুসিক জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে একই শ্রেণীতে ফেলবে না। ডারউইনের যুক্তি হল এই দুই জোড়া প্রাণী একই ধরনের জীবনযাপন করলেও এদের উদ্ভবের ইতিহাস ভিন্ন। জীবের বিবর্তনের পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ ডারউইন খুঁজেছেন ভ্রূণবিজ্ঞানে। স্ন্যপায়ী প্রাণী, পাখি, টিকটিকি এবং সাপের প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণে গভীর মিল পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেছেন স্পিরিটে সংরক্ষিত দুটো আদি ভ্রূণের মধ্যে কোনটি টিকটিকি, পাখি বা স্ন্যপায়ী প্রাণীর তা সনাক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মানুষ ও কুকুরের প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রূণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে মানুষের ভ্রূণে উপক্রান্ লেজের উপস্থিতি এবং দুটো ভ্রূণেই দেখা গেছে মাছের উপক্রান্ ফুলকা। ডারউইন খুব সাবধানে ও ইঙ্গিতপূর্ণভাবে এ সম্পর্কে উক্তি করলেও তাঁর সমর্থকরা এটা স্পষ্ট করে প্রকাশ করেন যে ধাপগুলোর ভিতর দিয়ে প্রাণীদের বিবর্তন ঘটেছে তার সেই ধাপগুলো ভ্রূণের মধ্যে পরিলক্ষিত।

ডারউইন তাঁর *The Origin of species* গ্রন্থে মানুষের বিবর্তনের কথা আলোচনা করেননি। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেন যে এটি তাঁর তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হবে। শেষে যদি তাঁকে কেউ প্রশ্ন বা সমালোচনা করে এ বিষয়ে, তাই তাঁর বইয়ের পরিশেষে উল্লেখ করেন মানুষের উদ্ভব ও তাঁর বিকাশের ইতিহাসের বিষয়টি পরবর্তীতে আলোকপাত করা হবে।

ডারউইনের তত্ত্ব অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির সমালোচনা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। ডারউইনের প্রাক্তন শিক্ষক ভূবিজ্ঞানী অ্যাডাম সেজউইক ডারউইনের বইটি পড়ে গভীরভাবে মর্মাহত হন। এমনকি চার্লস লায়েল ভূবিজ্ঞানে যাঁর বিবর্তন ধারণা ডারউইনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তিনিও ডারউইনের তত্ত্বকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না উচ্চতর অদৃশ্য

কোনো শক্তির প্রভাবের কথা এই তত্ত্বে স্বীকার করা হয়নি বলে। বৃটিশ প্রত্নজীববিদ্যা বিশারদ রিচার্ড ওয়েন প্রকাশ্যে কিছু না বললেও আড়ালে এই তত্ত্বের বিরোধিতা করছিলেন। জেন কারলাইল যার উল্লেখ করেছেন 'সীসার মিষ্টি স্বাদে'র সঙ্গে। এই ব্যাপক প্রতিকূলতার মধ্যে ডারউইনের প্রস্তাবনার সঙ্গে সবচেয়ে সরব ও প্রভাবশালী সমর্থক ও প্রবক্তা ছিলেন টমাস হাক্সলি।

১৮৬০ সালের জুন মাসে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে বৃটিশ এসোসিয়েশন। রিচার্ড ওয়েনের শেখানো যুক্তির উপর নির্ভর করে বিশপ উইলবারফোর্স দীর্ঘ সময় ধরে ব্যঙ্গাত্মক ও আলঙ্কারিক ভাষায় ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। যদিও নিজে তিনি জীববিজ্ঞানী ছিলেন না। তিনি হাক্সলিকে উদ্দেশ্য করে শ্লেষের সঙ্গে প্রশ্ন রাখলেন তিনি যে বানরের বংশধররূপে এসেছেন সেটা কি পিতামহ অথবা মাতামহের দিক থেকে? এটা ছিল উইলবারফোর্সের দুর্ভাগ্য যে তিনি হাক্সলির মতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির একজন জোরালো বক্তাকে আক্রমণ করে বসেছিলেন। হাক্সলি জবাব দিতে উঠে বললেন তিনি সেই সভায় এসেছেন বিজ্ঞানের স্বার্থে। ডারউইনের তত্ত্ব সে সময়ের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রজাতির উদ্ভব সম্পর্কে। বিশপের কথা অনুসারে তাঁর পূর্বপুরুষরূপে বানর কে মেনে নিতে তাঁর কোনো লজ্জা নেই। তবে তিনি বিশপের মতন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হওয়াকে লজ্জার ব্যাপার মনে করেন, যিনি তাঁর ক্ষমতাকে ব্যবহার করছেন সত্যকে আড়াল করতে। সমস্ আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। একজন মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। ডারউইনের বিগল্ অভিযাত্রার ক্যাপ্টেন ফিজরয় চিৎকার করে তার হাতের বাইবেল নাড়াতে থাকলেন বাতাসে। গল্প ছড়িয়ে পড়লো হাক্সলি বলেছেন তাঁর বানর হতেও আপত্তি নেই কিন্তু আপত্তি আছে বিশপ হতে।

বিবর্তনের জন্য টিকে থাকার সংগ্রাম একটি বড় প্রভাব রাখে। ডারউইনের তত্ত্বের আড়ালে সে সময়ে অর্থনীতিতে প্রচলিত মুক্ত অর্থনীতির দর্শন সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বস্তুত ম্যালথাসের অর্থনীতির দর্শন পড়ে ডারউইন প্রভাবিত হয়েছিলেন। এটাও ধারণা করা হয় যে ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা থেকে ল্যামার্ক প্রেরণা লাভ করেন তাঁর মতবাদের। কুভিয়ের তাঁর ভূতত্ত্বে বিপর্যয়ের যে ধারণা উপস্থাপন করেন তার পেছনে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস প্রভাব রেখেছে মনে করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পরমাণু তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে তার পিছনে ডালটনের গামলা প্রীতি এবং বল খেলার জনপ্রিয়তাকে প্রেরণার উৎস মনে করেন অনেকে। আসলে কোনো তত্ত্বের ধারণা কীভাবে যে প্রথম আবিষ্কারকের মনে উদয় হয় স্বজ্ঞার ভিতর দিয়ে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কিন্তু কোনো তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে যে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, অভিজ্ঞতা অর্জন, যুক্তি প্রয়োগ, বিচার প্রক্রিয়া ও সৃষ্টিশীলতা প্রয়োজন তা সমন্বিতভাবে একজন সফল বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রেই শুধু ঘটে। এটি ঘটার সম্ভাবনা বিরল বলেই সার্থক ও সফল বিজ্ঞানীর সংখ্যা এত কম। সবচেয়ে বড় যে সমস্যা তা হল প্রচলিত অনেক তত্ত্ব নতুন তত্ত্ব সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরাই অনেক সময় বাঁধা হয়ে উঠেন তাঁদের ধারণা ও বিশ্বাসের জড়তা নিয়ে। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব এরকম সব ধরনের বাঁধার ভিতর দিয়েই অগ্রসর হয়েছে।

ডারউইনের সংগৃহীত বিপুল তথ্য ও তাঁর তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যাত ও ঘটনামালার বিপুল সংখ্যা তরুণ বিজ্ঞানীদের আকৃষ্ট করে থাকে। কারণ, অনেক যৌক্তিক ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্তভাবে জীবজগতকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল এই তত্ত্বের আলোকে যা সম্ভব ছিল না বিশেষ বিশেষভাবে বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টি হবার ধারণাকে ভিত্তি করে। একটি সার্থক তত্ত্বের বড় বৈশিষ্ট্য হল এর নতুন প্রশ্ন উত্থাপনের ও নতুন গবেষণার পথ সৃষ্টির ক্ষমতা। ডারউইনের তত্ত্ব নতুন জীবাশ্ম সন্ধান এদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া বয়স নির্ধারণ ও সব তথ্যকে যৌক্তিকভাবে বিন্যস্ করার ভিতর দিয়ে গবেষণাকে উৎসাহিত করলো। এই তত্ত্ব মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস-দার্শনিক চিন্তা ও প্রচলিত ধর্মীয় সৃষ্টিবাণীর ধারণাকে গভীরভাবে নাড়া দিল এবং আধুনিক প্রাণীবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ও জেনেটিক্সের পথ সৃষ্টি করলো। মেন্ডেলের আবিস্কৃত যে নিয়ম বংশগতির সঞ্চরণ সম্পর্কে তা প্রথমে ইঙ্গিত দেয় ডারউইনের তত্ত্বের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে জনপুঞ্জ বংশগতিবিদ্যার উন্মেষ আর বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব গঠনের পর অত্যন্ত পরিষ্কারভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে বংশগতি সঞ্চরণের সম্পর্ক আবিস্কৃত হয়। জীবের বিবর্তন সম্পর্কে ডারউইনের প্রস্তাবনার সংকট দূরীভূত হয়। যে দুটি মূল নিয়ম মেন্ডেল আবিষ্কার করেন পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা পরিচালনা করে তার একটি হল পৃথককরণের নিয়ম, অন্যটি হল স্বাধীনভাবে জন্মগত বৈশিষ্ট্য বিন্যস্ করার নিয়ম। পৃথক করার নিয়মটি হল প্রাণীর মধ্যে বংশাণুক্রমিক বৈশিষ্ট্য জোড়ায় জোড়ায় থাকে। যেমন লম্বা হবার বৈশিষ্ট্য ও খর্বআকৃতির হবার বৈশিষ্ট্য। এরা এদের বৈশিষ্ট্য বংশাণুক্রমে সংরক্ষণ করে। প্রজননের সময় এই বংশাণুক্রমিক বৈশিষ্ট্য ধারক উপাদান যুগল পৃথক হয়ে যায়। স্বাধীনভাবে এই উপাদান বিন্যস্ করার নিয়ম অনুসারে পৃথক পৃথকভাবে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুতে এই উপাদান যুক্ত হয় এলোমেলো স্বাধীন নির্বাচনে। এদের মধ্যে বেশি প্রভাবশালী ও কম প্রভাবশালী উপাদান এলোমেলো মিশ্রণে কীভাবে বিন্যস্ হবার সম্ভাবনা পেল তার ভিত্তিতে নতুন প্রজন্ম তার বৈশিষ্ট্য লাভ করে।

মেন্ডেলের তত্ত্ব যখন দানা বেঁধে উঠছিলো তখন মনে করা হতো জীবজগতে বিবর্তন ঘটে বড় বড় ধাপে। ফলে অনেকে ধারণা করেছিলেন, ডারউইনে বিবর্তনের যে ছোট ছোট ধাপের কথা বলেছেন তা যে কোনো পরিকল্পনাহীনভাবে ঘটে তা সম্ভবত সঠিক নয়। কিন্তু জিন তত্ত্বের উদ্ভবের ফলে দেখা গেল জীবজগতে বড় ধাপের পরিবর্তন আসলে স্বাভাবিক ঘটনা নয়। এর কারণ জেনেটিক-মিশ্র সৃষ্টি ও এর কার্য প্রক্রিয়া। কোনো একটি জিনের মিউটেশনের প্রভাব জেনেটিক মিশ্রের অন্যান্য জিন প্রশমিত করে। ফলে বড় ধাপে বিবর্তন ঘটে না–যা ছিল ডারউইনের অনুমান।

জিন তত্ত্বের একটি বড় প্রভাব হল একদিকে এটি ব্যাপকতর জেনেটিক পার্থক্য অনুমোদন করে, অন্যদিকে এই তত্ত্ব জেনেটিক স্থিতিশীলতা দেয়। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনে কোনো পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্য না থাকলেও নিয়ম মেনে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে পরিবেশের সঙ্গে আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা লাভের ভিতর দিয়ে। জীবের পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন

বেশি ঘটলে পরিবর্তিত পরিবেশে টিকে থাকা কঠিনতর হয়ে পড়ে। পরিবেশ তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আপাতঃ গতিপথে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ ডারউইন জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করে গেছেন। মানুষ যে এইপ ধরনের প্রাইমেট থেকে বিবর্তনের ভিতর দিয়ে এসেছে তা তিনি তাঁর ১৮৭১ সালে প্রকাশিত *মানুষের উদ্ভব* গ্রন্থে তুলে ধরেন। তাঁর এ গ্রন্থের বক্তব্য অনেকের কাছে ধর্মবিরোধী ও মানসিক যন্ত্রনাদায়ক মনে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ বিজ্ঞানী মহল তাঁর তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। বিশ্ব জুড়ে তাঁর খ্যাতি ও সম্মান ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল ডারউইনের মৃত্যুর পর সমাধিস্থ করা হয় ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবির কবরখানায়, যেখানে শুয়ে আছেন স্যার আইজ্যাক নিউটন, স্যার জন হার্শেলসহ ইংল্যান্ডের অনেক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিত্ব।

ডারউইনের বিবর্তনভিত্তিক জীবনবৃক্ষ

এ. এম. হারুন অর রশীদ*

১. ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্ব

১৯৫৪ সালে আমি যখন হারওয়েলের অ্যাটমিক এনার্জি রিসার্চ এসটাব্লিশমেন্টে কয়েক মাস কাজ করার জন্য যাই তখন লন্ডনে দু-একদিন থাকতে হয়েছিল। মনে আছে, আমি প্রথমেই লন্ডনের বিখ্যাত হাউস অব কমন্স এবং ওয়েস্টমিন্স্টার অ্যাবি দেখতে যাই। প্রথমটা হলো গণতন্ত্রের সূতিকাগার এবং দ্বিতীয়টা আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকজন স্রষ্টার সমাধিস্থল—

বিশেষ করে আইজাক নিউটনের সমাধি এই অ্যাবিতেই আছে তা আমি জানতাম। আমি যখন এই সমাধির পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে, তখন অনুভব করলাম যে একজন পাদ্রি সন্র্পণে আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং খুব নিচু স্বরে বললেন, "মহাশয়, আপনি কি দয়া করে আপনার মাথার টুপিটি খুলে ফেলবেন?" ইউরোপীয় আচার-ব্যবহার, সভ্যতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের রীতিনীতি সম্বন্ধে এটাই আমার প্রথম পরিচয় এবং আমি তাড়াতাড়ি মাথা থেকে টুপি নামিয়ে বললাম, "মহাশয়, আমি সত্যিই আন্রিকভাবে দুঃখিত।"

পৃথিবীর সব সভ্য দেশে সাধারণ মানুষ তাদের মহান নাগরিকদের প্রতি এভাবেই সবসময় সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। বিশেষ করে লন্ডনের ওয়েস্টমিন্স্টার অ্যাবির বৈজ্ঞানিকদের কর্ণার তো ইংরেজদের একটি সত্যিকারের তীর্থস্থান। এখানে যে-কতজন বিখ্যাত ব্যক্তি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন তা আমি এখন আর বলতে পারব না কিন্তু মনে আছে ঐদিন দেখেছিলাম সর্বকালের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে আইজাক নিউটন, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, মাইকেল ফ্যারাডে, উইলিয়াম হের্শেল এবং চার্লস রবার্ট ডারউইনের সমাধি। ডারউইনের সমাধির পাশেই একটি ছোট্ট পরিচিতি ফলকে উৎকীর্ণ করা আছে :

জন্ম: ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৮০৯
মৃত্যু: ১৯ এপ্রিল, ১৮৮২

* এ. এম. হারুন অর রশীদ : অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মনে আছে আমি নিউটন, ডারউইন এবং অন্যান্যদের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচিতি পড়ার সময়ে মনে করছিলাম যে যে-জাতি এতগুলি বিখ্যাত মানুষের জন্ম দিতে পারে সে জাতি মোটেই সাধারণ জাতি নয়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আইজক নিউটিন এবং চার্লস ডারউইন শুধু যে তাঁদের সমসাময়িক সমাজকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন তা-ই নয়, তাঁরা পৃথিবীর মানুষকে শিখিয়েছিলেন কীভাবে বিশ্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে হয়। বিশ্বের সৃষ্টি এবং মানুষসহ অসংখ্য প্রজাতির উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা শুরু হয়েছে নিউটন এবং ডারউইনের পথিকৃৎ কাজের মধ্য দিয়েই। নিউটনের *প্রিন্সিপিয়া* এবং ডারউইনের *অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ* বিশাল সব বৈজ্ঞানিক কাজের মধ্যেও এককথায় অনন্যসাধারণ কেননা এখানেই আমরা পাই যুগান্তকারী বৈপ্লবিক সব নতুন তত্ত্ব যার চর্চা মানুষের সভ্যতাকে আজকের পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। বহুকাল পরে আমাদের জীবনে একই ধরনের বিপ্লব আমরা ঘটাতে দেখেছি অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং শ্রডিঞ্জার-হাইসেনবার্গ-ডিরাকের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার সময়ে যা মানুষের ইতিহাসকে আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছে।

অনেক সাধারণ মানুষ আপেক্ষিক তত্ত্ব বোঝেন না, কোয়ান্টাম তত্ত্বও বোঝেন না এবং এমনকি ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্বও খুব যে ভালোভাবে বোঝেন তা-ও বোধ হয় বলা যায় না। আপেক্ষিক তত্ত্ব বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব বেশ গাণিতিক তাই সে-সম্বন্ধে সাধারণ্যে কৌতূহল স্বাভাবিকভাবেই অনেক কম। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্ব প্রথম থেকেই শুধু যে মৌলবাদী ধর্মীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে তা-ই নয়, এই তত্ত্ব একসময়ে পদার্থবিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিদদেরও সমালোচনার মুখে পড়েছে। কেননা তাঁরা পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে পৃথিবীর বয়স এমনটা হতে পারে না যা বিবর্তন তত্ত্বের বিশাল সময়-মাপকাঠি দাবি করে। ১৮৬২ সালে ডারউইন হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে পৃথিবীর বয়স প্রায় তিরিশ কোটি বছর পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের কেল্টের উন্মুক্ত প্রান্তরের চুনাপাথর শিলার ক্ষয়সাধন প্রক্রিয়া থেকে। লর্ড কেলভিন এই ভৌত পদ্ধতি ব্যবহার করে বলেছিলেন যে "এই চুনাপাথরের খাড়া পাহাড় ক্ষয় হয়েছে অধ্যাপক ডারউইনের হিসেবের হাজার গুণ বেশি দ্রুততার সঙ্গে।"

আসলে দুজনেই ভুল করেছিলেন। ভিক্টোরিয় বিজ্ঞানে শক্তির উৎস সম্বন্ধে যেটুকু জানা ছিল তার বাইরে অন্য উৎসও আছে যেমন নিউক্লিয় তেজস্ক্রিয়তা এবং বাস্তবিকই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন দাবি করে আইনস্টাইনের শক্তি-ভরের সমতুল্যতার নীতি অর্থাৎ $E = mc^2$। এই অর্থে বলা যায় যে চার্লস ডারউইন আইনস্টাইনের এই বিরাট আবিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন। ডারউইন ১৮৮২ সালে যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন আইনস্টাইনের বয়স তিন বছর। বলা হয় যে ডারউইনের মৃত্যুর ষাট বছর পরে জৈববিবর্তন কেমন করে কাজ করে তার সবচেয়ে বিস্তৃত সুন্দর ব্যাখ্যা চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে জুলিয়ান হাক্সলি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *বিবর্তন: আধুনিক সংশ্লেষণ* (*Evolution: the Modern Synthesis*) প্রকাশ করেছিলেন ১৯৪২ সালে। সেসময় থেকে জৈববিবর্তন তত্ত্বে 'আধুনিক সংশ্লেষণ' ধারণার উৎপত্তি হয়েছে বলা চলে। অতি সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রান্সিস্কো আইআলা (Francisco J. Ayala) একটা পরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন যেখানে বিবর্তন-ক্ষমতার কার্যকারিতা সরাসরি মনিটর বা নিরীক্ষণ করা যায়। ফলের মাছির এক বিরাট জনসংখ্যা যা একটি মাত্র উৎস থেকে সৃষ্ট তাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। অর্ধেক রাখা হলো ১৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এবং অন্য অর্ধেক রাখা হলো ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। অন্য সব কিছু তাদের একই এবং তাদের নতুন সন্তান উৎপাদন করতে দেয়া হলো বছরে প্রায় দশটা বংশ এই হারে। বারো বছর পরে দেখা গেল যে শীতলতর কক্ষের মাছির গড় আকৃতি শতকরা দশভাগ বেশি বড় হয়েছে উষ্ণতর কক্ষের তুলনায়। দুই জনসংখ্যা পৃথক হয়ে গিয়েছে প্রতি বংশে শতকরা ০.০৮ এই হারে। মাইকেল জে. হোআইট এবং জন আর. গ্রিবিন তাঁদের '*Darwin: A Life in Science*' গ্রন্থে লিখেছেন : "ডারউইনীয় বিবর্তন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে দেখা গেল।"

১৯৪৩ সালের মধ্যেই মেন্ডেলীয় উত্তরাধিকারে ক্ষুদ্র পরিব্যক্তির (মিউটেশন) গুরুত্ব এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের কেন্দ্রীয় ভূমিকা সবই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই জিন চিহ্নিত হয়েছিল ক্রোমোজোমের অংশ হিসেবে এবং কীভাবে বংশ থেকে বংশান্তরে বংশগতি সম্বন্ধীয় উপাত্ত চলে যায় তা-ও পরিষ্কার হওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু তখন পর্যন্ত কেউ জানতেন না ঐ জিন এবং ক্রোমোজোম ঠিক কী দিয়ে তৈরি এবং কীভাবে জেনেটীয় তথ্য সঞ্চয় করে রাখা হয়। এটাই ফ্রান্সিস ক্রিক এবং জেমস ওয়াটসন সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন তাঁদের সুবিখ্যাত ডিএনএ সংগঠন দিয়ে যাকে বলা হয় জীবনের অণু। ট্রিয়েস্টের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে এই সময়ে ফ্রান্সিস ক্রিকের বক্তৃতা আমার শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল যখন তিনি তাঁর এই আবিষ্কার অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ক্রিক ব্যাখ্যা করেছিলেন কেমন করে ক্রোমোজোম তৈরি হয় ডিএনএ দিয়ে যেখানে ডিএনএ অণু হলো একটা বৃহৎ অণু যার আকৃতি একটা দ্বৈত কম্বুরেখা (double helix)। যে তথ্য একটি কোষকে বলে দেয় তার কাজ কেমন করে করতে হবে এবং জীবন প্রক্রিয়ার কাজ কেমন করে চলমান থাকবে তা-ই ডিএনএ অণুর বরাবর সাজিয়ে রাখা হয় সারি সারি রাসায়নিক এককের মাধ্যমে যারা তৈরি করে চার-অক্ষরের একটা জেনেটীয় সংকেতলিপি বা বর্ণমালা। পরিব্যক্তি বা মিউটেশন ঘটে, যখন এই জেনেটীয় সংকেতলিপির কিছু অংশ ঠেলাঠেলি করে জিন প্রতিলিপি তৈরি করতে থাকে, হয় একটা অক্ষর অন্য অক্ষর দিয়ে অথবা ডিএনএর একটা পুরো অংশকে আকস্মিকভাবে অন্য কোনো জায়গায় জোড়া দিয়ে একত্র করে অথবা একখণ্ড ক্রোমোজোম উল্টো করে দিয়ে ইত্যাদি।

ডিএনএ গবেষণার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলসমূহের অন্যতম হলো এই আবিষ্কার যে মানুষের জেনেটীয় বস্তু শুধু শতকরা ১ থেকে ২ অংশে তফাৎ হয় আফ্রিকার বানরের অর্থাৎ গরিলা ও শিম্পাঞ্জির জেনেটীয় বস্তু থেকে। সুতরাং আফ্রিকার বানরের পূর্বপুরুষরা পৃথিবী পৃষ্ঠে ৪০-৫০ লক্ষ বছর পূর্বে মানুষের পূর্বপুরুষদের মতোই ছিল। বিবর্তন তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে এ-কথার অর্থ হলো এই যে আজকের মানুষরা শতকরা ৯৯ ভাগ বানর এবং শুধু ১ ভাগ তারা সুস্পষ্টভাবে মানুষ। মানুষের শরীরের গঠন থেকেই দেখা যায় আফ্রিকার বানরের সঙ্গে

আমাদের নিকট সম্পর্ক। মানুষের বিবর্তনে একটা নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছিল যখন হোমো ইরেক্টাস (*Homo erectus*), যাদের মস্কিষ্কের আকৃতি ছিল ৯০০ সিসি, তা নিয়ান্ডারথাল মানুষে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল যাদের মস্কিষ্কের আকৃতি ছিল ১৪০০ সিসি।

১৯৯০ সালের দিকে মানুষের বিশিষ্টতার শেষ চিহ্ন ছিল আমাদের কথা বলতে পারার ক্ষমতা যার ফলে আমরা সক্রিয়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে জটিল ভাব আদান-প্রদান করতে পারি। ভাষা কীভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ডারউইনীয় প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়ে এসেছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি, কিন্তু সন্দেহ নেই যে ভবিষ্যতে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। আমাদের নিজেদের বুঝবার সম্ভাবনা রয়েছে অপরিমেয় এবং এটা বেশিরভাগই সম্ভব হবে চার্লস রবার্ট ডারউইনের আবিষ্কারসমূহের জন্যে। চার্লস ডারউইন কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন না কিন্তু তাঁর পিতামহ একজন মোটামুটি নামকরা কবি ছিলেন। চার্লস রবার্ট ডারউইনের *অন্য দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ*-এর শেষ অনুচ্ছেদ প্রায় গীতধর্মীই বলা চলে:

> "সুতরাং প্রকৃতির যুদ্ধ থেকে, দুর্ভিক্ষ এবং মৃত্যু থেকে সরাসরি উদ্ভব হয়ে সবচেয়ে যা আমরা চিন্া করতে পারি এমন মহিমান্বিত বস্তুতে পরিণত হয়েছিল অর্থাৎ উচ্চতর প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। জীবনের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বিশালত্ব আছে যেখানে আছে তার বিভিন্ন ক্ষমতা যা স্বল্প কয়েকটা রূপে অথবা একটিতে প্রথমে জীবনের প্রশ্বাস সঞ্চারিত হয়েছিল; এবং পরে যখন এই গ্রহ নির্দিষ্ট অভিকর্ষ আইন অনুসারে চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে চলেছে, তখন এত সহজ আরম্ভ থেকে শুরু হয়ে জীবন বিবর্তিত হয়েছে এবং এখনও বিবর্তিত হচ্ছে অসংখ্য রূপে যা অত্যন্ সুন্দর এবং অত্যন্ বিস্ময়কর।"

এই বিখ্যাত আলঙ্করিক উপসংহারে পরবর্তীতে অনেককিছু একসঙ্গে ঢোকানো হয়েছে কিন্তু আমরা শুধু দু-একটি কথাই আলোচনা করতে পারি। জীবনের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা বিশাল মহিমা আছে, এমনকি প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর উদাসীনতার প্রতিও এক ধরনের মমত্ববোধ আছে কেননা এর জন্যে তার পরিচালনা নীতির এক অবশ্যম্ভাবী ফল হয় যোগ্যতমের উদ্বর্তন। ডারউইন টিকে থাকার সংগ্রামের আলোচনা এই কথা বলে শেষ করেছেন,

> "আমরা যা করতে পারি তা হলো সবসময়ে মনে রাখা যে প্রতিটি জীবসত্তা তার সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে; প্রত্যেকটিকে তার জীবনের কোনো এক সময়ে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় এবং বিরাট বিনাশের সম্মুখীন হতে হয় ... মৃত্যু সাধারণত দ্রুত এবং যারা বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান এবং সুখী তারাই বেঁচে থাকে এবং বংশবৃদ্ধি করে।"

অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ-এর শেষ অনুচ্ছেদ থেকে এখানে যে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা পরবর্তী সংস্করণে, বিশেষ করে ষষ্ঠ সংস্করণে, সামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে জীবনের প্রশ্বাস 'প্রথমে সঞ্চারিত হয়েছিল সৃষ্টিকর্তার দ্বারা'। এটা সম্ভবত করা

হয়েছিল জনমত খুশি করার জন্যে কিন্তু প্রশ্ন হলো 'জীবনের প্রশ্বাস সঞ্চারিত' হওয়ার অর্থ কী? জীবন এবং জীবনহীনতার মধ্যে পার্থক্যকরণ বস্তুর বা জিনিসের অভাব নয় বরং তথ্যের অভাব। জীবন্ বস্তুর মধ্যে থাকে বিপুল পরিমাণ তথ্য যার বেশিরভাগই ডিএনএ বা এই ধরনের অণুতে ডিজিটীয় পদ্ধতিতে সংকেতায়িত। ডিএনএর ক্ষেত্রে আমরা আজকাল ভালোভাবেই বুঝি কেমন করে তথ্যভাণ্ডার তৈরি হয় ভূতাত্ত্বিক সময়ের প্রেক্ষাপটে। ডারউইন এটাকেই বলেছিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং আমরা বলতে পারি তথ্যের অসমরূপ বেঁচে থাকা যার মধ্যে থাকে ভ্রূণ পর্যায়ের বাঁচার নিয়ম-নির্দেশাবলি। ডিএনএ তথ্যের সংরক্ষণ এবং বিস্ার সাধারণত বলে যেসব বস্তু এটা ধারণ করে তাদের টিকে থাকা এবং পুনরুৎপাদন এসবের নিয়মাবলি। ডারউইন এটাই বলেছিলেন তাঁর যোগ্যতমের উদ্বর্তন এই ধারণার মাধ্যমে এবং এটা বিংশ শতাব্দীতে এসে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।

পুনরুৎপাদন যখন যৌনমিলন-ঘটিত তখন ডিএনএ এক-দেহ থেকে অন্য-দেহে যায় এবং তা-ই টিকে থাকার তথ্যভাণ্ডার বা ডাটাবেজ নির্দেশাবলি যা প্রজাতির জিনকুণ্ড (Gene pool)। প্রতিটি ব্যক্তির বা সত্তার জেনোম যে-কোনো বংশে হবে প্রজাতির তথ্যভাণ্ডারের একটা নমুনা। বিভিন্ন প্রজাতির থাকবে বিভিন্ন তথ্যভাণ্ডার কেননা তাদের পূর্বসূরিদের পৃথিবী ভিন্ন। উটের জিনকুণ্ডে তথ্যভাণ্ডার যে তথ্য সংকেতায়িতভাবে রক্ষিত তা বলে দেয় মরুভূমিতে কীভাবে বেঁচে থাকা যায়। বাংলাদেশে আমাদের জিনকুণ্ডে থাকে কীভাবে ঝড়-বৃষ্টি বন্যা-প্লাবনে কেমন করে বাঁচা যায় সেই তথ্য। আবার সব জিনকুণ্ডের ডিএনএ সে-তথ্যও রাখে কেমন করে ক্ষতিকর পরভূক জীবাণুর আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকা যায়।
এই জিনকুণ্ডের প্রথম স্মৃতি হলো ডিএনএ ভাণ্ডার যার মধ্যে আছে পূর্বসূরিদের টিকে থাকার পদ্ধতিসমূহ। দ্বিতীয় স্মৃতি হলো রোগ সংক্রান্ এবং সেখানে প্রোটিনের ভাষায় লিখিত থাকে কেমন করে রোগের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকা যায় অর্থাৎ অ্যান্টিবডির মাধ্যমে বেঁচে থাকার উপায়। তৃতীয় স্মৃতি হলো আমাদের সাধারণ স্মৃতি যা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে থাকে এবং ভ্রান্তি ও সংশোধন করার পদ্ধতিতে যা কাজ করে। কোনো প্রাণী যখন খাদ্য খোঁজে তখন পরীক্ষা করে সে দেখে যে তা খাদ্য কি না, না হলে সে অন্যত্র চেষ্টা করে। এই তৃতীয় স্মৃতি থেকে তৈরি হয়েছে চতুর্থ স্মৃতি। আপনার এবং আমার মস্কিষ্কে রয়েছে সম্মিলিত এক স্মৃতিসম্ভার যা বংশানুক্রমে আমরা পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে হয় মুখের কথায়, অথবা বইপত্র থেকে অথবা আজকাল ইন্টারনেট থেকে। আমাদের পৃথিবী অনেক সমৃদ্ধ আমাদের নিউটন, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল দিয়ে এবং অবশ্যই ডারউইন দিয়ে। এই চারটি স্মৃতি হলো বেঁচে থাকার বিশাল যন্ত্রের বিরাট

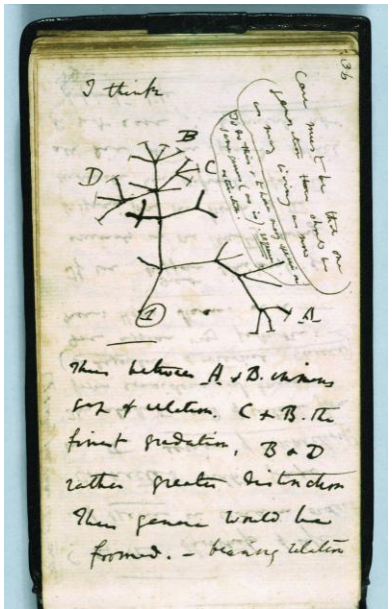

উপরি কাঠামো যা তৈরি হয়েছে ডিএনএ টিকে থাকার ডারউইনীয় প্রক্রিয়ায়।

২. 'জীবনবৃক্ষ' আরো বেশি জটিল

১৮৩৭ সালের জুলাই মাসের কোনো একদিন চার্লস ডারউইন অনুপ্রেরণার একটি চকিত চমক পেয়েছিলেন। লন্ডনে তাঁর গৃহে পড়ার ঘরে বসে তিনি তাঁর লাল চামড়ার নোটবই-এর একটি নতুন পাতা খুলে লিখলেন 'আমি ভাবছি' এবং পরে একটা লম্বা-সরু গাছের নক্সা আঁকলেন। যতদূর জানা যায় এই প্রথম ডারউইন জীবনবৃক্ষের ধারণা নিয়ে খেলা করেছিলেন যা নিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিবর্তনভিত্তিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়। এই ধারণা ফলপ্রসূ ধারণা হিসেবেই পরে প্রমাণিত হয়েছে। বাইশ বছর পরে তিনি যখন তাঁর *অন দ্য অরিজিন অব স্পিসিজ* প্রকাশ করেন তখন ডারউইনের শীর্ণ গাছ বিকশিত হয়ে একটা বিরাট ওক-বৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এই গ্রন্থে ওই গাছের অনেক প্রসঙ্গ এসেছে এবং তার একমাত্র রেখচিত্র হলো একটা শাখাবহুল সংগঠন যা দেখায় কেমন করে এক প্রজাতি বহু প্রজাতিতে বিবর্তিত হয়।

এই জীবনবৃক্ষের ধারণা ডারউইনের চিন্তামানসে সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছিল যার গুরুত্ব প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতোই। জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই ধারণা ছাড়া বিবর্তন-তত্ত্ব কখনোই সৃষ্টি হতো না। এই জীবনবৃক্ষই বিবর্তনকে জয়ের সম্মুখীন করতে সাহায্য করেছে। ডারউইন সার্থকভাবে বলতে পেরেছিলেন যে জীবনবৃক্ষ প্রকৃতির একটি ঘটনা যা সবাই ব্যাখ্যা ছাড়াই বুঝতে পারবে। তিনি যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন তা হলো প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন। ডারউইনের পর থেকে এই জীবনবৃক্ষ দাঁড়িয়ে গিয়েছে একটা একত্রকরণের নীতি হিসেবে যা দিয়ে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির জীবনের ইতিহাস বোঝা যায়। এই বৃক্ষের একেবারে নিচে আছে 'লুকা' (LUCA) অর্থাৎ সব প্রাণীর সর্বশেষ (last) সর্বজনীন (universal) সর্বসাধারণ (common) পূর্বসূরি (ancestor); এবং এই লুকা-ই বিকশিত হয়েছে একটি গুঁড়িতে যা বার বার ভেঙে তৈরি করেছে একটা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত বিশাল এক বৃক্ষ। প্রতি শাখা বোঝায় একটি করে প্রজাতি এবং বিভক্ত হওয়ার বিন্দু বোঝায় যেখানে একটি প্রজাতি দুটি প্রজাতিতে ভাগ হওয়া। বেশিরভাগ শাখাই সবশেষে কানাগলিতে পৌঁছায় যখন প্রজাতিগুলি লোপ পেয়ে যায় কিন্তু কতকগুলি চূড়ায় পৌঁছে যায় যেগুলি হলো জীবন্ত প্রজাতি। সুতরাং জীবনবৃক্ষ হলো একটা দলিল যা দিয়ে বোঝা যায় যে জীবন সৃষ্টির মুহূর্ত থেকে কেমন করে প্রতিটি প্রজাতি অন্য সকল প্রজাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

বিগত দেড়শো বছর ধরে জীববিজ্ঞানের মূল কাজ ছিল এই জীবনবৃক্ষের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা। প্যারিসের জীববিজ্ঞানী এরিখ বাপটেস্টের ভাষায় : "বহুদিন পর্যন্ত শেষ নৈশভোজের পাত্র ছিল এই জীবনবৃক্ষ।"

অর্থাৎ শেষ নৈশভোজের সময় যীশু যে পাত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং যে পাত্রে জনৈক শিষ্য ক্রুশবিদ্ধ যিশুর রক্তবিন্দু ধারণ করেছিলেন সেই পাত্রটি খোঁজা। কিছুদিন আগে পর্যন্ত মনে হয়েছিল যে এই পাত্র বোধহয় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু আজ সেই প্রকল্প মনে হয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রচণ্ড আক্রমণে। অনেক জীববিজ্ঞানী এখন মনে করেন যে বৃক্ষের ধারণা সেকেলে এবং তা বাতিল করা প্রয়োজন। বাপটেস্ট বলেন যে "কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যা বলে যে জীবনবৃক্ষ একটা বাস্তবতা।"

এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে এমনকি অনেকেই এখন বিশ্বাস করেন যে আমাদের জীববিজ্ঞানের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রশ্ন হলো এই যে ব্যাপারটা তবে কী? এক কথায় ব্যাপারটা হলো ডিএনএ। ১৯৫৩ সালে ডিএনএ অণুর সংগঠন আবিষ্কারের ফলে বিবর্তনভিত্তিক জীববিজ্ঞানের নতুন দৃশ্যপরম্পরার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। এখানে সবশেষে পাওয়া গেল উত্তরাধিকারের মূল বস্তু যার মধ্যে অবশ্যই লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে জীবনের ইতিহাস, শুধু তা আমাদের পড়ে ফেলার অপেক্ষায়। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে আণবিক বিবর্তনের বিজ্ঞান এবং ডিএনএ অণুক্রম (sequence) পাঠ করার কৌশল যত আমাদের আয়ত্তে এসেছে এবং অন্যান্য জীব-অণু যেমন আরএনএ (RNA) ও প্রোটিন (protein) নিয়ে যত আমরা গবেষণা করেছি ততই আমরা বুঝতে পেরেছি যে এভাবেই পাওয়া যাবে ডারউইনের জীবনবৃক্ষের সম্পূর্ণ ইতিবাচক প্রমাণ। মূল ধারণাটি খুব সহজ। দুটি প্রজাতি যত কাছাকাছি (অথবা জীবনবৃক্ষে তাদের শাখাদ্বয় যত সাম্প্রতিক কালে বিভক্ত হয়েছে), ততই আবার তাদের ডিএনএ, আরএনএ এবং প্রোটিন অণুক্রম কাছাকাছি হবে।

ধারণাটি নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। প্রথম যে অণুকে অণুক্রমান্বয়ী বা সিকুয়েন্সড্ (sequenced) করা হয়েছিল সেটা ছিল রিবোসোমে প্রাপ্ত আরএনএ যা কোষে পোটিন-প্রস্তুতকারক যন্ত্র। ১৯৭০ সালের দিকে বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মাইক্রো জীবসত্তার আরএনএ অণুক্রম তুলনা করে আণবিক জীববিজ্ঞানীরা একটা বৃক্ষের রূপরেখা আঁকতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে অন্যান্য সাফল্যের সাথে একটা অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারও হয়েছিল অর্থাৎ জীবনবৃক্ষের একটা অজানা প্রধান শাখার আবিষ্কার হয়েছিল যার নাম দেয়া হয়েছে এককোষী আর্কিয়া (unicellular archaea) যা আগে ব্যাকটেরিয়া বলে মনে করা হতো।

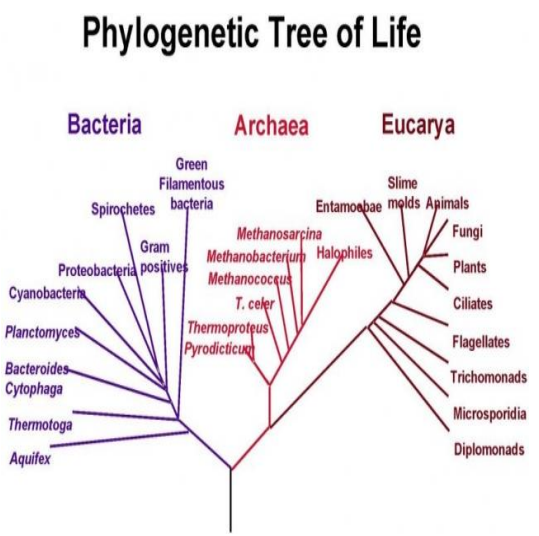

১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি এই আশাবাদ জোরালো হয়ে উঠেছিল যে আণবিক পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে তার সব মহিমার সঙ্গে প্রকাশ করবে সর্বজনীন জীবনবৃক্ষকে। কিন্তু উল্টোটাই হয়েছে। যা আশা করা যায় তা ঘটে না; এজন্যেই বিজ্ঞান এত মনোমুগ্ধকর এত চির নতুন।

সমস্যা শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালের প্রথমদিকেই যখন আসল ব্যাকটেরিয়া ও আর্কিয়ার জীনের অণুক্রমান্বয় করা সম্ভব হয়েছিল, শুধু আরএনএ নয়। সকলেই আশা করেছিলেন যে এই ডিএনএ অণুক্রম আরএনএ বৃক্ষকেই সমর্থন করবে। কখনো তা তারা করেছিল কিন্তু কখনো তা তারা করেও নি এবং এটাই সৃষ্টি করল সংকটের। উদাহরণস্বরূপ, আরএনএ অণুক্রম থেকে বলা গেল যে প্রজাতি A প্রজাতি C এর তুলনায় প্রজাতি B এর খুব কাছাকাছি কিন্তু দেখা গেল ডিএনএ থেকে পাওয়া জীবনবৃক্ষ ঠিক উল্টোটাই বলে।

কোনটা ঠিক? স্ববিরোধী হলেও উত্তর হলো এই যে দুটোই ঠিক। অবশ্য এই উত্তর সত্যি হতে হলে ডারউইনের বৃক্ষ ধারণার প্রধান ভিত্তির কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন। ডারউইন অনুমান করেছিলেন যে বংশগতি সম্পূর্ণ উল্লম্ব বা খাড়া যেখানে জীবসত্তা তাদের বৈশিষ্ট্য নতুন প্রজন্মকে দিয়ে যায়। কিন্তু প্রজাতি যদি নিয়মিতভাবে তাদের বংশগতিসম্পর্কীয় বস্তু অন্য প্রজাতির সঙ্গে বদলাবদলি করে অর্থাৎ যদি হাইব্রিডাইজেশন বা সংকরীকরণ ঘটে তাহলে কী হবে? তাহলে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার সুন্দর নক্সা খুব দ্রুত পরিণত হবে পরস্পর-সম্পর্কময়তার এক দুর্ভেদ্য জঙ্গলে যেখানে কোনো প্রজাতি শুধু অন্য কাছাকাছি প্রজাতির সঙ্গেই সম্পর্কিত থাকবে কিন্তু অন্যদের সঙ্গে নয়।

এখন জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এটাই ঘটেছিল। যত বেশি জিন অণুক্রমান্বিত করা হয়েছে ততই এটা স্পষ্ট হয়েছে যে সম্পর্কময়তার নক্সা ব্যাখ্যা করা যায় যদি ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিয়া নিয়মিতভাবে বংশগতির বস্তু অদলবদল করে অন্য প্রজাতির সঙ্গে যে পদ্ধতিতে তার নাম দেয়া হয়েছে আনুভূমিক জিন স্থানান্তর (horizontal gene transfer [HGT])।

প্রথমদিকে এইচজিটি মনে করা হয়েছিল একটা গৌণ ব্যাপার যা শুধু 'ঐচ্ছিক অতিরিক্ত' কাজই স্থানান্তর করে যেমন এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধ। মূল জীববৈজ্ঞানিক কাজ যেমন ডিএনএ হুবহু নকলকরণ এবং প্রোটিন সংশ্লেষণ তা উল্লম্বভাবেই স্থানান্তর হয়। কিছুদিন এভাবে জীববিজ্ঞানীরা এইচজিটি মেনে নিয়েছিলেন তাঁদের মূল্যবান জীবনবৃক্ষে হাত না দিয়েই। এইচজিটি শুধু কিছু গোলমাল যা বৃক্ষের কিছু ধার অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। কিন্তু এখন আমরা জানি যে এ-ধারণা ভুল। "এখন আমরা জানি যে বিভিন্ন দলের মধ্যে বংশগতি তথ্য নির্বিচারভাবে বিনিময় ঘটে"—বলেছেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইকেল রোজ।

সুতরাং বৃক্ষ থেকে জাল—এটা যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে এইচজিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তখন জীববিজ্ঞানীরা বৃক্ষ ধারণার তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা গভীরভাবে শুরু করেন। ১৯৯৩ সালের দিকে অনেকে প্রস্তাব করেন যে ব্যাকটেরিয়া এবং আর্কিয়ার জন্যে জীবনবৃক্ষটা আসলে একটা জালের মতো। ১৯৯৯ সালে ডুলিট্‌ল প্রস্তাব করেন যে 'জীবনের ইতিহাসকে সঠিকভাবে বৃক্ষ হিসেবে দেখানো যায় না।' (দ্রষ্টব্য : *Science*, vol 284, 1999, page 2124)। জীবনবৃক্ষ বলে এমন-কিছুর অস্তিত্ব প্রকৃতিতে নেই, এটা এমন একটা উপায় যা দিয়ে মানুষ প্রকৃতিতে শ্রেণিকরণ করে। এভাবেই বৃক্ষ নিয়ে চূড়ান্ত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অনেকে পুরানো ধারণাটিকে কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন। অন্যরা দাবি করলেন যে বৃক্ষের ধারণা বাতিল করাই উচিত।

২০০৬ সালে এই যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়। হাইডেলবার্গের পিটার বর্গের অধীনে একদল জীববিজ্ঞানী ১৯১টি অনুক্রমান্বিত জেনোম পরীক্ষা করলেন জীবনের তিন অঞ্চল থেকে—ব্যাকটেরিয়া, আর্কিয়া এবং স্বকেন্দ্রিক কোষ (Eukaryotes)—এবং তারা ৩১টি জিন চিহ্নিত করলেন যারা সব প্রজাতিতে রয়েছে এবং যাদের আনুভূমিক স্থানান্তরের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই মূল জিনগুলির অণুক্রম তারা তুলনা করলেন ই. কোলাই (*E. coli*) থেকে হাতি পর্যন্ত সব কিছুতে। এভাবে তারা পেলেন যাকে বলা যায় নির্ভুল বৃক্ষের নিকটতম উদাহরণ। (দ্রষ্টব্য : *Science*, vol 311, 2006, page 1283)।

অন্য গবেষকরা একমত হলেন না। এঁদের মধ্যে ছিলেন ডুসেলডর্ফের টি. ডাগান এবং উইলিয়াম মার্টিন যাঁরা বললেন যে ৩১টি জিনের ওপর পরীক্ষা আসলে 'শতকরা ১ ভাগ পরীক্ষা' এবং তাই অগ্রহণযোগ্য (দ্রষ্টব্য : *Genome biology*, 2006, vol 7, page 118)[+]।

তর্কটি এ অবস্থাতেই রয়েছে। বর্ক এবং সহকর্মীরা দাবি করেন যে যদিও এইচজিটি প্রভূত পরিমাণে ঘটেছে তবু জীনের অধিকাংশ বৃক্ষের সংকেতই দেখায়। অন্যদিকে ডাগান এবং তাঁর সহকর্মীরা ১৮১টি প্রাককেন্দ্রিক কোষের (Prokaryotes) প্রায় ৫ লক্ষ জিন পরীক্ষা করে তার শতকরা ৮০ ভাগে আনুভূমিক স্থানান্তর দেখতে পেয়েছেন। (দ্রষ্টব্য : *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2008, vol. 105, page 10039)[⊥]।

আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে সুকেন্দ্রিক কোষের মধ্যেও এইচজিটির-ই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন বিশ্বাস করা হয় যে সুকেন্দ্রিক কোষ তৈরি হয় দুটো প্রাককেন্দ্রিক কোষের সংমিশ্রণে যার একটা ব্যাকটিরিয়া এবং অন্যটা আর্কিয়া যারা এই পর্যায়ের বৃক্ষকে একটা অঙ্গুরি হিসেবে তৈরি করে, ঠিক শাখা নয় (*Nature*, Vol. 41, Page 152); এ সম্বন্ধে দেখুন *Trends in Ecology & Evolution, Volume 23*, Issue 5, Page 268। এই জেনেটিক 'যদৃচ্ছাচার' আজ পর্যন্ত চলছে। ইংল্যান্ডের জন ডুপ্রে বলেছেন : "জীবনবৃক্ষ যদি একটা থাকেও সেটা একটা ক্ষুদ্র বিষম সংগঠন যা জীবনের জাল থেকে বিকশিত হয়েছিল।"

অনেকেরই ধারণা যে জীব বিবর্তনে সংকরকরণই ছিল মূল চালিকাশক্তি এবং সে-প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত। লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের জেমস ম্যালেট বলেছেন, এটা আসলেই সাধারণ। সব প্রাণীর শতকরা দশভাগ নিয়মিতভাবে অন্য প্রজাতির সঙ্গে সংকর প্রক্রিয়াকরণ করে থাকে। এটা বিশেষ করে ঘটে দ্রুত বিকাশমান বংশধারায় যেখানে সাম্প্রতিককালের

[+] অনলাইন ঠিকানা : http://genomebiology.com/2006/7/10/118।

[⊥] অনলাইন ঠিকানা : http://www.pnas.org/content/105/29/10039.full।

আলাদা হয়ে-যাওয়া অনেক প্রজাতি রয়েছে—যেমন আমাদের প্রজাতি। এর প্রমাণ আছে যে প্রথমদিকের আধুনিক মানুষ সংকরকরণ করেছিল আমাদের বিলুপ্ত জাতিদের সঙ্গে যেমন হোমো ইরেক্টাস এবং নিয়ানডারথাল সংকরকরণ (দ্রষ্টব্য : *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, Vol. 363, no. 1489, January 2008, page 2813)* ।

আসল কথা এই যে ডারউইনের জীবনবৃক্ষ এখন আর বিবর্তন প্রক্রিয়া কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হচ্ছে না। তবে এ-কথার অর্থ এই নয় যে বিবর্তন তত্ত্ব সঠিক নয়। শুধু এটাই বলা যায় যে বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখার মতো জীববিজ্ঞানের বিবর্তনশাখারও অনেক কিছু আমাদের জানার বাকি আছে। ডুলিট্‌ল্‌ এর কথামতো : "আমরা বিবর্তন ভালোভাবেই বুঝি—কিন্তু এটা ডারউইন যেভাবে চিন্তা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল। বৃক্ষই একমাত্র নক্সা নয়।"

অন্যদিকে ডুপ্রে মনে করেন যে জীববিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসন্ন। "আমাদের 'প্রমাণ-বিবর্তন নক্সা' বেশ চাপের সম্মুখীন।" রোজ বলেছেন, "আমরা যা ভাবতাম তার চেয়ে জীববিজ্ঞান অনেক বেশি জটিল।"

"এই জটিলতা ততটাই ভীতিপ্রদ যা বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে পদার্থবিজ্ঞানীরা তাদের বিজ্ঞানে ধারণাগত ভূমিকম্পের মাধ্যমে সম্মুখীন হয়েছিলেন।"

এটা যদি সত্য হয় তাহলে জীববিজ্ঞানের বৃক্ষের ধারণা হয়ে উঠবে নিউটনীয় গতিবিজ্ঞানের সমতুল্য যা তার সময়ে বিশালভাবে সার্থক ছিল কিন্তু পরবর্তী বাস্তবজগতের দাবির সামনে অত্যন্ত সহজ সাধারণ প্রমাণিত হয়েছিল। বাপটেস্টের কথামতো : "জীবনবৃক্ষের ধারণা উপকারী ছিল। এটা অন্যদের বুঝতে সাহায্য করেছে যে বিবর্তন সত্যিই ঘটেছিল। কিন্তু এখন আমরা বিবর্তন সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু জানি। তাই সময় এসেছে এগিয়ে যাওয়ার।"

* অনলাইন ঠিকানা :
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/363/1505/2813.full ।

ডেভিলস্‌ চ্যাপলিন

দ্বিজেন শর্মা*

'মানুষের নিয়তি মানুষের চেয়ে শক্তিশালী কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত'—এই ভ্রান্তি থেকে মুক্তি লাভের কাহিনির নাম ডারউইনবাদ।'[১] এমন মতবাদের হোতাকে উনিশ শতকী ধর্মবিশ্বাসী ইংরেজদের পক্ষে 'শয়তানের সঙ্গী' নামে আখ্যায়িত করাটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। ডারউইন সৃষ্টিবাদে অবিশ্বাসী। তিনি যে এসব বিশেষণে বিভূষিত হবেন তা জানতেন আর সেজন্যে শয়তানের সঙ্গীর চেয়ে অধিকতর ব্যঙ্গাত্মক একটি অভীধা উদ্ভাবন করেছিলেন—'শয়তানের সঙ'। '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' নামের যে গ্রন্থের জন্য তিনি বিখ্যাত ও কুখ্যাত সেটা প্রকাশের তিন বছর আগে ১৮৫৬ সালে (১৩ জুলাই) সুহৃদ উদ্ভিদবিদ ডালটন হুকারকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বিশ্রী, বর্জতুল্য, সস্য ও মর্মবিদারী বিষয় নিয়ে এমন বই ডেভিলস্‌ চ্যাপলিনই তো লিখবে।'[২] স্বআরোপিত 'সঙ' ও তত্তুল্য আরও নানা বিশেষণ অতঃপর অনেক নিন্দুক ও সমালোচক ব্যবহার করেছেন। ডারউইনের তত্ত্ব মোটামুটি আমাদের জানা। অতি সরল কাঠামোর আদিপ্রাণ কোটি কোটি বছরের পথপরিক্রমায় প্রকৃতির নিয়মে পরিবর্তিত হতে হতে আজকের বিশাল ও বিচিত্র জীবজগৎ উৎপাদন করেছে। কোন সর্বশক্তিমানের খেয়ালে তা সাত দিন, সাত মাস, এমনকি সাত কোটি বছরেও সৃষ্টি হয় নি। বিজ্ঞানের নানা শাখা থেকে তিনি তাঁর মতবাদের পক্ষে অজস্র তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তবে এটুকুই সব নয়, আছে বিবর্তনের খোদ প্রক্রিয়াটিও, অর্থাৎ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। 'অরিজিন অব স্পিসিজ' গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য[৩] :

> একটি আঁকাবাঁকা নদীতীর নানা জাতের অজস্র তরুলতায় ঢাকা। গাছে গাছে পাখির কলকাকলি, ঝোপঝাড়ে কীটপতঙ্গের ওড়াউড়ি, সোঁদা মাটিতে কেঁচোর হামাগুড়ি। এই সুগঠিত সুসম্পূর্ণ জীবেরা পরস্পর থেকে একেবারেই পৃথক এবং একটি জটিল প্রক্রিয়ায় আবার পরস্পরের ওপর নির্ভরশীলও। তারা সকলেই আমাদের বেষ্টনকারী সক্রিয় নিয়মের আওতায় উৎপন্ন। গোটা ব্যাপারটি ভাবনায় ডুবে যাওয়ার মতো বড়ই চিত্তাকর্ষক। বহত্তর অর্থে দেখলে এই নিয়মগুলো হলো অত্যধিক বংশবৃদ্ধি, প্রজননে পরিস্ফুট বংশানুসৃতি, পরিবর্তনশীলতা, জীবনের

* দ্বিজেন শর্মা : বাংলাদেশের প্রখ্যাত নিসর্গবিদ এবং বিজ্ঞান-লেখক। দীর্ঘকাল বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ এবং ঢাকার নটরডেম কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। মস্কোর প্রগতি প্রকাশনে কাজের সুবাদে অনুবাদক হিসেবেও সুপরিচিত। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী : '*শ্যামলী নিসর্গ*', '*জীবনের শেষ নেই*', '*গহন কোন বনের ধারে*', '*চার্ল্‌স্‌ ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি*', 'ডারউইন : বিগ্‌ল্‌-যাত্রীর ভ্রমণকথা', '*সতীর্থ বলয়ে ডারউইন*' ইত্যাদি। আলোচ্য প্রবন্ধটি লেখকের অনুমতিক্রমে মাসিক *উত্তরাধিকার* (সম্পাদনা শামসুজ্জামান খান, অগ্রহায়ণ ১৮১৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা) সাহিত্য পত্রিকা থেকে সংগৃহীত।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার। বংশবৃদ্ধির অনুপাত এতই অধিক যে জীবদের সুকঠিন জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে হয় এবং ফলত প্রাকৃতিক নির্বাচনে ভিন্নতর ধরন ও স্বল্পোন্নতদের বিলুপ্তি ঘটে। এভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম, খাদ্যাভাব ও মৃত্যুর আবহ থেকে উন্নততর জীবেরা জন্মায় যা আমাদের পক্ষে কল্পনাসম্ভব এবং পরম আনন্দের একটি বিষয়। একটি চমকপ্রদ মতবাদ অনুসারে অভিকর্ষের চিরায়ত নিয়মে ঘূর্ণমান এই গ্রহে সৃষ্টিকর্তা সর্বপ্রথম খুব সীমিত ক্ষমতাধর একটি বা কয়েকটি সত্তায় প্রাণসঞ্চার করেন। সেই সূচনা থেকেই অতীব সুদর্শন ও বিস্ময়কর অজস্র গড়নের জীব উৎপন্ন হয়েছে ও হচ্ছে।

১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর 'অরিজিন অব স্পিসিজ' বইটি বাজারে আসার প্রথম দিনই পাঠকেরা লুফে নেয়। বিক্রির জন্য রাখা প্রথম সংস্করণের সবগুলো কপিই শেষ হয়ে যায়। ডেভিলস্ চ্যাপলিন ভালোই জানতেন তাঁর এই পরিচয়টি অচিরেই খোলসা হয়ে পড়বে, জিন-তাড়য়ারা তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজবে এবং কটুকথার ঢল নামবে। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্যে তিনি ডাউন গাঁয়ের নিভৃত নিবাস ছেড়ে লন্ডনে এলেন, বিজ্ঞানী ও বিদগ্ধজনের দুয়ারে দুয়ারে কড়া নাড়তে লাগলেন, কোথাও অনুকূল সাড়া মিলল না। ঈর্ষাকাতর রিচার্ড ওয়েনের কারসাজিতে ব্রিটিশ মিউজিয়াম শত্রুপুরী হয়ে উঠল। এককালের শিক্ষাগুরু স্টিভেনস হেনস্লো, মুখ্য পৃষ্ঠপোষক চার্লস লায়েল, প্রিয়বন্ধু ও সদাসহায় ডালটন হুকার সকলেই নিশ্চুপ। টমাস হাক্সলি শুধু এটুকুই বললেন যে, এটি কোনো তত্ত্ব নয়, বড় জোর একটি হাইপোথেসিস। ভূতত্ত্ব সমিতির সভাপতি ও পারিবারিক বন্ধু এডাম সেজউইক বইটি পড়ে ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত। আমেরিকা, ফ্রান্স ও জার্মানির বিজ্ঞানীরা 'প্রজাতির উৎপত্তি'কে ভ্রান্ত তত্ত্ব বলে নাকচ করলেন। সমধিক শোরগোল তুললেন বিগল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিট্সরয়। ইতোপূর্বে তিনি ডাউন গাঁয়ে গিয়ে ডারউইনকে বইটি লেখা থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করেছিলেন। এবার প্রকাশ্যে বলতে লাগলেন, একটি 'কেউটে সাপকে' তাঁর জাহাজে আশ্রয় দেওয়া বড় ভুল হয়ে গেছে এবং এই পাপস্খলনের জন্যে বিনামূল্যে জনসাধারণ্যে বাইবেল বিলি করতে লাগলেন। হতাশ ডারউইন অগত্যা ডাউন গ্রামের নির্জনে পুনরায় ফিরে গেলেন।

কিন্ অচিরেই ডারউইনের বিরোধিতা বিজ্ঞান-বিরোধিতার রূপ পরিগ্রহ করল এবং উদারপন্থি বিজ্ঞানীরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। ডারউইনের বন্ধুদের মধ্যে হেলস্লো, লায়েল ও হুকার ধর্মবিশ্বাসী, হাক্সলি সংশয়বাদী। চার্চ ও কুচক্রীদের তাণ্ডবে এঁদের পক্ষে নিরপেক্ষতার আড়ালে থাকা আর সম্ভব হলো না। তাঁরা সম্ভবত অরিজিন অব স্পিসিজের শেষ পরিচ্ছেদের শেষবাক্যে বিবর্তন তত্ত্বের সমর্থনের সহায়ক যুক্তি খুঁজে পান। সৃষ্টিকর্তা প্রথমে প্রাণ সঞ্চার করে থাকলে বিবর্তনের বাকিটুকু প্রকৃতির পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব এবং এই প্রক্রিয়াটি উদ্ঘাটন মোটেও ঈশ্বরবিরোধিতা নয়, দোষণীয় তো নয়ই। লায়েলের ভূতত্ত্বচিন্া এবং হুকারের উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাস দুটিতেই ছিল ডারউইনের যুক্তিবিন্যাস ও স্বীকৃতির নানা

উপাদান। পরের ঘটনাবলি এখন ইতিহাসের অন্র্গত। ১৮৬০ সালের ৩০ জুন স্টিভেন্স হেনস্লোর সভাপতিত্বে অক্সফোর্ড বিশবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বিতর্কে টমাস হাক্সলির কাছে বিশপ উইলবারফোর্সের পরাজয়, এবং ১৮৬১ সালে ডায়নোসর এবং পাখির অন্র্বতী প্রাণী 'অর্কিঅপটেরিক্স'-এর পূর্ণাঙ্গ ফসিল আবিষ্কারের পর ক্রমে সূচিত হয় বিশ্ববীক্ষায় জীববিজ্ঞানের অটল অনুপ্রবেশ ও ডারউইনের প্রতিষ্ঠা।

ডারইউনের তত্ত্ব নিয়ে তারপরও নানা বিতর্ক চলেছে, উদ্ঘাটিত হয়েছে নানা ত্রুটি, সংশোধিত হয়েছে সবই, নতুন নতুন তথ্য আত্তীকরণের মাধ্যমে সেটি আজ শক্ত এক বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়েছে। উন্নত বিশ্বের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সৃষ্টিবাদের অবশেষ কোনো রকমে টিকে থাকলেও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে সৃষ্টিবাদ বনাম জৈববিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে এখন আর কোনো বির্তক নেই। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে সৃষ্টিবাদ দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। কেন এমন হলো, কী সেই স্বরূপ, কারা মদতদাতা সবই আলাদা এক অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে। তবে এটুকু বলে রাখা ভালো যে মার্কিন বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলেই মূলত সংশ্লেষিত জৈববিবর্তন তত্ত্বের সৃষ্টি।

সংশোধনের জন্যে এই সংযোজন এতটাই গুরুভার যে কেউ কেউ মনে করেন জৈববিবর্তন ব্যাখ্যায় 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' এখন অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেকেই তা স্বীকার করেন না এবং লক্ষণীয় মৌলবাদী আক্রমণের মূলবিন্দু পূর্ববৎ ডারউইনই আছেন।

শুধু ধর্মবিশ্বাসীরাই নয়, উদারপন্থীদের অনেকেও প্রথম দিকে ডারউইনের তত্ত্ব সমর্থন করেন নি এবং তাঁর মূল কারণ 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' যা একাধারে নিষ্ঠুর, নির্মুখ ও মৃত্যুকীর্ণ। তারা বালখিল্য সারল্যে কস্মিক নিয়ম ও মানুষী নৈতিকতার পার্থক্য গুলিয়ে ফেলেছিলেন এবং এখনও ফেলেন। তাই ফ্যাবিয়ান সোস্যালিস্ট ও নাস্কি বার্নার্ড শ 'ব্যাক টু মেথুসেলা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'গোটা তাৎপর্যটি লক্ষ করলে আপনার হৃদয় বালুকাস্তূপে তলিয়ে যাবে। এতে আছে এক ভয়ঙ্কর অদৃষ্টবাদ এবং সেইসঙ্গে সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তার, শক্তি ও উদ্দেশ্যের, মর্যাদা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার মারাত্মক বিনষ্টি।'[৪] উপায় ও উদ্দেশ্যের সঙ্গতি মানুষের সমস্যা, প্রকৃতির নয়। সে কাউকে ঘৃণাও করে না, ভালোও বাসে না। প্রকৃতির কোনো উদ্দেশ্যও নেই। তাই বার্নার্ড শ অপেক্ষাকৃত কম নিষ্ঠুর এবং অধিকতর ইচ্ছাশক্তিনির্ভর লামার্কবাদকে গ্রহণযোগ্য ভেবেছেন। 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্যা সি' উপন্যাসে শিকারির সংলাপ মনে পড়ে। সে মাছটিকে ভালোবাসে, তাকে ভাই বলেও ডাকে অথচ মাছটিকে সেজন্যেই মারতে চায়। হেমিংওয়ে কি তাহলে প্রকৃতি ও জীবজগতের দ্বন্দ্বমূলক আন্তঃসম্পর্কের কথা বলতে চেয়েছেন? প্রকৃতির নিয়ম এক নিষ্ঠুর বাস্তবতা। এ থেকে পরিত্রাণ নেই। আমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্ট ফল-ফসল আর গৃহপালিত পশুকুলের উৎপত্তিও প্রাকৃতিক নির্বাচনেরই অসচেতন অনুকৃতি এবং একই মাত্রার হিংসাত্মক অথচ শেষ ফলশ্রুতি কত না মুগ্ধকর। মাঠের ফসল, বাগানের ফুল, দৌড়ের ঘোড়া, শৌখিন পায়রা, লোমশ কুকুর-বিড়াল থেকে চোখ ফেরানো দায়। এসবই নির্মম নির্বাচনের সৃষ্টি। তাই স্রেফ নিষ্ঠুরতার ওজরে ডারইউন তত্ত্ব বর্জন এবং লামার্ককে আলিঙ্গনের কোনো হেতু নেই। অধিকন্তু লামার্কবাদ প্রমাণসিদ্ধ কোনো তত্ত্ব নয়, ধারণা মাত্র আর সেই ধারণা অনুসরণ করলে আমাদের পক্ষে কৃষিক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন অসম্ভব হতো

এবং সভ্যতারও বিকাশ ঘটত না। লামার্কের মতবাদ—পরিবেশের প্রভাবে অর্জিত পরিবর্তনগুলো বংশানুসৃত হয়—তা কোথাও সত্য প্রমাণিত হয় নি।[৫]

কার্ল মার্কস সুবিদিত ডারউইনবাদী, বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষা নির্মাণে তিনি ডারউইনের তত্ত্ব থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা পেয়েছিলেন। সঙ্গত কারণেই তাই বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি ডারউইনকে তাঁদের অন্যতম হিরোর স্বীকৃতি দেয় এবং বিশাল ডারউইন মিউজিয়াম নির্মাণের সঙ্গে স্কুল পর্যায় থেকে ডারউইনের তত্ত্ব পাঠ্যসূচিভুক্ত করে। কিন্তু সমস্যা দেখা যায় স্তালিন শাসনে। তিনি কৃষির বাধ্যতামূলক যৌথীকরণ সম্পন্ন করেন এবং রাশিয়ার বিরূপ জলবায়ুর সঙ্গে লাগসই নতুন নতুন ফসলের জাত উৎপাদনে উদ্যোগী হন। নিকোলাই ভাবিলভ (মৃত্যু ১৯৪৩) তখন লেনিন কৃষি-আকাদেমির প্রধান এবং আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিদ্যা কংগ্রেসের সভাপতি। তাঁদের অনুসৃত ডারউইনি পদ্ধতিতে দৈবচয়িত পরিবৃত্তির (mutation) ওপর কৃত্রিম নির্বাচন চালিয়ে পছন্দসই ভ্যারাইটি উদ্ভাবন অত্যন্ত কালক্ষেপক। স্তালিনের চাই কালসংকোচন। এমন সময়ই পাদপ্রদীপের আলোয় মিচুরিন ও লিসেঙ্কোর উদয়। তাঁরা ক্রমোসোম বা জিনের পরিবর্তে পরিবেশের চাপের সাহায্যে জীবদেহের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটান এবং অল্পকালের মধ্যেই নতুন জাতের ফসল উৎপাদন করেন। এই অসম্ভবের দাবিদাররা স্পষ্টতই লামার্কবাদী। তাঁরা অচিরেই স্তালিনের আনুকূল্য পেলেন এবং আয়োজিত হলো ভাবিলভ ও লিসেঙ্কোর জন্যে এক বিতর্কসভা। স্মর্তব্য, হাক্সলি ও উইলবারফোর্সের অক্সফোর্ড বাগযুদ্ধ। কিন্তু ফল ছিল বিপরীত, এবার জয় হলো অবিজ্ঞানের, হেরে গেলেন ভাবিলভ। তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের কেউ গেলেন কারাগারে, কেউ-বা সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে। তত্ত্ব বর্জিত হলেও তাত্ত্বিক অর্থাৎ ডারউইন বহাল থাকলেন, সোভিয়েত জীববিদ্যায় সংযোজিত হলো এক নতুন অধ্যায়—নবডারউইনবাদ। তাতে বিষম ফল ফলেছিল। সোভিয়েত জীববিদ্যা ও কৃষি পিছিয়ে পড়েছিল অর্ধশত বছর। বিজ্ঞানের ওপর ভাবদর্শীয় জবরদস্তির এই হলো পরিণতি।

ডারউইনবাদের নামে আরেকটি বিচ্যুতির নাম সোস্যাল ডারউইনিজম বা ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্ব। ডারউইনের জীবদ্দশায় এই তত্ত্বের উদ্ভব এবং তিনিই দ্ব্যর্থহীন প্রথম প্রতিবাদী। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে হোম জাতের জীব সেপিয়েন্স হয়ে ওঠার পর তাদের ওপর প্রাকৃতিক নির্বাচন নিষ্ক্রিয় হতে হতে একসময় বিলুপ্ত হয়। হোমো সেপিয়েন্স এখন প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবমুক্ত, একথা জানালেও তাঁর অনুসারী সমাজবিদদের কেউই তাঁকে আমল দেন নি। যুগটি ছিল সাম্রাজ্যবাদরে, জাতিগত অবদমন ও যুদ্ধের আর সে জন্যে প্রয়োজন পড়েছিল একটি লাগসই বৈজ্ঞানিক মতবাদের যার খোঁজ মেলে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বে। ডারউইনবাদের অন্যতম মুখ্য প্রচারক হার্বার্ড স্পেনসর 'জীবনের জন্যে সংগ্রাম' ও 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে আনুকূল্যপ্রাপ্ত জাতিসমূহ সংরক্ষণ'—ডারউইনের ব্যবহৃত এই শব্দগুলো 'অস্তিত্বের সংগ্রাম' ও 'যোগ্যতমের উদ্ববর্তন' হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন এবং ডারউইন তা অনুমোদনও করেন।[৬] ডারউইনের তত্ত্ব মানবসমাজেও প্রযোজ্য—এই ধারণা প্রচার করে অতঃপর স্পেনসর ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্বের মুখ্য প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে সহজ : 'মানবসমাজে অস্তিত্বের সংগ্রাম চলছে এবং যোগ্যতমরাই উদ্‌বর্তিত হচ্ছে ব্যক্তিপর্যায়ে, জাতিপর্যায়ে। ফলত সমাজে ধনিকশ্রেণী এবং বিশ্বপরিসরে শ্বেতজাতি কর্তৃক কৃষ্ণাঙ্গ ও পীতাঙ্গ জাতিগুলোর অবদমন প্রাকৃতিক নিয়মেই ন্যায্য এবং বৈজ্ঞানিক বিচারে বৈধ।' এই হলো মোদ্দা কথা। এই অযৌক্তিক মতবাদ অনেকের নিন্দা কুড়ালেও সমর্থকদের সংখ্যাও কম ছিল না।

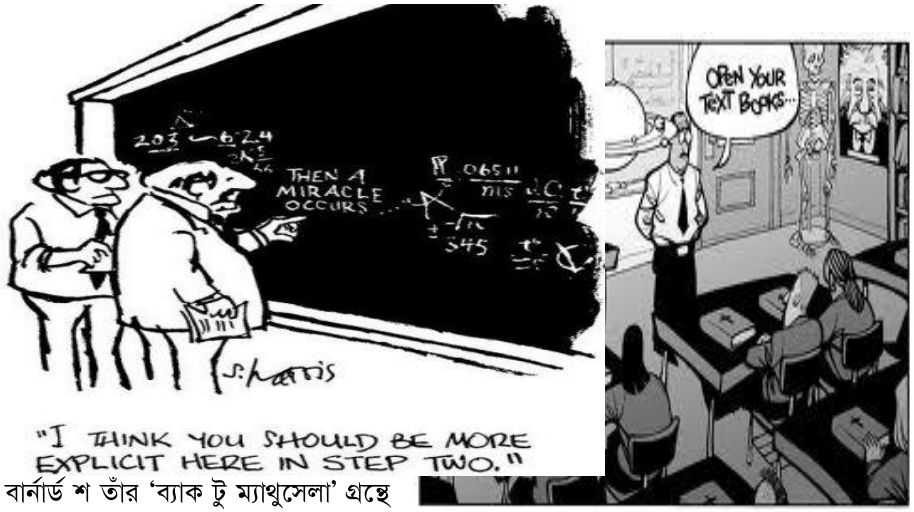

জর্জ বার্নার্ড শ তাঁর 'ব্যাক টু ম্যাথুসেলা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'খাদ্য ও অর্থের জন্যে অবাধ প্রতিযোগিতা ও আদিম স্বাধীনতার সপক্ষে এমন সুদৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রচার ইতিহাসে দেখা যায় নি। বিনা শাস্তিতে সবল কর্তৃক দুর্বলের নিষ্পেষণ, একমাত্র সরকার কর্তৃক সমস্ত বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রণ এবং গুন্ডাশ্রেণীর লোকদের আক্রমণ থেকে আইনানুগ দস্যুতার নিরাপত্তা বিধানের জন্যে কেবল পুলিশবাহিনীর সার্বিক নির্ভরতার মধ্যেই যে ব্যক্তি ও সমাজের সমস্ত প্রাচুর্য, উন্নতি ও মঙ্গল নিহিত, এমনভাবে তা আর কখনও মানুষকে বোঝানো হয় নি।[৭] এবার এইচ. জি. ওয়েলসের রক্ত হিম করা বয়ান শুনুন : "আর কীভাবে 'নবপ্রজাতন্ত্র' অধম জাতিগুলোর সঙ্গে ব্যবহার করবে? কীভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের ...পীতাঙ্গদের ...ইহুদিদের সঙ্গে? ...দুনিয়াটা দুনিয়াই, কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয় ...তাদের বিদায় নিতেই হবে ...নবপ্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের একটি আদর্শ থাকবে যা হত্যাকে যথার্থ উপযুক্ততা দেবে।'[৮] এই ধরনের মতবাদে হিটলার খুঁজে পান যুদ্ধের ন্যায্যতা, আর্য জাতির কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা এবং এককোটি ইহুদি ও জিপসিকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার যুক্তি। একটি তত্ত্বের অপব্যাখ্যার এমন বিষময় ফল ইতিহাসে দুর্লভ। আরেকটি প্রশ্নও অতঃপর জিজ্ঞাস্য—মার্কস কি শ্রেণীসংগ্রাম প্রশ্নে ডারউইনবাদী সমাজতত্ত্বে প্রভাহিত হয়েছিলেন? সম্ভবত না। কিন্তু লামার্কবাদের প্রভাব মার্কস-এঙ্গেলসও এড়াতে পারেন নি। এঙ্গেলস 'অ্যান্তি ডুরিং' গ্রন্থে মানুষের বিবর্তনের শ্রমের যে-ভূমিকা উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্টতই লামার্কীয়।[৯]

ডেভিলস্ চ্যাপলিন কি তাঁর তত্ত্বের এতসব অপসম্ভাবনা অনুমান করেছিলেন? ধর্মান্ধদের বিরোধিতা ছাড়া অন্যগুলো সম্ভবত না। বার্নার্ড শ'র মতো মানবতাবাদীরা যে প্রাকৃতিক

নির্বাচনের ভয়ঙ্কর নির্মমতায় ভীত হয়ে লামার্কবাদের দিকে ঝুঁকবেন সেটাও তাঁর চিন্তায় ঠাঁই পাওয়ার কথা নয়। তিনি তো জীবনের জন্যে মরণপণ সংগ্রামের সঙ্গে জীবজগতে বিদ্যমান সহযোগিতার কথাও 'প্রজাতির উৎপত্তি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, যদি অনেকটা পরোক্ষভাবে।

প্রকৃতির এই দ্বান্দ্বিকতা—এক অনিবার্য বাস্তবতা যা প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান এবং আমাদের সভ্যতায়ও। প্রকৃতি 'অন্ধ ঘড়িনির্মাতা' হলেও মানুষ চক্ষুষ্মান হোমা সেপিয়েন্স বা 'জ্ঞানীজীব' এবং একজন উৎকৃষ্ঠ ডিজাইনার। তার পক্ষে এখন প্রকৃতির অনেকগুলো শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সংগ্রামের সঙ্গে সহযোগিতার একটি ভারসাম্য সৃষ্টি সম্ভব। জীবনের জন্যে সংগ্রামের হেতুগুলো—অতিপ্রজনন, খাদ্যভাব এবং ফলত যুদ্ধ সবই আজ বহুলাংশে প্রশমিত। প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্থূল হেতুগুলো নিয়ন্ত্রণ এখন মানুষের সাধ্যায়ত্ত, এবার প্রয়োজন সমাজমনোস্তত্ত্বের ব্যাপক পরিবর্তন। যুদ্ধহীন, খাদ্যে স্বনির্ভর ও অহিংস একটি বিশ্ব আজ আর স্বপ্ন নয়, অর্জনসাধ্য। আমরা গোটা জীবজগতের সঙ্গে সহবাস ও প্রকৃতির সঙ্গে মিথোজীবিতামূলক সম্পর্কে উদ্ভাবনে সচেষ্ট। জৈববিবর্তন তত্ত্ব থেকেই আমরা এই শিক্ষালাভ করেছি। অন্যথা প্রাকৃতিক নির্বাচনের আওতামুক্ত মানুষ নিজ বিবর্তন অব্যাহত রাখার প্রশ্নে কানাগলিতে আটকে পড়ত। তাই ডারউইনের কাছে গোটা মানবজাতি ঋণী।

বিশ্বজুড়ে এবার ডারউইন জন্মের দুই শ বছর ও 'অরিজিন অব স্পিসিজ' গ্রন্থের দেড়শ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে। ১৮৬০ সালে অক্সফোর্ডে সৃষ্টিবাদ বনাম জৈববিবর্তন তত্ত্ব বিতর্কের পরিসমাপ্তির পর ইউরোপ বিভ্রাটমুক্ত হলেও মার্কিনদেশে তা আজও টিকে আছে এবং চার্চ, রাজনীতিবিদ আর কিছু বিভ্রান্ত বিজ্ঞানীর মদতে সৃষ্টিবাদ সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শের রূপলাভ করেছে। বিজ্ঞানের অন্যতম পীঠস্থান আমেরিকায় কেনই-বা এমন পরিস্থিতি, ফিলিপ জনসনের মত ব্যক্তি যাঁর উদ্বৃতি দিয়ে প্রবন্ধের শুরু (রিচার্ড ডকিন্সের গ্রন্থ থেকে), আইনবিদ হয়েও কেন এই সৃষ্টিবাদী আন্দোলনের পুরোধা, বোঝা মনে হয় কঠিন নয়। বন্যা আহমেদ তাঁর *'বিবর্তনের পথ ধরে'* গ্রন্থে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১০] অভিবাসী মার্কিনিদের উদ্বাস্তু সংস্কৃতিও একটি কারণ হতে পারে।

বর্তমানকালের সৃষ্টিবাদীরা অবশ্য বিশপ উইলবারফোর্সের সেকেলে যুক্তি নিয়ে সংশ্লেষিত বিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামেন নি। তাদের অস্ত্রভাণ্ডারে আছে তাপগতিবিদ্যার এন্ট্রপি, বংশগতিবিদ্যার ডিএনএ-আরএনএ-প্রোটিন-উৎসেচক ইত্যাদি এবং প্রাণের উৎপত্তিসহ বিজ্ঞানের সীমান্তবর্তী কিছু অমীমাংসিত বিষয়। তাঁরা বোঝাতে চান যে প্রাণের উৎপত্তি ও বিবর্তন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যেয় নয়, সরল প্রাণ থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় জটিল জীবের উদ্ভবের কোনো ধারাবাহিকতা নেই। জটিল জীবের উদ্ভবের পেছনে আছে অদৃশ্য এক ডিজাইন ও ডিজাইনার, পরোক্ষে 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর'। তাই এ মতবাদের নাম—ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) অর্থাৎ বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা। অকাট্য যুক্তি বটে! তাদের উপকরণগুলো নতুন, কিন্তু মারপ্যাঁচ মধ্যযুগীয়। এককালে সকল দুর্বোধ্যই ছিল অতিপ্রাকৃত শক্তির লীলা। আইডি কি আমাদের সে কথাই বলে না?

ডারউইনের জীবৎকালে তাঁর তত্ত্বের অনেক কিছু স্বীকার করেও চোখের উৎপত্তি সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দিহান ছিলেন, ফলত ডারউইনকে কেঁচোর চোখ থেকে স্ন্যপায়ীদের চোখ পর্যন্ত গোটা বিবর্তনটি ব্যাখ্যা করতে হয়। সকল বিরুদ্ধবাদী তাতে অবশ্য তুষ্ট হন নি, আজও অনেকে তুষ্ট নন। কৃত্রিম চোখ না বানানো পর্যন্ত তাঁরা নিবৃত্ত হবেন না। আইডি'র খপ্পরে আটকে গেলে সভ্যতার বিকাশ ঘটত না। এই সচতুর চক্রান্তের লক্ষ্য একটি বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার বহুশতবর্ষ সাধনায় নির্মিত বিজ্ঞানসৌধের মূলে কঠারাঘাত এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গনে ভাববাদ প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু মার্কিন বিজ্ঞানীরা এখন আর নীরব দর্শকের ভূমিকায় নেই। তাঁরা নিভৃত গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে পড়েছেন, আনুষঙ্গিক বইপত্র ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, আইডি-বিরোধী সভাসমিতিতে যোগ দিচ্ছেন, আইডিসংক্রান্ত মামলায় সাক্ষ্য দিতেও হাজির হচ্ছেন। এই ধরনের মামলা হয়েছে অনেকগুলো এবং সৃষ্টিবাদী বক্তব্য অসার, অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক প্রমাণিত হওয়ায় সবগুলোতেই তাঁরা হেরেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এককালের সহপাঠী আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীববিদ্যার সাবেক অধ্যাপক ড. জ্ঞানেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য সম্প্রতি আমাকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন আইডি মোকাবিলায় স্কুলশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্যে গ্রীষ্মকালীন কোর্স খোলা হয়েছে এবং জৈবরসায়ন, অনুজীববিদ্যা, বংশগতিবিদ্যা ও বিবর্তন তত্ত্বের অধুনাতম আবিষ্কারগুলো পড়ানো হচ্ছে যাতে তাঁরা আইডি'র যুক্তি খণ্ডন করতে ও ছাত্রদের ওই কুশিক্ষা থেকে মুক্ত রাখতে পারেন।

আমরা পঞ্চাশ দশকের শেষার্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে জৈববিবর্তন তত্ত্ব পড়েছি। শিক্ষকরা ছিলেন ধর্মবিশ্বাসী, বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য কোনোদিন শুনি নি। আমি তারপর অনেক বছর কলেজে বিবর্তন তত্ত্ব পড়িয়েছি, কোনো সমস্যা হয় নি। দশককাল হলো উচ্চমাধ্যমিক পাঠক্রম থেকে বিষয়টি তুলে দিয়ে জৈবপ্রযুক্তি পড়ানো হচ্ছে কিন্তু তার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাই নি। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে কি আইডি'র অনুপ্রবেশ ঘটেছে, নাকি এটি বিজ্ঞানের ওপর প্রযুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতি? এ নিয়ে প্রতিবাদ উঠেছে, তবে সামান্য। অথচ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অবিজ্ঞানের কাছে নতিস্বীকার কিংবা জ্ঞান এড়িয়ে প্রয়োগ-শিক্ষণ দুটিই আখেরে গোটা শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে ক্ষতিকর।

ফেরা যাক আবার ডেভিল্‌স চ্যাপলিন প্রসঙ্গে। এককালের স্বঘোষিত 'সঙ' এখন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী। তাঁর তত্ত্বে উনিশ ও বিশ শতকী গোটা বিশ্ববীক্ষা আলোড়িত হয়েছিল—সহিত্য, দর্শন, সমাজবিদ্যা, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি কোনোটাই বাদ পড়ে নি। ডারউইন প্রয়াত হন ১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল সন্ধ্যায় এবং সমাহিত হন ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবির কবরখানায় আইজ্যাক নিউটন হতে কয়েক ফুট দূরে, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী স্যার জন হার্শেল, মাইকেল ফ্যারাডে, জেম্‌স ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের কাছে।

১. *The Gold Delusion*, Richard Dawkins, Houghton Mifflin Co., Boston, New York, 2006, p.5

২. *A Devil's Chaplin*, Richard Dawkins, Weidenfeld & Nicalson, London, 2003, p.10
৩. *The Origin of Species*, Charles Darwin, 6th ed.
৪. প্রাগুক্ত ২, পৃ.১০
৫. *বিবর্তনবিদ্যা*, ম. আখতারুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮, পৃ. ৫৯-৭৮
৬. *Darwin's Biological work*, P. R. Bell (ed.), John wileyd Sons, New York, 1964, গ্রন্থে দ্রষ্টব্য Natural Selection, J.B.S Haldane, p. 101.
৭. *বিজ্ঞান ও শিক্ষা : দায়বদ্ধতায় নিরিখ*, দ্বিজেন শর্মা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪, *Back to Methuselah* থেকে উদ্ধৃতি, পৃ. ৩৩।
৮. প্রাগুক্ত ২, H.G. Wells *The New World* থেকে উদ্ধৃতি পৃ. ৯
৯. প্রজাতির উৎপত্তি, *The Origin of Species* গ্রন্থের ভাষান্তর, ম. আখতারুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, 'অনুবাদকের কথা' ভূমিকার পঁচিশ পৃষ্ঠা
১০. *বিবর্তনের পথ ধরে*, বন্যা আহমেদ, অবসর, ঢাকা ২০০৭, পৃ. ১৬৮-২০০

জৈববিবর্তন—বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি

বন্যা আহমেদ*

ষোল শতাব্দীতে কোপার্নিকাস পৃথিবীকে 'ধাক্কা' দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে (!), সেই ধাক্কার জের সামলাতে আমাদের কিন্তু কম সময় লাগেনি। আজ একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে বসে হয়তো আমাদের মনে হতে পারে এ আর এমন কী একটা তত্ত্ব, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে এটাই তো স্বভাবিক। অথচ সে সময়ে এ কথাটা বলতে পারাই ছিল 'বিপদজনক'। কয়েকশ' বছর লেগে গিয়েছিল বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হতে। চারপাশের ধর্মান্ধ মানুষগুলোর ভয়েই হয়তো কোপার্নিকাস যুগান্তকারী মতবাদটিকে প্রকাশ করার সাহস পান নি তার জীবদ্দশায়। মধ্যযুগীয় চার্চের আদেশে ব্রুনোকে পুড়ে মরতে হল, গ্যালিলিওকে সইতে হল অসহ্য নির্যাতন। অসীম ক্ষমতাধর মধ্যযুগীয় চার্চের সামনে 'বাইবেলের বিরোধিতা'র চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে? বাইবেলের স্বর্গীয় বাণী কি মিথ্যা হতে পারে! পৃথিবীই সকল 'সৃষ্টি'র কেন্দ্রবিন্দু, তাকে কেন্দ্র করেই ঘুরে চলেছে চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা! পৃথিবী নামের এই গ্রহটির এক বিশেষ মর্যাদা ছিল সেসময়কার ধর্মবেত্তা, বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের মাঝে। তারা মনে করতেন—আমাদের এ নিটোল বাসভূমি পৃথিবী এক 'বিশেষ সৃষ্টি' আর মহাবিশ্বের সবকিছুই বুঝি এই পৃথিবীকে ঘিরেই অনবরত পাক খেয়ে চলছে। কোপার্নিকাস এই কল্পকাহিনীর অবসান ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করলেন পৃথিবী সে অর্থে মোটেই কোনো 'বিশিষ্ট' গ্রহ নয়, বরং বুধ, শুক্র, মঙ্গল বা বৃহস্পতির মতই সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণরত আরেকটি সামান্য গ্রহমাত্র। ভয়-ভীতি অত্যাচারকে অবজ্ঞা করে অতীতের মত সেবারও আস্তে আস্তে মানব-সভ্যতা এগিয়ে গেছে; কুসংস্কার আর অজ্ঞতাকে সরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে গবেষণালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান। মানব সমাজে চিন্তাচেতনার এই ক্রমশ উত্তরণকে এখন 'কোপার্নিকাসিয় বিপ্লব' নামে অভিহিত করা হয়। বারবার এভাবেই এগিয়েছে আমাদের সভ্যতা, কখনও ধীরে, কখনোবা শত আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে খুড়িয়ে খুড়িয়ে, কখনোবা অদম্য এক দ্রুতগতিতে সময়কে হার মানিয়ে।

কোপার্নিকাস যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তারই হাত ধরে কেপলার, গ্যালিলিও এবং নিউটনের মতো বিজ্ঞানীদের কয়েক শতাব্দীর কাজ আমাদের পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিয়েছিল অতিপ্রাকৃত শক্তির হাত থেকে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার পরিমণ্ডলে। মানব-সভ্যতার এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা প্রথমবারের মত ভাবতে শিখেছিলাম, পৃথিবীসহ এই বিশাল মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য বাইরের কোনো কল্পিত শক্তির প্রয়োজন নেই। প্রাকৃতিক নিয়মগুলোর সাহায্যেই আজকে মহাবিশ্বের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, ভূত-ভবিষ্যতের ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব, আর সেই ব্যাখ্যাগুলো মানুষের জ্ঞানের পরিধির বাইরে নয়। কিন্তু মানব সভ্যতার এই

---

* বন্যা আহমেদ : পেশায় সিস্টেম এনালিস্ট। আমেরিকা প্রবাসী। প্রকাশিত গ্রন্থ : *বিবর্তনের পথ ধরে*, ২০০৭, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা।

চেতনামুক্তি জড়জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল আরও কয়েক শতাব্দী। জীবজগৎ তখনও রয়ে গিয়েছিল প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার ঊর্দ্ধে। পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র থেকে ঠেলে বের করে দিলেও মানুষ কিন্তু তখনও দিব্যি নিজেকে বসিয়ে রেখেছিল সমগ্র প্রাণীজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে।

১৮৫৯ সালে চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস বললেন, এই পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি এবং প্রাণের বিকাশ ও বিস্তিও প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে নয়, সব জীবই এই প্রকৃতির অংশ। পৃথিবীর এই অফুরন্ত প্রাণের মেলায় আমরা যে হাজার হাজার প্রজাতির আনাগোনা দেখি তারা সবাই আদি সরল প্রাণ থেকে বিবর্তিত হতে হতে এখানে এসে পৌঁছেছে। কোনো 'মহাসৃষ্টি'র নীলনক্সা অনুযায়ী এই লক্ষ-কোটি প্রজাতিগুলো আলাদা আলাদাভাবে তৈরি হয় নি। অসংখ্য প্রজাতির উৎপত্তি ঘটেছে একসময়, কিন্তু টিকে থাকতে না পেরে তাদের অনেকেই আবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে; অর্থাৎ মানুষও এ সমীকরণ থেকে বাদ পড়ছে না। আমরা যতই নিজেদেরকে তথাকথিত 'সৃষ্টি'র কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে স্বান্না পাওয়ার চেষ্টা করি না কেন, মানুষ আসলে অন্যান্য জীবের মতই বিবর্তনের অমসৃণ আর বন্ধুর পথেরই সহযাত্রী!

আমরা জেনেছি, আমাদের আবাসভূমি, এই জড় পৃথিবীটাকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র থেকে সরাতে কি পরিমাণ বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়েছে মানব সভ্যতাকে। তাহলে সহস্র বছর ধরে বহু যত্ন করে তৈরি করা স্বর্গ-মর্তের কেন্দ্রস্থলে নিজেকে বসিয়ে মানুষ যে সভ্যতা-সংস্কৃতি তৈরি করেছে সেখান থেকে তাকে নামিয়ে আনতে কি প্রবল বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে তা সহজেই বোধগম্য। মধ্যযুগীয় চার্চ বা অন্যান্য ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতাপ ইতোমধ্যেই কমে এসেছিল বলে ডারউইনের পরিণতি ব্রুনো বা গ্যালিলিওর মত হয় নি। কিন্তু আজও দেখা যায় পৃথিবীর আনাচে কানাচে জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে ধর্মবিরোধিতার মিথ্যে অভিযোগ আর মিথ্যা রটনার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

ইউরোপে জনগোষ্ঠীর বেশ বড় অংশ জৈববিবর্তনকে 'প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' বলে স্বীকার করলেও আমেরিকায় এখনও প্রায় ৫০% মানুষ একে মিথ্যা এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলেই মনে করেন। ডানপন্থী রক্ষণশীলগোষ্ঠীর শক্তিশালী অংশ স্কুলের পাঠ্যবই থেকে একে উঠিয়ে দেয়ার দাবী জানায়। অথচ, ডারউইন তার তত্ত্বটি দেয়ার পর প্রায় দেড়শ বছর পার হয়ে গেছে, বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে অভূতপূর্ব গতিতে। আর যতই জীববিজ্ঞানে নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে ততই নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে জৈববিবর্তনের যথার্থতা। ফসিলবিদ্যা থেকে শুরু করে আণবিক জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, জেনেটিক্স, জিনোমিক্স, এভুলেশনারি ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজির মত বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো থেকে পাওয়া সাক্ষ্যগুলো জৈববিবর্তন তত্ত্বকে আজ অত্যন্ত শক্ত খুঁটির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আর তাই, গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিজ্ঞানীরা এই সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জৈববিবর্তনকে জীববিদ্যার সব শাখার ভিত্তিমূল হিসেবে গণ্য করে আসছেন। কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের মতই এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। বিজ্ঞানীরা আজকাল প্রকাশ্যেই বলেন, জৈববিবর্তন ছাড়া জীববিজ্ঞানের কোন কিছুই অর্থবহ হয় না। এজন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী ফ্রান্সিস আয়ালা বলেন, 'ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্ব কোপার্নিকাসিয় বিপ্লবকে পূর্ণতা দিয়েছিলো।' কথাটা একেবারে অভ্রান্ত নয়। ১৯৯৮ সালে আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস একটি রিপোর্ট পেশ করে, তাতে স্পষ্ট করে বলা হয়, 'বৈজ্ঞানিকভাবে এখন আর এটা মনে করা সম্ভব নয়, কোনো জীব তার আগের কোনো এক জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে আসেনি, বা অন্যান্য সব জীবের ক্ষেত্রে বিবর্তনের যে প্রক্রিয়াটা প্রযোজ্য সেই একই পদ্ধতিতে মানুষের উদ্ভব ঘটেনি।'

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, আপনি জৈববিবর্তনকে সঠিক বলে মনে করেন শুনলেই পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ আপনার দিকে একরাশ অবিশ্বাস এমন কী ঘৃণা নিয়ে তাকাবে। আমার এক ডাক্তার বন্ধু সেদিন বেশ সাহস করে জিজ্ঞেস করেই বসলো,'তুমি কি আসলেই যেসব কথা লেখো সেগুলো সব বিশ্বাসও কর?' তার গলায় এক ধরনের কাকুতি ছিল, যা শুনে সত্যি বলতে তার জন্য একটু হলেও মায়া হয়েছিল। আমি অবাক হয়ে ভাবি, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা নিয়ে এরা যদি ডাক্তারি পাশ করে দিব্যি চেম্বার খুলে বসতে পারে তাহলে আমাদের মতো রুগীদের কপালে কি আছে কে জানে!

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জৈববিবর্তন একটি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। যারা জৈববিবর্তন তত্ত্বের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য ধারণা রাখেন, তারা খুব ভালভাবেই জানেন, ডারউইনের প্রস্তাবিত জীবের বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব এক দিনে বা এক বছরে বা এক দশকেও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিজ্ঞান অন্ধবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কাজ করে না। বিজ্ঞানকে নির্ভর করতে হয় যুক্তির উপর। পরীক্ষালব্ধ প্রমাণের উপর। কোনো অনুকল্পকে বৈজ্ঞানিক জায়গায় উঠে আসতে হলে তাকে বিভিন্ন স্তর পার হয়ে আসতে হয়—প্রথমে গভীর পর্যবেক্ষণ, যুক্তি, সমস্যার বিবরণ, সম্ভাব্য কারণ, ফলাফল ইত্যাদির উপর নির্ভর করে অনুকল্পের কাঠামো প্রস্তাব করা হয়। তার তাকে প্রমাণ করার জন্য চলতে থাকে ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়া ফলাফল এবং তথ্যের মাধ্যমে যদি অনুকল্পটিকে প্রমাণ করা না যায় তাহলে তাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। আর যদি দীর্ঘ দিন ধরে বারবার বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার মাধ্যমে তাকে প্রমাণ করা যায় এবং অন্য কোনো বিজ্ঞানী এই প্রমাণের বিরুদ্ধে কোনো তথ্য হাজির না করেন তবে অনুকল্পটিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়। এখানেই কিন্তু শেষ নয়, সাক্ষ্য-প্রমাণের দায় কখনই শেষ হয় না, বিজ্ঞানে বিমূর্ত বা অনাদি সত্য বলে কোনো কথা নেই। এই প্রক্রিয়ায় একটা প্রচলিত এবং প্রমাণিত তত্ত্বকেও যে কোনো সময় আংশিক বা সম্পূর্ণ ভুল বলে প্রমাণ করা যেতে পারে, আজকে একটা তত্ত্বকে সঠিক বলে ধরে নিলে কালকে তাকে ভুল প্রমাণ করা যাবে না এমন কোনো কথা নেই। তাই আমরা দেখি, নিউটনের তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার জগতে কয়েকশো বছর ধরে রাজত্ব করার পরও আইনস্টাইন এসে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিউটনের তত্ত্বের কিছু সীমাবদ্ধতা হাজির করেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম উদাহরণের কোনো শেষ নেই। কারণ বিজ্ঞান কোনো তত্ত্বকে পবিত্র বা চিরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করে না, কোনো বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি কোনো তত্ত্বকে চোখ বন্ধ করে স্বীকার করে নিতে পারেন না। সাধারণ

মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতার কথা না হয় বাদই দিলাম, গত দেড়শ' বছরে জৈববিবর্তন তত্ত্বকে যে কত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-মহাপরীক্ষা-প্রত্যাখ্যানের চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে হয়েছে তার হিসাব দিতে গেলে এক মহাভারত লিখে ফেলতে হবে। চলুন খুব অল্প কথায় দেখা যাক ১৮৫৯ সালে প্রথমবারের মতো তত্ত্বটি প্রকাশের পরে তাকে কি পরিমাণ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে।

জীবের বিবর্তন ঘটছে এমন কথা ডারউইনের পূর্বে অনেক বিজ্ঞানী-মনীষীই বলেছিলেন কিন্তু ডারউইন শুধু এই কথাটি বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি প্রথম *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইতে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে দেখান, জীবজগৎ স্থিতিশীল নয়, কোটি কোটি বছর ধরে অত্যন্ত ধীর গতিতে ক্রমান্বয়ে বিবর্তন ঘটছে এবং এর মাধ্যমেই জীবেরও পরিবর্তন ঘটে চলেছে। কোনো প্রজাতিই চিরন্তন বা স্থির নয়, বরং এক প্রজাতি থেকে পরিবর্তিত হতে হতে আরেক প্রজাতির জন্ম হয়। পৃথিবীর সব প্রাণই কোটি কোটি বছর ধরে তাদের পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে। ডারউইন তার বইতে প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে, প্রথমবারের মত, আলফ্রেড ওয়ালেসের সাথে যৌথভাবে জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়াটি কিভাবে ঘটতে পারে তার ব্যাখ্যা দিলেন। অরিজিন অব স্পিসিজ বইয়ে বললেন, প্রকৃতিতে সবসময় খাদ্য, আশ্রয়-বাসস্থান, সঙ্গী নির্ধারণ, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে এক ধরনের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। এই বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলতে থাকে একই ধরনের প্রজাতির ভিতরের প্রতিটি জীবের মধ্যে এবং সেই সাথে এক প্রজাতির সাথে আরেক প্রজাতির মধ্যেও। প্রতিটি জীবের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য বা প্রকরণের কারণে কেউবা সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়ে বেশিদিন টিকে থাকতে সক্ষম হয়, আর অন্যরা আগেই শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতিটি জীবের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারীরাই প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। তার মানে দাঁড়াচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে সংগ্রাম করে যারা টিকে থাকতে সক্ষম হয়, তারাই শুধু পরবর্তী প্রজন্মে বংশধর রেখে যেতে পারে। তার ফলে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলোই পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে অনেক বেশি প্রকটভাবে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ, যে প্রকরণগুলো তাদের পরিবেশের সাথে অপেক্ষাকৃত বেশি অভিযোজনের ক্ষমতা রাখে, তাদের বাহক জীবরাই বেশিদিন টিকে থাকে এবং বেশি পরিমাণে বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এভাবে প্রকৃতি প্রতিটা জীবের মধ্যে পরিবেশগতভাবে অনুকূল বৈশিষ্ট্যের অধিকারীদের নির্বাচন করতে থাকে। ডারউইন প্রকৃতির এই বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়ার নাম দেন ন্যাচারাল সিলেকশন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন।

ডারউইন-ওয়ালেসের প্রস্তাবিত জৈববিবর্তন তত্ত্বটি বেশ সহজ, কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক এবং দর্শনগত অভিব্যক্তি বিশাল। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি তিলেতিলে জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়াটি বোঝার চেষ্টা করেছেন, বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত যোগাড়ে চেষ্টা করেছেন। বিগল যাত্রা থেকে ফিরে আসার পর রাত নেই দিন নেই তিনি এর উপরে কাজ করেছেন। ওয়ালেস ১৮৫৮ সালে নিজে নিজে এই একই সিদ্ধান্তে না পৌঁছালে ডারউইন কবে যে এই তত্ত্বটি জনসমক্ষে প্রকাশ করতেন বা আদৌ করতেন কী-না, তাও হলফ করে বলা যায় না।

তিনি খুব ভাল করেই জানতেন প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের ব্যাপকতা। তিনি জানেন তার হাতে প্রচুর উদাহরণ থাকলেও একে প্রমাণ করার জন্য যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলোর প্রয়োজন তার সবগুলো তখনও তার হাতে নেই। তিনি এও জানতেন শুধু বৈজ্ঞানিক মহলে প্রমাণ হাজির করলেই তো হবে না, মানব সভ্যতার সমগ্র বৌদ্ধিক এবং দার্শনিক ভিত ধরে নাড়া দিতে যাচ্ছেন তিনি। তার এই তত্ত্বের নির্মম বস্তুবাদী দিকটি গ্রহণ করার জন্য মানব-সভ্যতা যে তখনও তৈরি নয় সেটা তারচেয়ে ভাল করে আর কে জানতো?

১৮৫৯ সালে অরিজিন অব স্পিসিজ বইটা বের হওয়ার পর পৃথিবীব্যাপী হইচই পড়ে যায়, ইউরোপের ধর্মীয় রক্ষণশীল অংশটি ঝাঁপিয়ে পড়েন ডারউইনের সমালোচনায়। ডারউইন নিজে এসবের তেমন কোনো জবাব না দিলেও তার বন্ধুরা, বিশেষ করে টমাস হাক্সলি, আসা গ্রে তার হয়ে লড়ে যেতে থাকেন। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন গ্রহণযোগ্যতা না পেলেও ১৮৭০ সালের মধ্যে বিজ্ঞানীমহলে প্রজাতির বিবর্তনের ধারণাটা পাকাপোক্তভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তবে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকায় বিজ্ঞানীরা তখনও বিবর্তনের প্রক্রিয়া বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া নিয়ে সন্দিহান ছিলেন।

মানুষের বিবর্তন নিয়েও ডারউইন পড়লেন আরেক বিপদে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী অন্যান্য প্রজাতির বিবর্তনের কথা মেনে নিতে পারলেন, কিন্তু মানুষেরটা কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। শুধু বিজ্ঞানীরাই নয়, তার অত্যন্ত ঘনিষ্ট বন্ধু লায়েলের মতো অত্যন্ত প্রগতিশীল বিজ্ঞানীর পক্ষেও মানুষের বিবর্তন মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু তারচেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ডারউইনের সামনে। যে মানুষটির কারণে তিনি তার তত্ত্বটিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে মানুষটি নিজের থেকেই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন সেই আলফ্রেড ওয়ালেসই ১৯৬৯ সালে বলে বসলেন যে, মানুষের বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রযোজ্য হতে পারে না। মানুষের মস্কিষ্ক এবং বুদ্ধিমত্তার মত এত জটিল জিনিস নাকি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে না। ডারউইন তার *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইয়ে মানুষের বিবর্তন নিয়ে কিছু না বললেও হাক্সলি ইতোমধ্যেই বিভিন্ন আলোচনায় এবং লেখায় মানুষের বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে ডারউইন ১৮৭১ সালে মানুষের বিবর্তন নিয়ে লেখা *The Descent of Man* বইটা প্রকাশ করেন।

ডারউইনের যুগে প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুকল্প প্রমাণের বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। শুরু করা যাক deep time বা অনন্ত সময়ের সমস্যা দিয়ে। ডারউইন বলেছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তনের জন্য হাজার-হাজার বছর থেকে কোটি বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। কিন্তু এই হাজার-কোটি বছর আসবে কোথা থেকে? ভূতত্ত্ববিদ জেমস হাটন এবং চার্লস লায়েল প্রকৃতি এবং ভূত্বকের আজকের এই অবস্থায় আসতে অসীম সময়ের প্রয়োজন হয়েছে বলে উল্লেখ করলেও তারা কোনো সুস্থির বৈজ্ঞানিক প্রমাণ তখনও হাজির করতে পারেন নি। বেশিরভাগ মানুষ সেসময়ে, বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পৃথিবীর বয়স ৬ হাজার বছর বলেই মনে করতো। বিখ্যাত পদার্থবিদ উইলিয়াম থমসন (যিনি পরে লর্ড কেলভিন

উপাধিতে ভূষিত হন) ১৮৬৬ সালে বলেন পৃথিবীর বয়স আসলে ডারউইন যা বলেছেন তার থেকে অনেক কম।

থমসন থার্মো-ডাইনামিক্সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন, তিনিই প্রথম থার্মো-ডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র এবং চরম তাপমাত্রা স্কেল আবিষ্কার করেন। তিনি রাসায়নিক শক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণ এই দুইটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আলাদা আলাদাভাবে সূর্যের বয়স নির্ধারণ করে দেখান, মাধ্যাকর্ষণ বল ব্যবহার করলে সূর্যের বয়স সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এবং সেটাও মাত্র কয়েকশ লক্ষ বছরের বেশি নয়। থারমো-ডাইনামিকসের সূত্র ব্যবহার করে থমসন এটাও প্রমাণ করেন, মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীর তাপমাত্রা এতই বেশি ছিল যে সেখানে কোনোরকমে প্রাণের উৎপত্তি ঘটা ছিল একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। তার এই হিসেব অনুসারে ডারউইনের দেওয়া প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত তো দূরের কথা, লায়েলের দেওয়া ভূতাত্ত্বিক তত্ত্বও ভূল বলে প্রমাণিত হয়ে যায়। থমসনের হিসেব ঠিক হলে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব ভুল বলে ধরে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। পরবর্তীতে থমসন পৃথিবীর বয়সকে কমিয়ে এক থেকে তিন কোটি বছরে নামিয়ে নিয়ে আসেন।

ডারউইনের সময়কালে বিজ্ঞানীরা পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে যা জানতেন তা প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তনের সঠিকতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের জন্ম দেয়। ডারউইন ওয়ালেসকে লেখা এক চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরেই, পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে থমসনের দৃষ্টিভঙ্গি আমার সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পৃথিবীর বয়স যে এরচেয়ে বেশি তা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বোঝা গেলেও আরো অর্ধশতাব্দী লেগে গিয়েছিল সঠিক বয়সটা বের করতে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি পৃথিবীর বয়স আসলে প্রায় সাড়ে চারশ কোটি বছর। পৃথিবীর বয়স সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান হলে ধীর গতির প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন ঘটার জন্য যথেষ্ট সময় ছিল কিনা সেই সমস্যার সমাধান হয়।

ডারউইনের সময় পর্যন্ত বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো ঠিক কিভাবে প্রবাহিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কোনো স্পষ্ট ধারণাই ছিল না। সে সময়ের জীববিজ্ঞানীরা ভাবতেন পরবর্তী প্রজন্মে বংশগত বৈশিষ্টগুলোর মধ্যে এক ধরনের মিশ্রণ ঘটে। যেমন বাবার গায়ের রঙ কালো আর মায়ের গায়ের রঙ ফর্সা হলে সন্তানদের গায়ের রঙ মিশ্রিত হয়ে শ্যামলা হয়ে যেতে পারে! ডারউইন বেশ বিপাকে পড়লেন, আসলেই কী বাবা-মার বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তানের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যায়? কিন্তু এভাবে বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটলে তো তার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বই ভুল প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে! প্রাকৃতিক নির্বাচনের অন্যতম প্রধান শর্তই হচ্ছে, প্রজাতির জনসংখ্যার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভ্যারিয়েশন থাকতে হবে, যার ফলে আসলে জীবের মধ্যে বেঁচে থাকার যোগ্যতায় ভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু এভাবে কোটি কোটি বছরের বিবর্তন প্রকৃয়ায় বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো মিশ্রিত হয়ে যেতে থাকে তাহলে তো হাজার প্রজন্ম পরে সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে। প্রজাতির জনপুঞ্জে ভ্যারিয়েশন থাকবে না। তখনও জিনেটিক্সের আবিষ্কার না হওয়ায় ডারউইন এ বিষয়টির সদুত্তর দিতে পারেন নি, এমনকি তিনি একসময় মিশ্রণ অনুকল্পকেই সঠিক বলে ধরে নিয়েছিলেন। ডারউইনের অনুকল্পের এ সীমাবদ্ধতা সমালোচকদেরও চোখ এড়িয়ে যায় নি। ফ্লিমিং জেনকিন নামক একজন অধ্যাপক সঠিকভাবেই দেখিয়ে দিলেন, বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো যদি এভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় তাহলে একসময় জনপুঞ্জে আর কোনো ভ্যারিয়েশন থাকবে না; এবং এটাই ডারউইনের দেওয়া 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রস্তাবনাকে ভুল প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। ডারউইন তার জীবদ্দশায় এ বিষয়ে তেমন কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। অথচ তার সমস্যার সমাধান দিতে পারতেন গ্রেগর মেন্ডেল, যিনি ১৮৬৫ সালে বংশগতি সঞ্চারণের প্রক্রিয়া প্রস্তাব করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, ডারউইন মেন্ডেলের লেখাটা পড়ার সুযোগ পেলেন না; আসলে সেসময় কেউই মেন্ডেলের আবিষ্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করায় তার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সকলের অগোচরে থেকে যায় দীর্ঘদিন ধরে।

অরিজিন অব স্পিসিজ প্রকাশের প্রায় ষাট বছর পর্যন্ত প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুকল্পটি বিজ্ঞানী মহলে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। নিও-ল্যামার্কিজম, অরথজেনেসিস, সল্টেশিনজম, মিউটেশনসহ অনেক অনুকল্প প্রস্তাব করা হয়। ১৯০০ সালের দিকে আবার নতুন করে আবিষ্কৃত হল মেন্ডেলের কাজ। আমরা তখন অবাক হয়ে জানতে পারলাম, ডারউইন যে সমস্যাগুলো নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তার সমাধান ছিলো একেবারে তার হাতের ডগায়। মেন্ডেল দেখালেন, ছেলেমেয়ের প্রত্যেকটি বংশগত বৈশিষ্ট্য মা-বাবার কোনো না কোনো ইউনিট ক্যারেক্টর দিয়ে নির্ধারিত হচ্ছে। বাবা-মার কোষের ভিতরের এই ফ্যাক্টর বা জিনগুলো একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। কিন্তু মেন্ডেলের বংশগতির সঞ্চরণ সূত্রাবলীর প্রতি আবার নতুন এক চ্যালেঞ্জ ছেড়ে দিল মিউটেশনস্টিরা : 'ধীর প্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে নয় বরং আকস্মিক মিউটেশনের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটছে।' এই মতবাদটিও পরবর্তীতে আরও কয়েক দশক ধরেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে।

১৮৮২ সালে ডারউইন যখন মারা যান তখন বংশগতিবিদ্যা বা আণবিক জীববিদ্যার তেমন কোনো বিকাশ ঘটে নি। সে কারণে ডারউইনের সময় প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাকরণের যে অসম্পূর্ণতা ছিল তা পরবর্তীতে বহু দশক ধরে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৩০ এবং ১৯৪০ এর দশকে ফসিলবিদ্যা এবং জিনেটিক্সের সাথে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বয় করে থিওডোসিয়াস ডাবঝানস্কি, জুলিয়ান হাক্সলি, আর্নেস্ট মায়ার, জি জি সিম্পসন, বার্নার্ড রেনেশ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন জীবের বিবর্তনের আধুনিক ব্যাখ্যা। বিবর্তনের এই সংশ্লেষণী তত্ত্বই পরে বিজ্ঞানের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে।

বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব অনুযায়ী আজকের দিনের জীববিজ্ঞানীরা প্রজাতির উৎপত্তির পেছনে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পাশাপাশি বিবর্তনের জন্য অন্য বেশ কিছু প্রক্রিয়াকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে থাকেন, যেমন জিন মিউটেশন, ক্রোমসোম

মিউটেশন, জিনেটিক রিকম্বিনেশন, জিনের পুনরাগমন বা জিন প্রবাহ, জিনেটিক ড্রিফট এবং অন্তরণ। এই আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো প্রজাতির জনপুঞ্জে জিনের ভ্যারিয়েশন রয়েছে এবং এই ভ্যারিয়েশনগুলো তৈরি হচ্ছে আকস্মিক মিউটেশন এবং জিনেটিক রিকম্বিনেশন থেকে। এদের পিছনে কোনো নিয়ম, উদ্দেশ্য বা অভিযোজন কাজ করছে না। কোনো জনপুঞ্জে এই মিউটেশন এবং জিনেটিক রিকম্বিনেশনের হারের উপর জিনের ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তন নির্ভর করবে। কোনো জনপুঞ্জে যদি মিউটেশনের হার বিরল হয় তবে জিনের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনে এর ভূমিকাও হবে অত্যন্ত নগণ্য। এখন কোনো জনপুঞ্জে এই জিনের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তনের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটার পিছনে প্রধান কারণগুলো হচ্ছে : জিন প্রবাহ, জিনেটিক ড্রিফট, অন্তরণ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন।

গত ৫০-৬০ বছরে জিনেটিক্স, অণুজীববিদ্যা, জিনমিক্সের মতো শাখাগুলো এগিয়ে গেছে অকল্পনীয় গতিতে, মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জীবের জিনোমের সংশ্লেষণ পর্যন্ত বের করে ফেলেছেন বিজ্ঞানীরা। এখন তো জীববিজ্ঞানীরা রীতিমতো দাবি করছেন, যদি একটা ফসিলের চিহ্নও পৃথিবীর বুকে কোনোদিন না পাওয়া যেতো তাহলেও আমাদের ডিএনএ-এর মধ্যে পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর হাজার বছরের যে ইতিহাস লেখা আছে তা থেকেই জৈববিবর্তন তত্ত্ব প্রমাণ করা সম্ভব। তবে মজার কথা হচ্ছে, এখন পর্যন্ত ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে যে লক্ষাধিক ফসিল পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটাও কোনো ভুল স্তরে কোনো বেমানান ফসিল পাওয়া যায় নি যা দিয়ে জৈববিবর্তন তত্ত্বকে খণ্ডণ করা যেতে পারে। বরং বিবর্তনীয় বিকাশমূলক জীববিজ্ঞানের মতো জীববিজ্ঞানের অত্যাধুনিক শাখাগুলো জৈববিবর্তন তত্ত্বকে অকাট্যরূপে প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এখন গবেষণাগারেই জীবের বিবর্তনের বিভিন্ন নিদর্শন তৈরি করতে শুরু করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জৈববিবর্তন তত্ত্বকে সঠিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয় নি। যে কোনো বড় তত্ত্বের মতোই একে দশকের পর দশক ধরে বৈজ্ঞানিক 'অগ্নিপরীক্ষা'র মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি তথ্যকে বারবার ঝালিয়ে নেওয়া হয়েছে। আর এই পরীক্ষা আজও চলছে, বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই নতুন নতুন তথ্য এবং জ্ঞানের আলোকে একে পরীক্ষা করে দেখছেন। কিন্তু এত কিছুর পরে জৈব বিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনা কিংবা অহেতুক আক্রমণগুলো কমে নি। দিন দিন যেন তা বেড়েই চলছে। আমেরিকার মত দেশে আজ স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে জৈববিবর্তন তত্ত্ব পড়ানো বাদ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রবক্তা রক্ষণশীল একটি অংশ। আর আমাদের দেশে তো উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে জৈববিবর্তন পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও নামেমাত্র পড়ানো হয়। চট্টগাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধর্মীয় মৌলবাদী অংশের চাপে পড়ে জৈববিবর্তন তত্ত্ব পড়ানো বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জৈববিবর্তন-তাত্ত্বিক, সুপরিচিত অধ্যাপক এবং লেখক দ্বিজেন শর্মা তার এক লেখায় বলেছিলেন পাকিস্তান আমলেও ডারউইনের তত্ত্বের এতোটা বিরোধিতা লক্ষ করা যায় নি, এখন স্বাধীন বাংলাদেশে যা ঘটছে।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বোঝা যায় জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে এত প্রবল বাঁধার কারণটা কি! এটা তো আসলে শুধু একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই নয়, এটা আসলে এক বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। এ আমাদের চিরায়ত চিন্তাভাবনা, দর্শন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনকেও প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। ঘুণে ধরা পুরানো সব মূল্যবোধে তীব্রভাবে আঘাত হেনেছে। পুরানো ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। পৃথিবীতে গুটিকয়েক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মানব সভ্যতার ভিত ধরে নাড়া দিয়েছে তার মধ্যে এটি একটি। কোপার্নিকাসের সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের পরে একেই সবচেয়ে বড় প্যারাডাইম শিফট বলে চিহ্নিত করা হয়। মানুষ শুধু তথাকথিত 'মহাসৃষ্টি'র কেন্দ্র থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়েনি, দুই হাজারেরও বেশি বছর ধরে লালন করা অপরিবর্তনশীল মহাবিশ্ব ও প্রজাতির ধারণা সমৃদ্ধ স্থবির জাগতিক দর্শন থেকেও তাকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করেছে জৈববিবর্তন তত্ত্ব। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল এবং প্লেটো যে স্থির, অপরিবর্তনশীল এক বিশ্বের ছবি এঁকেছিলেন আমরা তার বোঝা বহন করে চলেছি প্রায় দুই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে। তাদের ভাগ্যবাদী, স্থবির এই মতবাদের প্রতিফলন দেখা যায় ধর্মীয় পুস্কে। বার্ট্রান্ড রাসেল এই প্রসঙ্গেই বলেছিলেন, পৃথিবীতে যত বড় বড় বৌদ্ধিক অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটেছে তাদের প্রায় সবাইকে কোনো না কোনোভাবে এরিস্টটলের মতবাদকে উৎখাত করে এগুতে হয়েছে। আমাদের চিন্তাচেতনার সর্বত্র জুড়েই ভর করে রয়েছে সেই অপরিবর্তনশীল ভাগ্যবাদী দর্শন–প্রত্যেকটি প্রজাতিই 'সৃষ্টি' হয়ে পৃথিবীতে এসে পড়েছে, আমাদের সবার ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত, নিয়তিকে ঘিরেই আবর্তিত হয় আমাদের চিন্তাভাবনা। তাই জৈববিবর্তন তত্ত্ব যখন আমাদের বলে এই বিশ্ব সদা পরিবর্তনশীল, কয়েকশো কোটি বছরের যাত্রাপথে আরো কোটি কোটি প্রজাতির জন্ম হয়েছে, আবার তাদের মধ্যে বেশিরভাগই বিলুপ্তও হয়ে গেছে। আমরা মানব-প্রজাতিও হয়তো এক সময় হারিয়ে যাবে, তখন আমরা তা মেনে নিতে কষ্ট হয়। বিখ্যাত জৈববিবর্তন-তাত্ত্বিক অক্সফোর্ডের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স যখন বলেন : 'আমাদের চারপাশের বিশ্বজগতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোনো পরিকল্পনা নেই, উদ্দেশ্য নেই, নেই কোনো অশুভ কিংবা শুভের অস্তিত্ব; আসলে অন্ধ, করুণাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না।'–তখন আমাদের স্থবির ভাগ্যবাদী অচলায়তনের মোড়কে পোড়া দর্শন এবং বৌদ্ধিক স্বত্তা প্রবলভাবে নাড়া খায়। চারপাশের পরিবেশ বদলায়, আমরা বদলাই, তার সাথে-সাথে বদলে যায় পরিবেশের সাথে আমাদের নিত্যদিনের সম্পর্কগুলোও। আমরা মানুষেরা সেই বিশ্ব-প্রকৃতিরই একটি ছোট্ট অংশ। প্রকৃতির আর সবার সাথেই আমাদের যাত্রাপথ ভাগ করে নিতে হবে। স্টিফেন জে গুল্ড বোধহয় সেটা ভেবেই বলেছিলেন :

> "We are the offspring of history, and must establish our own paths in this most diverse and interesting of conceivable universes–one indifferent to our suffering, and therefore offering us maximal freedom to thrive, or to fail, in our own chosen way."

প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব কি ভেঙ্গে পড়েছে?

মাহবুবুর রহমান*

ভাষার মৃত্যু হয়। প্রাচীন মিশরের হাইরোগ্লিফ ভাষায় এখন কেউ কথা বলে না। সংস্কৃত একটি মৃত ভাষা। মৃত ভাষার চর্চা হয়। কিন্তু বিলুপ্ত ভাষার চর্চাও হয় না। সভ্যতার মৃত্যু হয়। রোমান সাম্রাজ্যের অনেক অবশেষ টিকে থাকলেও তার স্থান ইতিহাস গ্রন্থের পাতায়। মুসোলিনি চেয়েছিলেন রোমান সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনতে। ফিরিয়ে আনতে 'রোমান গৌরব'। মুসোলিনি নিজে আজ ইতিহাস, কিন্তু গৌরবহীন। মহাকাব্য এখন আর লেখা হয় না। ব্যক্তির উদ্ভবের সাথে জন্ম নিয়েছে উপন্যাস। মহাকাব্যের মৃত্যু ঘটেছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখেছিলেন, 'বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে?' প্রশ্ন হচ্ছে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কি মৃত্যু হয়? পরমাণু ভাঙার সাথে ভেঙে পড়েছে ডালটনের পরমাণুবাদ। ১৮৫৯ সালে *প্রজাতির উৎপত্তি* গ্রন্থে চার্লস ডারউইন প্রকাশ করেছিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব। আজ ১৫১ বছর পর কী সেই তত্ত্ব ভেঙে পড়েছে? সাম্প্রতিক গবেষণা কি বলছে?

বিজ্ঞানীরা ডারউইনের সময়ে তত্ত্বটির কিছু সীমাবদ্ধতার কথা বলেছিলেন। সেটা বিজ্ঞানের যে কোন তত্ত্বের জন্যই প্রযোজ্য। 'পরম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' বলে কিছু নেই। ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রজাতির উৎপত্তি গন্থের প্রকাশের সাথে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানী মহলে

এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। ডারউইন বইটি লিখেছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য। বিজ্ঞানের কাজ বিশেষ একটি মহল করলেও, বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের জন্য। এটুকু কাণ্ডজ্ঞান ডারউইনের ছিল। গ্যালিলিও একই কাজ করেছিলেন। ১৬৩২ সালে তিনি ইতালিয়ান ভাষায় লিখেন, "*Dialogue Concerning the Two Chief World Systems*" বইটি। সেসময় বিজ্ঞানীরা ল্যাটিন ভাষায় লিখতেন। গ্যালিলিও লিখেছিলেন সাধারণ মানুষের ভাষায়। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ যেন এ বিষয়ে পড়তে পারে। তিনি এটাও জানতেন তাকে ভবিষ্যতে গোলমালে পড়তে হবে। ব্রুনোর ঘটনা গ্যালিলিও জানতেন। সেজন্য গ্যালিলিও বইটি উৎসর্গ করেন তাসকানির গ্র্যান্ড ডিউক মেদিচি পরিবারের দ্বিতীয় ফার্দিনান্দকে। উদ্দেশ্য রাজানুকুল্য পাওয়া। প্রকাশের পর বইটি বেস্ট সেলারে পরিণত হয়। বইটিতে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বজগতের কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু বলেন নি এটাই ঠিক। বাইবেলের পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বজগতের ধারণার বাইরে মত প্রকাশের কারণে ১৬৩৩ সালে বইটি নিষিদ্ধ করে চার্চ। কিন্তু তবুও ১৬৩৫ সালে বইটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। নাম *Systema cosmicum*। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত বইটি চার্চ নিষিদ্ধ করেনি। কারণ সাধারণ মানুষ ল্যাটিন পড়তে পারে না। গ্যালিলিও'র মত ডারউইন প্রজাতির উৎপত্তি বইটি সাধারণ মানুষের জন্য লিখেছিলেন। সাধারণ ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিহার করে বইটি লেখা। কিন্তু বইটির বিষয় এমন যে বিজ্ঞানীরা বইটিকে খুব গুরুত্বের সাথে নিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মত চমৎকার একটি তত্ত্ব যা জৈববিবর্তনের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম তা বেশ কিছু তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি করে। এ সমস্যাগুলোর উত্তর সমসাময়িক বিজ্ঞান দিতে পারছিল না। প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থটি প্রকাশের সময় সমসাময়িক বিজ্ঞান কিছুটা পিছিয়ে ছিল। ডারউইন নিজেই কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেন। প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের নাম, 'Difficulties on Theory'। ডারউইন নিজেই এই অধ্যায়ে চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তাব করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে তিনি সমাধান দিতে পারেননি কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। দুবছরের মধ্যে তার একটি ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছে। পরবর্তীতে আরো অনেক।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা বিরল। তাৎক্ষণিক সাফল্যের পরেও কিছু তাত্ত্বিক সমস্যাগুলো রয়ে গিয়েছিল। তাদের সমাধান ডারউইনের জীবদ্দশায় হয়নি। একটি সমস্যা হল পৃথিবীর বয়স। বর্তমানে আমরা জানি পৃথিবীর বয়স হল, ৪.৫৪ বিলিয়ন বছর।[১] পৃথিবীর প্রাচীনত্ব নিয়ে আজ আর বিতর্ক হয় না। কিন্তু শুরুটা এমন ছিল না। আইরিশ আর্চবিশপ জেমস আশার বাইবেলের বিভিন্ন ঘটনাকে ঐতিহাসিক ভিত্তি ধরে ১৬৫৪ সালে বলেন (Annals of the World, trans. 1658) পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্ব সালের ২৩ অক্টোবর। সে সময়ে ইউরোপে এ হিসাবটি বিজ্ঞানীসহ বেশিরভাগ মানুষ মেনে নিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ের চেষ্টা করছিলেন। ফরাসি প্রকৃতিবিদ বুঁফো ১৭৭৯ সালে পৃথিবীর বয়স বের করার জন্য একটি পরীক্ষা করেন। পৃথিবীর মত গঠনের একটি ছোট গোলক উত্তপ্ত করে তিনি হিসাব করেন তার শীতল হলে কত সময় লেগেছে। এভাবে পৃথিবীর আকৃতির একটি গোলকের শীতল হতে তার হিসেবে সময় লাগবে ৭৫,০০০ বছর। সুতরাং পৃথিবীর বয়স ৭৫,০০০ বছর। পৃথিবীর অভ্যন্তর কী দিয়ে গঠিত সেসম্পর্কে বুফোঁর ধারণা ছিল না। ফলে হিসাবটি হল এত গোলমেলে। প্রজাতি উৎপত্তি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ডারউইন ইংল্যান্ডের দক্ষিণের ওয়েল্ড উপত্যকার ভূমি ক্ষয়ের হার হিসেব করে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করলেন ৩০০ মিলিয়ন বছর। প্রাকৃতিক নির্বাচন একটি ধীর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় জীবের পরিবর্তনের জন্য বিপুল সময়ের প্রয়োজন একথা ডারউইন জানতেন। সুতরাং ৭৫ হাজার থেকে ৩০০ মিলিয়ন বছরে উত্তরণ তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়েছে। কিন্তু সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞানীরও মনে হল এ হিসাবটি অনেক বেশি। প্রাকৃতিক নির্বাচন

* মাহবুবুর রহমান : লেখক। পেশায় চিকিৎসক। ঢাকায় একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।

তত্ত্বের বিরোধী বিজ্ঞানী উইলিয়াম টমসন (লর্ড কেলভিন) তিন বছর পর ১৮৬২ সালে নতুন হিসেব দিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে গোঁড়া খ্রিস্টান টমসন ২৩ মে ১৮৮৯ সালে খ্রিস্টিয়ান এভিডেন্স সোসাইটির সভায় বলেছিলেন, তার বৈজ্ঞানিক কাজের লক্ষ্য হল ধর্মবিশ্বাসকে সংহত করা। টমসন বুঁফোর পদ্ধতিতে ফিরে গেলেন পৃথিবীর বয়স হিসেবের জন্য। উত্তপ্ত পৃথিবীর ভূত্বক বর্তমান তাপমাত্রায় আসতে কত বছর লাগতে পারে তা হিসেব করছিলেন তিনি। তার হিসেবে এল, পৃথিবীর বয়স ২০ থেকে ৪০০ মিলিয়ন বছরের মধ্যে হবে।[২] উত্তপ্ত পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তাপ পরিচলন প্রক্রিয়ায় ভূত্বকের দিকে আসে এ বিষয়টি তার হিসেবে ছিল না। তিনি আরো জানতেন না, তেজস্ক্রিয় মৌলের ভাঙ্গনের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ উৎপন্ন হয়। ফলে পৃথিবীর আসল বয়স থেকে তার হিসেব এসেছিল অনেক কম। টমসনের লক্ষ্য ছিল ডারউইন, তার প্রমাণ তার লেখাতেই পাওয়া যায়। ডারউইনের হিসেব এবং তার পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করে টমসন লিখেন, What then are we to think of such geological estimates as [Darwin's] 300,000,000 years for the "denudation of the Weald"?[৩] সমসাময়িক অনেক বিজ্ঞানী কেলভিনের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। বিজ্ঞানী টি এইচ হাক্সলি ১৮৬৯ সালে দেখিয়েছেন, টমসনের হিসেব দাঁড়িয়ে আছে ভুল ভিত্তির ওপর। কিন্তু তাতে দমে যাননি টমসন। তিনি জানতেন পৃথিবীর বয়স যত কম পাওয়া যাবে, ডারউইনের পক্ষে তার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব প্রমাণ করা ততো কঠিন হবে। ১৮৯৭ সালে আবার নতুন হিসেব উপস্থাপন করলেন তিনি, "that it was more than 20 and less than 40 million year old, and probably much nearer 20 than 40."[৪] কিন্তু তার দু বছর আগে ১৮৯৭ সালে, ফরাসি বিজ্ঞানী জন পেরি নতুন একটি হিসেব দিলেন। তার মডেলে পৃথিবীর অভ্যন্তর তরল এবং ভূত্বক কঠিন কিন্তু খুব পাতলা। তিনি হিসেব করলেন পৃথিবীর তরল অভ্যন্তর থেকে তাপ পরিচলন প্রক্রিয়ায় সঞ্চালন হয়। তার হিসেবে পৃথিবীর বয়স দাঁড়াল ২ থেকে ৩ বিলিয়ন বছর। কিন্তু টমসন তার হিসেব আঁকড়ে থাকলেন। তার কোন ভুল হয়নি। ১৮৯৬ সালে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হলে শিলা এবং পৃথিবীর বয়স বের করার নতুন পদ্ধতি পাওয়া গেল। পিয়ের এবং মারি কুরির গবেষণা থেকে জানা গেল সূর্য ছাড়াও পৃথিবীতে তাপের আরেকটি উৎস আছে। তা হল তেজস্ক্রিয়তা। তেজস্ক্রিয় মৌল একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তার ওপর ভিত্তি করে জানা গেল, তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু আছে। অর্ধায়ুর ধারণা ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা শিলার বয়স বের করতে সমর্থ হলেন। রাদারফোর্ড একটি শিলার বয়স বের করলেন ৪০ মিলিয়ন বছর। রাদারফোর্ডের প্রবন্ধটি উপস্থাপনের দিন টমসন যিনি লর্ড কেলভিন নামেই বেশি পরিচিত, উপস্থিত ছিলেন। রাদারফোর্ড পরে লিখেছেন, "I came into the room, which was half dark, and presently spotted Lord Kelvin in the audience and realized that I was in trouble at the last part of my speech dealing with the age of the earth, where my views conflicted with his. To my relief, Kelvin fell fast asleep, but as I came to the important point, I saw the old bird sit up, open an eye, and cock a baleful glance at me! Then a sudden inspiration came, and I said, 'Lord Kelvin had limited the age of the earth, provided no new source was discovered. That prophetic utterance refers to what we are now considering tonight, radium!' Behold! the old boy beamed upon me."[৫]

উপরের উদ্ধৃতিটিতে কেলভিন সম্পর্কে রাদারফোর্ডের মনোভাব এবং শব্দচয়ন (old bird) লক্ষ্যণীয়। লর্ড কেলভিন সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না। যথেষ্ট চিন্তা ছাড়াই তিনি প্রায়ই মন্তব্য করতেন। এক্স-রে আবিষ্কারের পর ১৮৯৬ সালে তিনি একে ধাপ্পাবাজি বলে অভিহিত করলেন। সে বছরই নিজের হাতের এক্স-রে ছবি তোলার পর নিজের মন্তব্য প্রত্যাহার করেন তিনি। একই বছর তিনি এ্যারোনটিক্যাল সোসাইটিতে যোগদানের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন। তিনি মনে করেতেন মানুষ কখনো উড়তে পারবে না। ১৯০২ সালে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "No balloon and no aeroplane will ever be practically successful."। ১৯০০ সালে ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর এডভান্সমেন্ট অফ সাইন্সের সভায় তিনি বলেন, "There is nothing new to be discovered in physics now. All that remains is more and more precise measurement"। এক্স-রের মত বেতার সম্পর্কে চিন্তা ছাড়াই তিনি বলেছিলেন, "Radio has no future."। কিন্তু আমেরিকা যাবার সময় জাহাজে বসে বেতারের সাথে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর পুরো বিপরীত মন্তব্য করেন, "The wireless telegraphy is one of the most wonderful inventions the world has ever seen. I think it will be of great commercial use some day and as I have seen it demonstrated on the ship in which I have just arrived I can say that it is very marvelous indeed." এমন একটি চরিত্রকে শুধু চলচ্চিত্রেই মানায়। জুলভার্নের আশি দিনে বিশ্বভ্রমণ উপন্যাস থেকে ২০০৪ সালের চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্রকার মূল কাহিনী থেকে অনেক দূরে সরে আসেন। ফিলিয়াস ফগের পরিবর্তে নায়ক হয়ে যায় তার পরিচারক পাসপারটু। বাজি ধরার স্থানটি ছিল রিফর্ম ক্লাব। কিন্তু এ চলচ্চিত্রে তা হয় রয়াল একাডেমি অফ সাইন্স। বাজি ধরা হয় লর্ড কেলভিনের সাথে। লর্ড কেলভিন বাজিতে জেতার জন্য হেন কাজ নেই যা করেন। উপন্যাসে এসব না থাকলেও সিনেমাতে এসব স্থান পায়। লর্ড কেলভিনের চরিত্র বিচারে চলচ্চিত্রকার খুব ভুল করেছেন বলা যাবে না। সিনেমাটির শেষে রানী ভিক্টোরিয়ার হস্তক্ষেপে লর্ড কেলভিনকে ঘোড়ায় টানা প্রিজন ভ্যানে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু বাস্তব ছিল অন্যরকম। রানী ভিক্টোরিয়া ১৮৬৬ সালে তাকে নাইট উপাধি প্রদান করেন। রয়াল সোসাইটি থেকে পান রয়াল মেডাল (১৮৫৬) এবং কোপলে মেডাল (১৮৮৩)। ১৮৯৬ সালে পান নাইট গ্র্যান্ড ক্রস অফ দি ভোক্টোরিয়ান অর্ডার। ১৯০৫ সালে মৃত্যুর দু বছর আগে জন ফ্রিৎজ মেডাল। মৃত্যুর পর তাকে সমাহিত করা হয় ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে, ঠিক নিউটনের পাশে। বর্তমান ১০০ পাউন্ডের নোটে তার ছবি রয়েছে। লর্ড কেলভিনের অবদান অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু আইডিওলজি একজন ব্যক্তিকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে কেলভিন তার উদাহরণ।

পৃথিবীর বয়স নিয়ে বিতর্কের সমাধান হলেও চার্লস ডারউইন তা দেখে যেতে পারেননি। বিতর্কের উপাদান আরো ছিল। ডারউইন নিজেও তা জানতেন। প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থে এসব বিষয় নিয়ে ডারউইন একটি অধ্যায় লিখেছিলেন। ষষ্ঠ অধ্যায়, 'Difficulties on Theory'-তে তিনি চারটি সমস্যার কথা বলেছেন। প্রথমেই তিনি অন্তর্বর্তী পর্যায়ের প্রাণীর অভাবের কথা বলেছেন। বিবর্তনের মূল কথাটি হচ্ছে প্রজাতি পরিবর্তিত হয়। এ ধারণার জনক ডারউইন নিজে নন। ধারণাটি প্রায় দু হাজার বছরের পুরানো। ১৮০৯ সালে, যে বছর ডারউইনের জন্ম, সে বছর ফরাসি বিজ্ঞানী জঁ বাপতিস্ লামার্ক জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করে একটি অনুকল্প উপস্থাপন করেন। কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে অনুকল্পটি 'তত্ত্ব' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৮৫৯ সালে ডারউইন নিয়ে এলেন জৈববিবর্তনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব'। প্রজাতি যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে দুটো পর্যায়ের মাঝামাঝি বৈশিষ্ট্যের কিছু জীবিত প্রাণী বা ফসিল পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় এসব অন্তর্বর্তী প্রাণী? প্ল্যাটিপাস একটি অন্তর্বর্তী প্রাণী যা সরীসৃপ ও স্ন্যপায়ীর বৈশিষ্ট্য একই সাথে ধারণ করে। প্ল্যাটিপাস সরীসৃপের মত ডিম পাড়ে কিন্তু তার গায়ে লোম আছে। লোম স্ন্যপায়ীর শরীরেই শুধু থাকে। স্ন্যপায়ীরা সন্তান জরায়ুতে ধারণ করে এবং প্রসব করে। সন্তান ভূমিষ্ট হলে মাতৃদুগ্ধ পান করে। প্ল্যাটিপাস ডিম পাড়ে কিন্তু সন্তান মাতৃদুগ্ধ পান করে। অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্যের কারণেই বিচিত্র একটি প্রাণী প্ল্যাটিপাস। ১৭৯৮ সালে প্ল্যাটিপাসের একটি স্কেচ যখন ইংল্যান্ডে এল বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত ভেবেছিল, এটা কোনো ধাপ্পাবাজি। বিগল ভ্রমনের সময় অস্ট্রেলিয়ায় ডারউইন প্ল্যাটিপাসের সাক্ষাৎ পান। তিনি এর অভিনবত্বে বিস্মিত হন। কিন্তু এর গুরুত্ব তিনি বুঝতে পারেন নি। ১৮৫৯ সালে প্রজাতির উৎপত্তি প্রকাশের সময় অন্তর্বর্তী কোন ফসিলের কথা জানা ছিল না। ডারউইন তার গ্রন্থে নিজেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন কেন অন্তর্বর্তী প্রাণী দেখা যায় না। শেষ অধ্যায়ে তিনি খুব জোর দিয়ে কিছু কথা বলেছেন, "I can answer these questions and grave objections only on the supposition that the geological record is far more imperfect than most geologists believe. …The number of specimens in all our museums is absolutely as nothing compared with the countless generations of countless species which certainly have existed. .....Only a small portion of the world has been geologically explored." অর্থাৎ এ ধরনের ফসিল আছে, খুঁজলে পাওয়া যাবে। ডারউইনের মেধা এবং তার চরিত্রের শক্তি এই বাক্যগুলোতে ধরা পড়েছে। এখানে থেমে না থেকে আরেকটু এগিয়ে ডারউইন লিখলেন কোথায় পাওয়া যেতে পারে ফসিল। দু বছর পর নতুন ফসিল আবিষ্কারের ঘটনা ঘটল। জার্মানির ব্যাভারিয়া অঞ্চল চুনা পাথরের খনির জন্য বিখ্যাত। রোমান যুগ থেকে এখান থেকে চুনা পাথরের প্লেট নেয়া হয়। বাড়ির ছাদের টালি হিসেবে তা ব্যবহৃত হয়। যে চক দিয়ে বোর্ডে আমরা লিখি তা হল চুনা পাথর। চুনা পাথর হল পাললিক শিলা । পাললিক শিলা হল এমন পাথর যা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি হয় । আজ থেকে ১৫ কোটি বছর আগে জার্মানির ব্যাভারিয়ায় চুনাপাথরের স্তরে এমন অনেক প্রাণীর মৃতদেহ জমা হয়েছিল। কালক্রমে সেসব দেহ আকৃতি বজায় রেখে পাথুরে গঠনের ফসিলে পরিণত হল। ব্যাভারিয়ার শুধু সলেনহোফেন অঞ্চল থেকে ৪৫০ প্রজাতির বেশি জীবের ফসিল পাওয়া গিয়েছে।

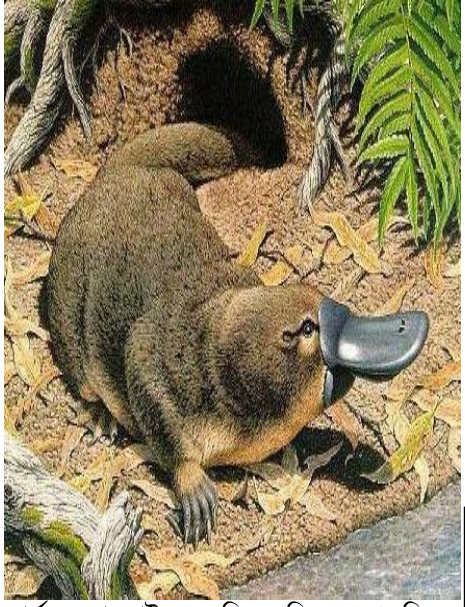

১৮৬০ সালে চুনাপাথরের খনিতে একটি পালকের ফসিল পাওয়া গেল। এর গুরুত্ব ততোটা বোঝা গেল না। পরের বছর ১৮৬১ সালে খনিতে শ্রমিকেরা কাজ করার সময় পুরো একটি পাখির ফসিল আবিষ্কার করল। আজ সেই শ্রমিকের নাম জানা খুব মুশকিল হবে। শ্রমিকটি চিকিৎসার বিনিময়ে ডাক্তার কার্ল হেবারলাইনকে দিয়ে দিলেন প্রকৃতির এই খেয়ালটি যার মূল্য সম্পর্কে কোন ধারণা তার ছিল না। হেবারলাইন স্থানীয় একজন ফসিল ব্যবসায়ীর সহায়তায় ৭০০ পাউন্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টরির কাছে ফসিলটি বিক্রি করে দিলেন। ১৮৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে ফসিলটি লন্ডনে পৌঁছল। প্রত্নজীববিজ্ঞানী রিচার্ড ওয়েনের আগ্রহেই মিউজিয়াম ফসিলটি ক্রয় করে। ওয়েন জানতেন ফসিলটি একটু বিশেষ ধরনের। একই সাথে তার কিছু বৈশিষ্ট্য পাখি ও সরীসৃপের, ঠিক যেন সুকুমারের 'বকচ্ছপ'। বক হল পাখি আর কচ্ছপ হল সরীসৃপ। ওয়েন এর নাম দিলেন 'আর্কিওপটেরিক্স' (*Archaeopteryx*)। এটি গ্রিক শব্দ, অর্থ 'প্রাচীন পালক'। ওয়েন নিজে এ ফসিল বর্ণনা করেন। ১৮৬৩ সালে ওয়েন তার প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। নাম On the Archaeopteryx of Von Meyer, with a description of the fossil remains of a long-tailed species from the lithographic stone of Solnhofen। কিন্তু তিনি আর্কিওপটেরিক্সকে 'অন্তর্বর্তী প্রাণী' বলে কখনো মেনে নেননি। তার মতে এটা ছিল পাখি। ওয়েনের কথার মূল্য ছিল। তিনি ছিলেন সে সময়ের মেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনামূলক অ্যানাটমির একজন প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ। কিন্তু লন্ডনে আরো বিজ্ঞানী ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন টি এইচ হাক্সলি; একজন আন্তর্জাতিক মানের তুলনামূলক অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞ। প্রথম জীবনে তার আগ্রহ ছিল অমেরুদণ্ডী প্রাণীতে। কিন্তু পরে তিনি মেরুদণ্ডী প্রাণী নিয়ে বহু মূল্যবান গবেষণা করেন। ওয়েনের যুক্তি খণ্ডন করতে হাক্সলি ১৮৬৮ সালে দুটো প্রবন্ধ লিখেন। ওগুলো হল On the animals

১৮৬১ সালে ইংল্যান্ডের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের সংগৃহীত প্রথম আর্কিওপটেরিক্সের ফসিল

which are most nearly intermediate between birds and reptiles এবং Remarks upon Archaeopteryx lithographica। হাক্সলি ধরিয়ে দিলেন ফসিলটির অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্য। ফসিলটির অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্য বিবর্তন প্রক্রিয়া ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। আর্কিওপটেরিক্সের অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্য ডারউইনের ভবিষ্যদ্বাণীকে 'সত্য' প্রমাণ করল। এ ফসিলের আবিষ্কার ডারউইনবাদ তথা জৈববিবর্তন তত্ত্বকে বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। সেজন্য আজো ফসিল নিয়ে কোন বই লেখা হলে আর্কিওপটেরিক্সের নাম আসে। এভাবে ডারউইনের জীবদ্দশায় চারটি সমস্যার একটির সমাধান হল। কিন্তু আরো সমস্যা রয়ে গেল।

জীবের মহাদেশীয় বিস্তৃতি বিষয়টির ব্যাখ্যা ঐ সময় মানুষের জানা ছিল না। ক্যাঙ্গারু, প্ল্যাটিপাস এসব আদি স্ন্যপায়ীদের কেন শুধু অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়? বিজ্ঞানীরা বলেন প্রোটোথেরিয়ান ও মেটাথেরিয়ান স্ন্যপায়ী। এ ধরনের কিছু স্ন্যপায়ী উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতে পাওয়া গেলেও পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু সমস্ পথিবীতে ছড়িয়ে আছে উন্নত স্ন্যপায়ী। এদের বলা হয় ইউথেরিয়ান স্ন্যপায়ী। এর কারণ কী? যদি সমস্ জীব একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে, তবে জীবের বিস্তৃতি সব স্থানে একই হবার কথা। অথবা প্রতিটি মহাদেশে যদি আলাদাভাবে জীবের উৎপত্তি ঘটে থাকে, তবে প্রতিটি মহাদেশের জীব আলাদা হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। যেমন মানুষ প্রতিটি মহাদেশে আছে এবং এরা একই প্রজাতিভূক্ত। এর অর্থ হল জীব স্থানান্তরিত হয়। তাহলে কিছু জীবের ক্ষেত্রে এই স্থানান্তর ব্যাখ্যা করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাতে সোনা ব্যাঙ আছে। সোনা ব্যাঙের ত্বক পাতলা। এই ত্বক দিয়ে পানি এবং লবণ সহজে শরীরে প্রবেশ করতে পারে। ধরা যাক আফ্রিকাতে সোনা ব্যাঙের উদ্ভব। দক্ষিণ আমেরিকাতে আসতে হলে তাকে আটলান্টিক পাড়ি দিতে হবে। সমুদ্রের লবণাক্ত জলে বেশি সময় বাঁচতে পারবে না ব্যাঙ। কিন্তু যেহেতু আটলান্টিকের দু পাড়েই ব্যাঙ রয়েছে তাহলে কীভাবে তা সম্ভব? ডারউইন চেষ্টা করেছিলেন এর উত্তর দেবার। কিন্তু যথার্থ উত্তর তিনি দিতে পারেন নি। আসলে দেয়া সম্ভব ছিল না তার সময়ে। ডারউইনের মৃত্যুর তিরিশ বছর পর ১৯১২ সালে জার্মান বিজ্ঞানী আলফ্রেড ভেগনার বললেন, মহাদেশগুলো চলমান। একসময় সবগুলো মহাদেশ একসাথে ছিল। এখন তারা দূরে সরে গিয়েছে। মহাদেশ এখনো চলমান। কিন্তু চলার গতি খুব ধীর। বর্তমান বেগ হচ্ছে ০.৭৮ থেকে ৫.৯ ইঞ্চি প্রতি বছরে। তাই আমরা বুঝতে পারি না। অত্যন্ত বৈপ্লবিক ছিল ভেগনারের অনুকল্প। সে সময় কেউ বিশ্বাস করতে চায় নি। এখনো অনেকে চায় না। বিবিসি'র তথ্যচিত্র নির্মাতা ডেভিড এটেনবরো কেমব্রিজে যখন ভূতত্ত্ব পড়তে যান তখন ভেগনারের অনুকল্প পড়ানো হত না। ১৯৪৭ সালে ক্লাসে তিনি একজন ভূতত্ত্বের অধ্যাপকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন যদি এটেনবরো দেখাতে পারেন কী শক্তি দিয়ে মহাদেশ নাড়ানো যায় তবে তিনি ভেগনারের অনুকল্প পড়াবেন। মহাদেশের মত বিশাল একটি বস্তুকে কোন বল দিয়ে নাড়ানো সম্ভব এর ব্যাখ্যা ভেগনার দিতে পারেন নি। এছাড়া যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নি। বিজ্ঞানীরা যখন প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করে এমন সাধারণ নিয়ম প্রস্তাব করেন তাকে বলা হয় মতবাদ বা অনুকল্প । যখন অনুকল্পের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তখন

এর নাম হয় তত্ত্ব। পঞ্চাশের দশকে মহাদেশীয় চলনের পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যেতে শুরু করে। কেমব্রিজে প্রাচীন পৃথিবীর চুম্বকত্ব নিয়ে গবেষণা থেকে বোঝা যায় মহাদেশ চলমান। ১৯৫৩ সালে ভারতে ভূতাত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় যে তা একসময় দক্ষিণ গোলার্ধে ছিল। যখন ভূ-উপগ্রহ থেকে পৃথিবীর ছবি তোলা শুরু হল, তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল মহাদেশ চলমান। ষাটের দশকে এসে ভূতাত্ত্বিকরাও মনে করতেন মহাদেশ চলমান। ফলে ডারউইনের তত্ত্বের আরেকটি বড় সমস্যার সমাধান হল। ব্যাঙের সমস্যাটির সমাধান হল উভচর উদ্ভবের সময় পৃথিবীর মহাদেশগুলো একসাথে ছিল। ভূখণ্ড নিজেই তাদের বিস্তার ঘটিয়েছে। স্ন্যপায়ীদের উদ্ভব সম্ভবত এশিয়াতে। চীনে পাওয়া গিয়েছে ১২৫ মিলিয়ন বছরের পুরনো মারসুপিয়াল ফসিল। ক্যাঙ্গারু মারসুপিয়াল। ইউরেশিয়া থেকে মারসুপিয়ালরা ৬৫ মিলিয়ন বছর পূর্বে বেরিং যোজক হয়ে উত্তর আমেরিকা পৌঁছে। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এন্টার্কটিকা হয়ে ৫০ মিলিয়ন বছর পূর্বে এরা অস্ট্রেলিয়া পৌঁছে।[৬] অর্থাৎ এরা সব মহাদেশেই ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ইউথেরিয়ান স্ন্যপায়ীদের বিকাশের ফলে প্রতিযোগিতায় তারা টিকতে না পেরে বিলুপ্ত হয়। অস্ট্রেলিয়ায় তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে আদি স্ন্যপায়ী ক্যাঙ্গারু, প্ল্যাটিপাস টিকে যেতে পারল। অস্ট্রেলিয়াতে স্ন্যপায়ী বিবর্তন এই পর্যায়েই থেমে থাকে। এভাবে জীবের বিস্তৃতির সমস্যাটির সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল। তবুও সমস্যা রয়ে গেল। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের একটি বড় অংশ হচ্ছে, প্রকৃতিতে টিকে থাকার উপযোগী বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হয় এবং টিকে থাকার অনুপযুক্ত বৈশিষ্ট্যধারী জীবের বিলুপ্তির মাধ্যমে অনুপযোগী বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। কিন্তু বৈশিষ্ট্য একটি জীব থেকে অন্য জীবে কীভাবে সঞ্চারিত হয় ডারউইন তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। জেনেটিক্সের জ্ঞান আজ সহজেই এসব বুঝতে সাহায্য করে। ডারউইনের সময়টা এমন ছিল না। য়োহান গ্রেগর মেন্ডেল ১৮৬৬ সালে তার যুগান্তকারী প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। ওটা ছিল বংশগতিবিদ্যা বা জেনেটিক্সের শুরু। লেখাটি বিজ্ঞানী মহলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি। হয়ত তারা লেখাটি বুঝতে পারেন নি। ডারউইন মেন্ডেলের কাজ সম্পর্কে জানতেন না। ফলে বংশগতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক ধারণা তার লেখাতে অনুপস্থিত ছিল।

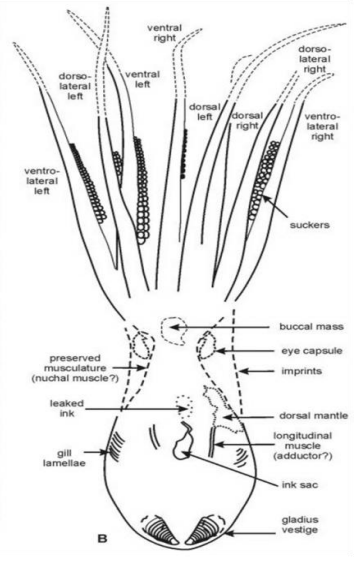

ডারউইনের তত্ত্বের আরেকটি বড় সমস্যা ছিল জীবনের আদি রূপের ফসিল প্রমাণের স্বল্পতা। জীব যদি সরল থেকে জটিল হয়ে থাকে তবে সরল জীবের ফসিল কোথায়? ৫৩০ মিলিয়ন বছর আগে প্যালিওজোয়িক মহাযুগের ক্যামব্রিয়ান যুগে প্রচুর ফসিল পাওয়া গিয়েছে। ট্রাইলোবাইট, ওপাবিনিয়া এসব উন্নত বহুকোষী জীব ক্যামব্রিয়ান যুগের ফসিল। কিন্তু এর পূর্ববর্তী প্রিক্যামব্রিয়ান যুগে ফসিলের অভাবের কারণ কী? তাহলে কি জীব সরল থেকে জটিল হয় নি? হঠাৎ করে জটিল জীবের সৃষ্টি হয়েছে ক্যামব্রিয়ান যুগে। ক্যামব্রিয়ান যুগের ফসিলের আধিক্যকে বলা হয় 'ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণ'। ডারউইন ক্যামব্রিয়ান বিস্ফোরণকে মনে করেছেন তার তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী যুক্তি। কিন্তু পরবর্তীতে প্রিক্যামব্রিয়ান সময়ের অনেক ফসিল পাওয়া গিয়েছে। এখন আমরা জানি প্রিক্যামব্রিয়ান যুগে এককোষী জীব বা তাদের কলোনি ছিল। সেসব জীবের গঠন এমন যে ফসিল সহজে তৈরি হয় না। বিজ্ঞানীরা এখন অনেক অনুকল্প দিয়েছেন কেন প্রিক্যামব্রিয়ান ফসিল সহজে পাওয়া যায় না। প্রত্নতত্ত্বের বিকাশের সাথে পৃথিবীর বহু স্থানে এখন ফসিল অনুসন্ধান হচ্ছে। ফলে নতুন নতুন সব ফসিল পাওয়া যাচ্ছে যা আগে ভাবা যেত না। খনিজযুক্ত শক্ত দেহ বা কঙ্কাল না থাকায় অক্টোপাসের খুব কম ফসিল পাওয়া গিয়েছে। ২০০৯ সালে লেবাননে চুনা পাথরের স্তরে পূর্ণাঙ্গ একটি ফসিল পাওয়া গিয়েছে। ৯৫ মিলিয়ন বছর ফসিলটির। প্রতিটি গঠন পরিস্কারভাবে রক্ষিত। এমনকি অক্টোপাস এর কালি পর্যন্ত ফসিলে পাওয়া গিয়েছে। এ আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত অক্টোপাসের মোটে একটি প্রজাতির ফসিল পাওয়া গিয়েছিল। এখন মোট তিনটি নতুন প্রজাতি পাওয়া গেল। যতটা ভাবা হতো তার চেয়ে অনেক প্রাচীন এদের বিবর্তনের ইতিহাস। অক্টোপাসের ইতিহাস এখন নতুন করে লিখতে হবে। এ আবিষ্কারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, যেসব জীবের ফসিল সাধারণভাবে মনে করা হয় পাওয়া সম্ভব না, তাদের নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে।[৭]

যদিও আমরা মনে করে থাকি ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী তা মনে করেন না। অতিকায় সব ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে তা হয়ত ঠিক। কিন্তু ছোট ছোট কিছু ডাইনোসর টিকে গিয়েছিল। থেরোপড ডাইনোসর থেকেই আধুনিক পাখির উদ্ভব। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এ কথাটি ১৮৬৮ সালে প্রথম বলেছিলেন টি এইচ হাক্সলি। ১৮৬৩ সালে ব্যাভারিয়া থেকে ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়ামে আর্কিওপটেরিক্সের ফসিলটি পৌঁছে। একই সাথে সরীসৃপ ও পাখির বৈশিষ্ট্য বহনকরা এ ফসিল নিয়ে গবেষণা করে হাক্সলি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। সে সময় এ ধরনের ডাইনোসরের ফসিল নিয়েও গবেষণা করছিলেন হাক্সলি। ফলে সহজেই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছেন তিনি। পরবর্তীতে হাক্সলির অনুকল্পের পক্ষে বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এবং এখনো পাওয়া যাচ্ছে। বেশিরভাগ প্রত্নতত্ত্ববিদ মনে করেন ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে মহাশূন্য থেকে আসা একটি গ্রহাণু মেক্সিকোর পূর্ব উপকূলে আঘাত হানে। সময়টা ছিল মেসোজোয়িক ও সিনোজোয়িক মহাযুগের সন্ধিক্ষণ। মেসোজোয়িক মহাযুগ শেষ হয় ক্রিটেইশাস দিয়ে। সিনোজোয়িক মহাযুগ শুরু হয় প্যালিওসিন দিয়ে। অর্থাৎ শিলাস্তরে ওপরে প্যালিওসিন এবং নিচে ক্রিটেইশাস। লুই আলভারেজ, তার ছেলে ওয়াল্টার আলভারেজ ও অন্যান্যরা ১৯৮০ সালে ভূত্বকে শিলায় এই

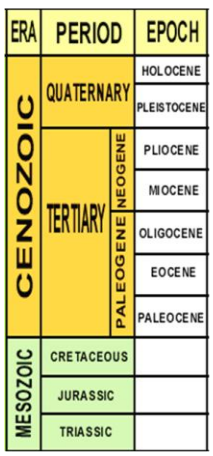

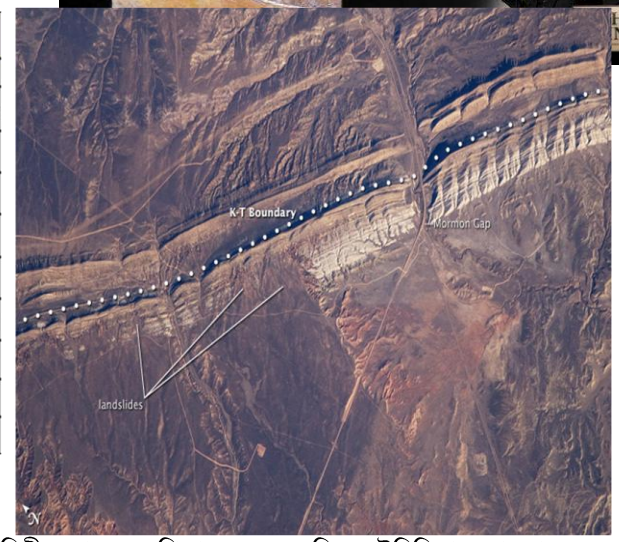

দুই স্তরের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে ইরিডিয়াম আবিষ্কার করেন। ভূত্বকে ইরিডিয়াম খুবই বিরল। গ্রহাণু ও উল্কায় প্রচুর ইরিডিয়াম থাকে। পৃথিবীর প্রায় সব শিলাস্তরে এমন বিপুল ইরিডিয়াম পাওয়া গেল। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন, ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীকে একটি বড় গ্রহাণু আঘাত হেনেছে। কিন্তু কোথায়? ১৯৯০ সালে নিশ্চিত হওয়া গেল তার অবস্থান মেক্সিকোর য়ুকাতান উপকূল। ফলে ভূত্বকে ১১০ মাইল প্রস্থের গর্তের সৃষ্টি হয়। আলভারেজের হিসেব অনুযায়ী গ্রহাণুটি ছিল ৬.২ মাইল চওড়া। এর পতনের ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয় তা এ যাবৎকালের সবচেয়ে শক্তিশালী থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার চেয়ে ২ মিলিয়ন গুণ বেশি। ধুলোতে পৃথিবীর আকাশ কয়েক বছরের জন্য ঢেকে যায়। পরিণামে সালোক-সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে খাদ্য শৃঙ্খল ভেঙ্গে পড়ে। সব মিলিয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রায় পরিবর্তন আসে। সূর্যালোকের অভাবে পৃথিবী শীতল হয়ে পড়ে। শীতল পৃথিবীতে টিকতে পারেনি অতিকায় ডাইনোসরেরা। এদের তাপ ধারণ ক্ষমতা উন্নত ছিল না। ছোট ডাইনোসরের দেহ তুলনামূলকভাবে বেশি তাপ ধরতে পারে। উন্নত তাপ ধারণ ক্ষমতা ছিল ছোট ছোট কিছু লোমশ প্রাণীর। এদের বিকাশ হয় এ সময়ে। তারাই আধুনিক স্ন্যপায়ীদের পূর্বপুরুষ। শিলাস্তরে একে বলা হয় কে-টি লাইন বা সীমা।

এ সময়ে অতিকায় ডাইনোসর বিলুপ্ত হয় এবং স্ন্যপায়ীদের উত্থান শুরু হয়। থেরোপড ডাইনোসর এবং কুমির সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছে। সুতরাং কিছু বিজ্ঞানী মনে করতেন প্যালিওসিন যুগে অতিকায় ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া যাবে। এই প্রথম নিউ মেক্সিকো ও কলোরাডোতে প্যালিওসিন ডাইনোসরের ফসিল পাওয়া

গেল। এ বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় পেলিওন্টোলজিয়া ইলেক্ট্রনিকা পত্রিকায় ২৯ এপ্রিল সংখ্যায়। এটি ২০০৯ সালের একটি বড় গবেষণা।

প্রাণী আচরণবিদ স্যারা মিলসপ বলছেন, পুরুষ বিড়াল বামহাতি হয়। এতদিন পর্যন্ জানা ছিল বামহাতি বা ডানহাতি এ ব্যাপারটা শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চার্লস ডারউইন ১৮৭২ সালে "The Expression of Emotions in Man and Animals" নামে একটি বই লিখেন। বোর্নিও থেকে লন্ডন চিড়িয়াখানায় একটি স্ত্রী ওরাংওটাং আনা হয়েছিল। এর আগে কখনো এপ লন্ডন চিড়িয়াখানায় ছিল না। মানুষের সাথে নগ্ন এই প্রাণীটির মিল সহজেই চোখে পড়ে। হয়ত মেয়ে হবার কারণেই চিড়িয়াখানার কিউরেটর এটিকে পোষাক পরিয়ে সভ্য করেন। নাম দেয়া হয় জেনি। জেনিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ডারউইন বুঝতে পারেন মানুষের আচরণের সাথে তার মিল রয়েছে। ১৮৭২ সালের বইতে ডারউইন বলেন, বিভিন্ন ধরনের প্রাণীতে মানুষের মত বা কাছাকাছি আচরণ লক্ষ্য করা যায়। স্যারা মিলসপের সাম্প্রতিক গবেষণা যেন, ডারউইনের কাজের সম্পূরক। মানুষের মস্তিষ্কে ডান এবং বাম অংশ আছে। গঠন এক হলেও কাজে সামান্য তারতম্য থাকে। ডান হাত কাজের নির্দেশ পায় বাম মস্তিষ্ক থেকে। বাম হাত ঠিক তার উল্টো। এতদিন পর্যন্ জানা ছিল, মস্তিষ্কের এই বিশেষ ব্যাপারটি শুধু মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে। স্যারা মিলসপ এবং তার সহযোগীদের গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে কুকুর থেকে তিমি অনেক প্রাণীর মধ্যেই এই ব্যাপারটা আছে। মানুষের ক্ষেত্রে শতকরা ৯০ জন ডানহাতি। বাকিরা বামহাতি। বিড়ালের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ৫০-৫০। মানুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি লিঙ্গভিত্তিক নয়। কিন্তু বিড়ালের ক্ষেত্রে তা লিঙ্গভিত্তিক। পুরুষ বিড়াল বামহাতি এবং স্ত্রী বিড়াল ডানহাতি।[৮]

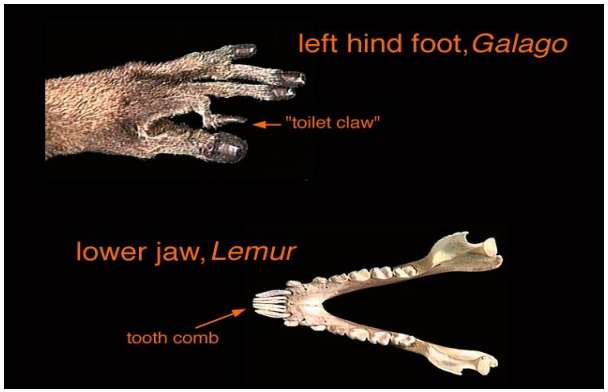

২০০৯ সালের ১৯ মে ডারউইন পরবর্তী সময়ে জৈববিবর্তন তত্ত্বের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটেছে। ডারউইন বলেছিলেন ভবিষ্যতে এমন ফসিল আবিষ্কার হবে যা প্রমাণ করবে মানুষের বিবর্তনের সাথে অন্য প্রাণীদের সম্পর্ক। ডারউইনের জীবদ্দশায় এমন কোন ফসিল আবিষ্কার হয়নি। ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ায় লুসি নামে ৩.২ মিলিয়ন বছরের একটি ফসিল আবিষ্কার হয় যা এপদের সাথে মানুষের সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। নরওয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ ইয়ারন হুরুম ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক হামবুর্গ খনিজ ও ফসিল মেলায় গিয়ে একজন ফসিল বিক্রেতার কাছ থেকে মূল্যবান একটি ফসিল দেখার আমন্ত্রণ পান। দাম ১ মিলিয়ন ইউ এস ডলারের বেশি। হুরুম জানতেন সবচেয়ে মূল্যবান ফসিল মেলায় আসে না। সেগুলো কালোবাজারে বিক্রি হয়। তাই সহজেই রাজি হলেন তিনি। ফসিলটির কয়েকটি ছবি দেখানো হলো। ফসিলটি পূর্ণাঙ্গ। অত্যন্ দক্ষতার সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রায় ২৩ বছর ধরে একজনের ভূগর্ভস্থ বাংকারে লুকিয়ে আছে। অভিজ্ঞতাটি অনেকটা এরকম, ভ্যান গখের অজানা কোন ছবির সামনে আপনি দাড়িয়ে আছেন। ফসিলটির ছবি দেখে দুইরাত ঘুমাতে পারেন নি তিনি। ফসিলটি দাম অত্যন্ বেশি হাঁকা হয়েছে। কিন্তু সম্ভাব্য ক্রেতা হিসেবে আরো দুটি মিউজিয়াম আছে। হুরুমের প্রথম কাজ হল, ক্রেতা ঠিক করা। নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়ামকে রাজি করালেন হুরুম। দাম ঠিক হলে, ফসিলটি পরীক্ষা করার সুযোগ দেয়া হল। নিশ্চিত হতে হবে ফসিলটি যে জাল নয়। চোখে পরীক্ষার পাশাপাশি কয়েকটি এক্স-রে ছবি তোলা হল। নিশ্চিত হওয়া গেল ফসিলটি জাল নয়। অত্যন্ গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে অসলো বিশ্ববিদ্যালয় ফসিলটি কিনে নেয়। তবুও বিষয়টি আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ফসিলটি আদতে পাওয়া গিয়েছিল জার্মানির ফ্র্যাংকফুর্টের মেসেল পিটে। এর আগে আরেকটি মূল্যবান ফসিল আর্কিওপটেরিক্স জার্মানিতে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেটি লন্ডন চলে যায়। সে সময়কার সরকার এ নিয়ে ভীষণ চাপের মুখে পড়েছিল। আবারো এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। মেসেল পিট ছিল মূলত কয়লা খনি। এই কয়লা খনিতে ১৮৭৫ সালে একটি কুমিরের ফসিল পাওয়া যায়। কিন্তু এর গুরুত্ব কেউ বুঝতে চায় নি। ১৯৬২ সালে আলকাতরা ও প্যারাফিনের সহজ বিকল্প আবিষ্কার হওয়ায় এটি কংক্রিট তৈরির কাঁচামালের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৭১ সালে তার অন্য কোন ব্যবহার না পাওয়ায় এটি পরিত্যক্ত হয় এবং কর্তৃপক্ষ এই মেসেল পিটকে শহরের আবর্জনা ফেলার উপযুক্ত স্থান হিসেবে পছন্দ করেন। কিন্তু শখের ফসিল সংগ্রাহকরা মেসেল পিটের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তাদের বিরত রাখার জন্য কর্তৃপক্ষ এলাকাটি ১৯৭৫ সালে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেন। কর্তৃপক্ষ সংযোগ সড়ক তৈরিতে ব্যস্, ফসিল সংগ্রাহকরা প্রাণপনে ফসিল সংগ্রহে লিপ্ত। কিছু মিউজিয়াম এ সময় ফসিলগুলোর গুরুত্ব বুঝতে পারে। আশির দশকে কর্তৃপক্ষ এই আদর্শ স্থানটি বাতিল করেন। ১৯৯৫ সালে ইউনেস্কো মেসেল পিটকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা দেয়। ১৯৯৭ সালে কর্তৃপক্ষ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে জানান, গুরুত্বপূর্ণ কোন ফসিল জমা দিলে কোন অভিযোগ দায়ের করা হবে না। এভাবে মেসেল পিটের ফসিল কালোবাজারের পণ্যে পরিনত হয়।

হুরুম কালোবাজার থেকেই ফসিলটি সংগ্রহ করেন। প্রাণীটি স্ত্রী, যখন মারা যায় তার বয়স ছিল ৯ বা ১০ মাস। ইয়ারন তার পাঁচ বছরের মেয়ের নামে ফসিলটির নাম দেন ইডা। ফসিলটির বয়স ৪৭ মিলিয়ন বছর। সেসময় ভূতাত্ত্বিক যুগ মধ্য ইওসিন। এর প্রায় ১৮ মিলিয়ন বছর আগে, ইওসিন শুরু হবার আগেই অতিকায় ডাইনোসরেরা বিলুপ্ত হয়েছে। ডাইনোসর বিলুপ্তির সাথে ছোট ছোট স্ন্যপায়ীদের বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। এর আগে এরা থাকত মূলত গর্তে এবং রাতে শিকার করতো। পৃথিবী ছিল সরীসৃপদের রাজত্ব। মধ্য ইওসিনে এসে প্রথম বড় আকৃতির স্ন্যপায়ী দেখা যায়। ১৫০ মিলিয়ন বছর আগে আর্কিওপটেরিক্সের মত ছোট ছোট সরীসৃপ পাখি হয়ে আকাশে উড়তে শুরু করে। ৪৭ মিলিয়ন বছর আগের পৃথিবী পাখিময়। ৫০ মিলিয়ন বছর আগে আধুনিক পাখির উদ্ভব। স্ন

ন্যপায়ীদের একটি শাখা প্রাইমেট তখন বিকাশের আদি পর্যায়ে। প্রাইমেট প্রোসিমিয়ান এবং সিমিয়ান বা এনথ্রোপয়েড এই দুই দলে বিভক্ত। মানুষসহ বানরকুল সিমিয়ান। লিমার, টারসিয়ার এরা হচ্ছে প্রোসিমিয়ান। সেসময় প্রাইমেট শাখায় প্রোসিমিয়ান ও সিমিয়ান প্রশাখা আলাদা হয়ে যাচ্ছিল। ৪৭ মিলিয়ন বছর আগের এই ফসিল ইডা প্রোসিমিয়ান এবং সিমিয়ান এই দুই দলের অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্য বহন করে। লুসি আবিষ্কারের চেয়ে এই আবিষ্কার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ৪৭ মিলিয়ন বছর আগের প্রাইমেট বিবর্তন সম্পর্কে ইডা অনেক তথ্য বহন করছে। ফসিলটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। অবিশ্বাস্য অনপুঙ্খ পরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে ইডা। সমস্ শরীর অক্ষত। এমনকি তার পাকস্থলিতে মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ খাদ্য পর্যন্ পরীক্ষা করা গিয়েছে। ইডার বৈজ্ঞানিক নাম, *Darwinius masillae*। ডারউইনের নামেই ফসিলটির নাম (এ পর্যন্ ১২০টির বেশি প্রজাতির নাম ডারউইনের নামে রাখা হয়েছে)। নামের শেষ অংশ *masillae* এসেছে মেসেল পিট থেকে। ইডা শুধু নতুন একটি প্রজাতি নয়। ইডা একটি অন্তর্বর্তী প্রাণী। হুরুম বর্ণনায় ইডা হল 'প্রাইমেট বিবর্তন ইতিহাসের আর্কিওপটেরিক্স'। হুরুম মনে করেন আগামী ১০০ বছর বিবর্তনের ইতিহাসের সমস্ পাঠ্যপুস্কে ইডার নাম এবং ছবি থাকবে। ২০০৯ সালের ১৯ মে নিউইয়র্কের আমেরিকান মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্টরিতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ফসিলের ঘোষণা দেন ইয়ারন হুরুম। একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল দু বছর গবেষণা করার পর এই সাংবাদিক সম্মেলন। ২০০৯ সাল ডারউইনের জন্মদ্বিশতবার্ষিকীর বছর। হুরুম ইচ্ছে করেই এ বছরটিকে বেছে নিয়েছেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের ঘোষণার সাথে ডারউইনের জন্মদ্বিশতবার্ষিকীকে যুক্ত করে দেয়া। ইডা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? কারন ইডা যতটুকু লিমার (Lemur) বা প্রোসিমিয়ান তার চেয়ে বেশি এপ (Ape)।

ইডা কেন গুরুত্বপূর্ণ বুঝতে হলে আধুনিক লিমারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু ধারণা প্রয়োজন। আধুনিক লিমার মানে বর্তমানে যেসব লিমার আমরা দেখি। লিমার বলতেই আমাদের মাদাগাস্কার দ্বীপের কথা মনে পড়ে। ভারতীয় মহাসাগরে আফ্রিকার মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৩০০ মাইল পূর্বে মাদাগাস্কার দ্বীপ। ২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ৯৯ প্রজাতির প্রাইমেটের সাধারণ নাম লিমার। এদের বাস মাদাগাস্কার এবং কমোরোজ দ্বীপে। প্রায় ৫০ মিলিয়ন বছর আগে যখন মাদাগাস্কার আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের কাছাকাছি ছিল, তখন থেকে লিমার এখানে বাস করতে থাকে। মূল ভূখণ্ডে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলেও এখানে বিচ্ছিন্নতা তাদের টিকতে সাহায্য করে। ঠিক যেমনটা হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায় আদি স্ন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে। বর্তমানে মাদাগাস্কারে যেসব লিমার পাওয়া যায় তাদের বলা হচ্ছে আধুনিক লিমার। আধুনিক লিমারের বৈশিষ্ট্য কী? লিমার প্রোসিমিয়ান। এনথ্রোপোয়েড এপ বা সিমিয়ানদের তুলনায় মস্কিের আকার দেহের তুলনায় ছোট। এরা চার পায়ে হাঁটে। ব্যতিক্রম আছে। যেমন শিফাক দু পায়ে হাঁটে। অনেকটা ক্যাঙ্গারুর মত। তাই এদের পিছনের পা সামনের পায়ের তুলনায় বড়। উচ্চ শ্রেণীর প্রাইমেট হাত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হাতে নখরের পরিবর্তে নখ থাকে। যেমন মানুষের হাতে পায়ে নখ থাকে। লিমারের পায়ে দ্বিতীয় আঙ্গুলে নখের পরিবর্তে নখর থাকে। এই নখরকে বলা যায় সজ্জা (ইংরেজিতে টয়লেট বা গ্রুমিং) নখর। এই নখরের কাজ হচ্ছে, চুলকানো বা লোম পরিস্কার রাখা। সিমিয়ান পায়ে এই নখর অনুপস্থিত। মানুষ হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে অন্য সব আঙ্গুলের মাথা স্পর্শ করতে পারে। এ ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকলে হাত বা পা দিয়ে সূক্ষ কাজ করা যায়। যেমন মানুষ হাত দিয়ে সেলাই করতে পারে। মানুষ হাত দিয়ে গাছের ডাল ধরতে পারে। অন্যান্য প্রাইমেটরাও পারে। কিন্তু পা দিয়ে মানুষ ডাল ধরতে পারে না। মানুষের পা অন্যান্য প্রাইমেট থেকে আলাদা। মানুষের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল অন্যান্য আঙ্গুলের সমান তলে চলে এসেছে। তার কাজ দেহের ভার বহন করা। কিন্তু অন্যান্য প্রাইমেটের পায়ের বুড়ো আঙ্গুল হাতের মতই নিচে এবং দূরে অবস্থিত। তাই পা দিয়ে ডাল ধরতে পারে এরা। লিমারের হাত ও পা ডাল ধরার উপযোগী। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর প্রাইমেটের মত এতটা বিকশিত হয় নি। এমনকি লিমার লেজ দিয়ে ডাল ধরতে পারে না। অনেক প্রাইমেট যেমন ক্যাপুচিন বানর লেজ দিয়ে ডাল আঁকড়ে ধরতে পারে। লিমারদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। প্রাইমেট কথাটি মনে হলেই চোখে ভাসে, দুটো চোখ খুব কাছাকাছি। চোখের এই অবস্থান ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি করতে পারে। ফলে শিকারি প্রাণীদের মতো প্রাইমেটের দৃষ্টিশক্তি খুবই তীক্ষ্ণ। তাই এদের ঘ্রাণশক্তি এতটা প্রবল হয় না। লিমারের চোখ সিমিয়ান চোখের তুলনায় দেহের মধ্য

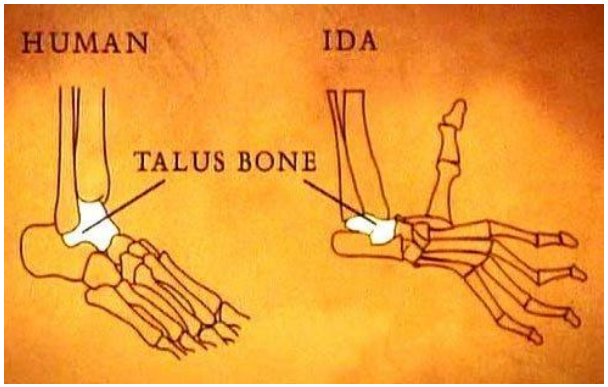

রেখা থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। এজন্যই এদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। এদের নাক ভেজা থাকে এবং চোয়াল প্রলম্বিত। উচ্চ শ্রেণীর প্রাইমেট চোয়াল অতটা প্রলম্বিত হয় না। মানুষের ক্ষেত্রে চোয়াল এবং কপাল প্রায় একই তলে চলে এসেছে। লিমারের নিচের চোয়ালে

সামনের দাঁতগুলো চিরুনির দাঁতের মত। এদের কাজ চিরুনি মতই। লিমার লোম পরিস্কার রাখার জন্য এই চিরুনি দাঁত ব্যবহার করে। আধুনিক লিমারে এসব বৈশিষ্ট্য থাকে।

ইডার ফসিলে চিরুনি দাঁত বা গ্রুমিং নখর ছিল না। ইডা তাই আধুনিক লিমার নয়। বরং ইডার কিছু বৈশিষ্ট্য এপদের মত। মস্কিষ্ক তুলনামূলকভাবে বড়। চোখ এপদের মত অনেক কাছাকাছি। ইডার জগত এপদের মত ত্রিমাত্রিক। হাত দুটো ভাঁজ করতে পারত। এমন হাত দিয়ে কিছু যেমন ফল বা বীজ দুহাতে ধরা সম্ভব। হাত এবং পায়ের বুড়ো আঙ্গুল এমন যে এপদের মত ডাল সহজে ধরতে পারে। পায়ের তুলনায় হাত অনেক ছোট। যেসব প্রাইমেট পিছনের পায়ে ভর দিয়ে চলে তাদের এমন থাকে। পায়ের ট্যালাস নামের হাড়টির গঠন এপদের মতো যারা সোজা হয়ে চলে।

মুখ বা চোয়াল ছোট, লিমারের মত এতটা প্রলম্বিত নয়। ফলে ইডা যতটুকু লিমার তার চেয়ে বেশি এপ। ইডা থেকে সরাসরি মানুষ উদ্ভূত হয়নি। কিন্তু ইডা এপ বিবর্তনের সংযোগসূত্র। এ কারণে ইডা আসলে মানুষের বিবর্তনের আদি ইতিহাস জানান দিচ্ছে আমাদের। ইডা নিয়ে পাল্টা লেখালেখি কয়েকমাস পরেই শুরু হয়। দুটো লেখা গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছাপা হয়েছে নেচার পত্রিকায় অন্যটি জার্নাল অফ হিউম্যান ইভোলিউশন। লেখা দুটোর বক্তব্য কাছাকাছি। মানুষের বিবর্তনের সাথে ইডার সম্পর্ক নেই। প্রাইমেট শাখায় ইডার অবস্থান এপদের সাথে নয়। বর্তমানে (মার্চ ২০১০ থেকে) ড. হুরুম এবং তার দল জার্মানির ফ্র্যাংকফুর্টের একটি মিউজিয়ামে ইডার সিটি স্ক্যান করে লেখা দুটোর যুক্তি খণ্ডনের জন্য নতুন করে গবেষণা করছেন। তবে শুরুতেই হুরুম বলে দিয়েছেন, অভিযোগ ভিত্তিহীন। তবুও আবার গবেষণা শুরু হয়েছে। এভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে।

বিবর্তন বিষয়টি শুধু বিজ্ঞানের এমন কখনোই ছিল না। মানুষ কী এবং কোথায় চলেছে এসব প্রশ্ন তো চিরন্ন। জ্ঞানের অনেক শাখাই বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে। ২০০৯ সাল, চার্লস ডারউইনের জন্মদ্বিশতবার্ষিকীর বছর তাই বিভিন্নভাবে পালিত হয়েছে। ডারউইন জীবন এবং কাজ নিয়ে অত্যন্ন গুরুত্বপূর্ণ দুটো সিনেমা মুক্তি পেয়েছে গত বছর। প্রথমটি "Charles Darwin and the Tree of Life" বিবিসির বিবিসি ওয়ান চ্যানেল থেকে ০১ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে প্রথম প্রচারিত হয়। লেখক এবং উপস্থাপক ছিলেন ডেভিড এটেনবরো। ৬.৩৪ মিলিয়ন দর্শক অনুষ্ঠানটি দেখেছে। মার্চ মাসে ডিভিডিতে ৬০ মিনিটের তথ্যচিত্র হিসেবে মুক্তি পায়। সে বছরই সেরা তথ্যচিত্র হিসেবে গ্রিয়ারসন পদক লাভ করে

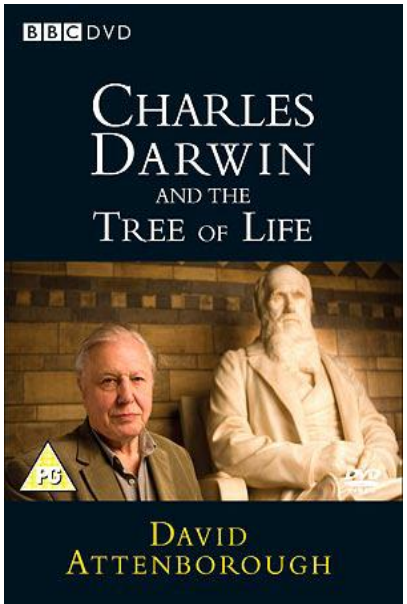

ছবিটি। ডেভিড এটেনবরো সারা জীবন প্রকৃতি, জীবন ও বিবর্তন নিয়ে কাজ করেছেন। তার সমস্ন জীবনের অর্জনের ছাপ রয়েছে ছবিটিতে। ৬০ মিনিটের তথ্যচিত্রে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য দিয়ে শুরু করেছেন করেছেন তিনি। পৃথিবীর এই বৈচিত্র্য কত ব্যাপক তা প্রথমেই দেখিয়ে প্রশ্ন করেছেন এর কারণ কী? পরক্ষণেই বলেছেন ২০০ বছর আগে চার্লস ডারউইন নামে একজন জন্ম নিয়েছিলেন যিনি পৃথিবীকে দেখার আমাদের ভঙ্গিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। ডারউইনের জীবনী তিনি শুরু করেছেন ১৮৩১ সাল থেকে যে বছর বিগল জাহাজে চড়ে পাঁচ বছর অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি। এটেনবরো বিশেষভাবে গ্যালাপাগোস দ্বীপের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। দেশে ফিরে ডারউইন তার সংগ্রহ করা নমুনা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়ে দেন। স্ন্যপায়ীদের নমুনা পাঠান রিচার্ড ওয়েনের কাছে। পরবর্তীতে ওয়েন লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। ডারউইনের সংগ্রহ করা নমুনা আজো সেখানে আছে। সেখান থেকে কিছু এটেনবরো তার তথ্যচিত্রে দেখান। এরপর ধাপে ধাপে তিনি দেখান কীভাবে ডারউইন সিদ্ধান্নে পৌঁছেন প্রজাতি পরিবর্তিত হয়। পরের প্রশ্নটি খুব যৌক্তিক, তা হল পরিবর্তন কীভাবে ঘটে। বছরের পর বছর গবেষণা করতে থাকেন তিনি এই বিষয়টি বোঝার জন্য। কৃত্রিম প্রজনন ঘটিয়ে খামারে ঘোড়া বা গরুতে উন্নত জাতের জন্ম দেয়া হয়। একই ঘটনা কবুতর প্রজননের ক্ষেত্রে ঘটানো হয়। এভাবে মানুষ গৃহপালিত জীবে আকাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। এভাবে নতুন নতুন প্রকার বা উপপ্রজাতির জন্ম হয়। ডারউইন এর নাম দেন কৃত্রিম নির্বাচন। প্রকৃতিতে কোটি কোটি বছর ধরে একই ঘটনা ঘটছে। যেসব বৈশিষ্ট্য পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে তা জীবকে টিকে থাকতে সাহায্য করে। এভাবে প্রকৃতি যেন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে বেছে নিচ্ছে। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ক্রমান্বয়ে যোগ হতে হতে এক সময় নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। ডারউইন তার নাম দেন 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'। ডারউইন বিবর্তনের সমস্যার তাত্ত্বিক সমাধান বের করলেও কখনো তা প্রকাশ করবেন কিনা তা নিয়ে নিজে কোন সংশয়ে ছিলেন না। কিন্তু তিনি জানতেন তার লেখা প্রকাশিত হলে তীব্র সমালোচনা হবে। ১৮৪৪ সালের ৫ জুলাই স্ত্রী এমাকে চিঠিতে লিখেন তার হঠাৎ মৃত্যু হলে প্রবন্ধটি ছাপতে। প্রবন্ধটি ২৪০ পৃষ্ঠার। এরপর আরো ১৪ বছর কেটে যায় প্রবন্ধটি ছাপেননি ডারউইন। ১৮৫৮ সালের জুন মাসে ইন্দোনেশিয়া থেকে আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস একটি প্রবন্ধ পাঠান ডারউইনকে। বিষয় বিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব। স্বতন্ত্রভাবে হলেও দুজনে একই সিদ্ধান্নে পৌঁছেছেন। লিনিয়ান সোসাইটির সদস্যদের হস্নক্ষেপে ডারউইন নিজে একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে দেন। ১৮৫৮ সালের ১ম জুলাই লিনিয়ান সোসাইটির সভায় প্রবন্ধ দুটো পাঠ করা হয়। দুজনের কেউই উপস্থিত ছিলেন না সেদিন। উপস্থিত প্রায় ৩০ মানুষ কেউ কোন প্রশ্ন করেন নি। দ্রুত এটেনবরো চলে যান পরের বছর প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থ প্রকাশে। প্রকাশক জন মারে। মারে নামি প্রকাশক। জেন অস্টেনের লেখা ছেপেছেন তিনি। প্রকাশনা সংস্থাটির অফিস পিকাডিলি (লন্ডন)। সে অফিসে প্রথম সংস্করণের কপি রাখা আছে। এটেনবরো তার নিজের সংগ্রহকৃত ষষ্ঠ সংস্করণ দেখান। কিশোর বয়সে এক শিলিং দিয়ে বইটি কিনেছিলেন তিনি। বইটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে তিনি প্রকাশনা পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় চলে যান। পৃথিবীর সমস্ন সভ্যতায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। বেশি প্রতিক্রিয়া হয় লন্ডনে। পত্রিকাগুলো ব্যঙ্গচিত্রে ভরে যায়। ডারউইনকে বানর হিসেবে আঁকা হয়।

অক্সফোর্ডের বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স এবং টি এইচ হাক্সলির মধ্যে একটি বিতর্ক হয়। বিশপের বিভিন্ন উক্তি তুলে দেন এটেনবরো। দীর্ঘ একটি বাক্য শুরু হয় মিঃ ডারউইন সম্বোধন দিয়ে এবং শেষ হয় "is no small evil" দিয়ে। এরপর এটেনবরো চলে যান প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিতর্কে। কীভাবে বিতর্কের সমাধান হয় তা ছুঁয়ে যান তিনি। প্রসঙ্গক্রমে আসেন রিচার্ড ওয়েন। আসে আর্কিওপটেরিক্স। এটেনবরো চলে যান জার্মানির ব্যাভারিয়াতে। দেখান চুনা পাথরের স্তরে স্তরে কিভাবে ফসিল লুকিয়ে থাকে। বলেন আর্কিওপটেরিক্স কীভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে প্রমাণ করে। আর্কিওপটেরিক্সের কয়েকটি ফসিল দেখান তিনি। এভাবে যুক্তি খণ্ডনের পর তিনি সংক্ষেপে দেখান কীভাবে জীবন সরল থেকে জটিল হয়ে বর্তমানের চেহারা নিয়েছে। তথ্যের পর তথ্য এবং বিশ্লেষণ মাত্র ৬০ মিনিটে কীভাবে দেখানো সম্ভব এটেনবরোর তথ্যচিত্রটি তার একটি উদাহরণ।

আরেকটি সিনেমা তৈরি হয়েছে ২০০৯ সালে। নাম Creation। পরিচালক জেরেমি টমাস। ২৫ সেপ্টেম্বর ডারউইনের দেশ যুক্তরাজ্যে মুক্তি পায় সিনেমাটি। পোস্টারে লিখে দেয়া হয়েছে The ture story of Charles Darwin। সিনেমাটির যুক্তরাজ্যের রিলিজ করা পোস্টারে ডারউইন এবং জেনির (ওরাংওটাং) ছবি দেয়া হয়েছে। দুজনে তর্জনি দিয়ে একে অন্যকে স্পর্শ করেছে। হতে পারে মানুষ এবং অন্য প্রাণীর মিতালির প্রতীক এটি। হয়ত মিকেলাঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদে 'এডামের জন্ম'-এর কথাও মনে পড়তে পারে। সিনেমার নাম ক্রিয়েশন। সিনেমাটির শুরুতে পর্দায় দুটো বাক্য ভেসে ওঠে, "Charles Darwin's 'Origin of Species', first published in 1859, has been called the biggest single idea in the history of thought. This is the story of how it came to be written." পরের দৃশ্যে একটি মানবশিশুর ভ্রূণ সৃষ্টি হচ্ছে। হাতের সৃষ্টি হচ্ছে ধীরে ধীরে। সাদা পুতির মত একটি বস্তু এগিয়ে তর্জনী স্পর্শ করল। স্পর্শ করতেই তা প্রলম্বিত হয়ে আয়তাকার হয়ে Creation শব্দে পরিণত হল। শব্দটি মুহূর্তেই পবিত্র আলোতে পরিণত হল। সেই আলো কেন্দ্রীভূত হয়ে একটি মানুষে পরিণত হল সিনেমাতে যার নাম ডারউইন। ছবির শুরুতেই একটি শিশুকে দেখি। তার নাম অ্যানি। মেয়েটি ডারউইনের কন্যা। দশ বছর বয়সে তার করুণ মৃত্যু ছবিটির সব কিছুতে ছাপিয়ে ওঠে। ডারউইনের সব কিছুর অর্থ এবং কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই মেয়েটির অকালমৃত্যু। র‍্যানডল কেইন (১৯৪৮)-এর গবেষণার ফলে এসব জানা গিয়েছে। ডারউইনের নাতির নাতি র‍্যানডল কেইন একটি বাক্সে কিছু নতুন নথি পেয়েছেন। তার ফল হচ্ছে ২০০১ সালের বই 'অ্যানির বাক্স'। এই বইকে ভিত্তি করে নাটকীয় চলচ্চিত্রটি নির্মিত। কেইন নতুন ভঙ্গিতে ডারউইনকে উপস্থাপন করেন। সেটাই হচ্ছে, The ture story of Charles Darwin। এটেনবরো যখন ডারউইনের জীবনী শুরু করেন বিগল অভিযান দিয়ে, ক্রিয়েশন শুরু হয় অ্যানির সাথে আলাপচারিতা দিয়ে। ছবির শুরুতেই দেখি স্নেহবৎসল এক পিতাকে। দেখি দুর্বল একজন স্বামীকে। অসুস্থ একজন মানুষকে দেখি। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতাকে ছাপিয়ে উঠে মানুষটির মানসিক অক্ষমতা। সিদ্ধান্ত নেবার মত ক্ষমতা সে মানুষটির নেই। সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আছেন তার স্ত্রী এমা। গোটা ছবিটিতে স্বামী-স্ত্রীর মুখে হাসি বিরল। সমুদ্র তীরে একটি দৃশ্যে দুজনের মুখে হাসি দেখা যায়। পরে এই ছবিটিই সিনেমার পোস্টারে পরিণত হয়। পুরো ছবিতে এমার মুখের মাংসপেশিগুলোকে শিথিল অবস্থায় দেখি না। এমার মুখাবয়ব সবসময় কঠিন। কখনো তা তিরস্কারে পূর্ণ। সবসময়ই ভীত এবং আতংকিত ডারউইনের প্রতি সহানুভূতি দেখা যায় না। অভিভাবকের মত সবসময় শাসনে ব্যস্ত দেখি এমাকে। পল বিটেনি (ডারউইন) ও জেনিফার কনেলি (এমা) ব্যক্তিগত জীবনে স্বামী-স্ত্রী। এজন্যই হয়ত পুরো চলচ্চিত্রে দুজনের অভিনয়ে রোমান্স বা ভালবাসা খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুরো সিনেমাতে দুজনের সম্পর্ক সবসময় টান টান। চলচ্চিত্রকার হয়ত এটাই দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু দুজনেরই এই চরিত্রে উতরে যাবার কথা ছিল। রন হওয়ার্ড-এর 'এ বিউটিফুল মাইন্ড' (২০০১) ছবিতে প্যারানয়ড সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত গণিতবিদ জন ফর্বিস ন্যাশ এর মমতাময়ী স্ত্রীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন জেনিফার কনেলি। সেই ছবিতেও ছিলেন পল বিটেনি। ন্যাশ এর রুমমেট চার্লস হেরমান-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন পল বিটেনি। ম্যাস্টার এন্ড দ্যা কমান্ডার (২০০৩) ছবিতে ডা. স্টিফেন ম্যাচুরিন চরিত্রে অভিনয় করেছেন পল বিটেনি। ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাস বা সিনেমাটি তৈরি হলেও এ চরিত্রটি পুরোপুরি কাল্পনিক। উপন্যাসে ঘটনার শুরু ১৮০০ সালে। সে সময় ডারউইনের জন্ম হয়নি। কিন্তু স্টিফেন ম্যাচুরিন চরিত্রটিতে ডারউইনের ছায়া ছিল। এইচ এম এস সোফি জাহাজের ক্যাপ্টেন জ্যাক অব্রে ম্যাচুরিনের বন্ধু। কিন্তু সমস্ত সিনেমাতে দুজনের ব্যক্তিত্বের সংঘাত দেখা যায়। ম্যাচুরিন গ্যালাপাগোস দ্বীপে যেতে চান। ফ্রান্স ব্রিটেনের নেপোলিওনিক যুদ্ধের সময় নেভির কমান্ডার ক্যাপ্টেন জ্যাক অব্রে সমুদ্রে জিততে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তার মনে গভীর সংকল্প জাগিয়ে দিয়েছেন এডমিরাল লর্ড নেলসন। অব্রে শেষ পর্যন্ত গ্যালাপাগোস যেতে রাজি হন। স্টিফেন ম্যাচুরিন এর নোটবুক ভর্তি বিভিন্ন প্রাণীর স্কেচ। গ্যালাপাগোসের জীববৈচিত্র্য দেখে আনন্দে আপ্লুত তিনি। কিন্তু শত্রু জাহাজের উপস্থিতির কারণে তার সংগ্রহ করা নমুনা গ্যালাপাগোসেই ফেলে যেতে বাধ্য হন ম্যাচুরিন। তাই আবারো গ্যালাপাগোসে ফিরতে চান ম্যাচুরিন। জ্যাক অব্রের ইস্পাত কঠিন চরিত্রের সাথে এ বিষয়ে ম্যাচুরিন দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। অব্রে আবারো গ্যালাপাগোসে ফিরবেন এ কথা দিতে পারেন নি। যুদ্ধের গতি তাদের গ্যালাপাগোসে ফিরে যাবার সুযোগ দেয় নি। ডারউইনের ছায়ায় তৈরি এ চরিত্রে ভীষণ দৃঢ়তা দেখা যায়। পল বিটেনি চমৎকারভাবে তা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। কিন্তু ক্রিয়েশন ছবিতে পল বিটেনি চমৎকারভাবেই ডারউইনের অসহায়ত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। অসহায় ডারউইনকে সবসময় দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন এমা। দুষ্টু লোকেরা চারদিকে মানুষটিকে কুপরামর্শ দিচ্ছে। লন্ডন থেকে তারা ডাউন হাউজে চলে আসে। ১৭ অক্টোবর ১৮৫৮ সালে ডাউন হাউজে আসেন জোসেফ ডালটন হুকার। সাথে বিনা নোটিশে টি এইচ হাক্সলি। হাক্সলির সাথে এমার সেদিন প্রথম পরিচয়। তবুও এমার চোখে সন্দেহ। হাক্সলির আচরণও চোরের মত। কথা বলার ভঙ্গি ভাঁড়ের মত। ডারউইনকে নিয়ে গোপনে কথা বলার জন্য বাড়ির বাইরে চলে যান। জানালায় দেখি এমাকে। পর্দার পিছনে লুকানো এমার চোখে আশংকা। বার বার চোরের মত পিছনে ফিরে তাকান হাক্সলি। সাথে আছে হুকার। হাক্সলি ডারউইনকে ভর্ৎসনা করেন বইটি লেখা হয় নি বলে। তিনি বলেন, "You've killed God, Sir. You have killed God."। অথচ বইটি এখনো লেখা হয়নি। তবুও এসময় হাক্সলির মুখে প্রশান্তির ছাপ দেখা যায়। ডারউইনের চোখেমুখে প্রচণ্ড ভীতি। হুকার কিছুটা হতভম্ব।

তিনি একা হাটতে শুরু করেন। ডারউইন তাকে অনুসরণ করেন। তারপরে কথোপকথন এমন,

ডারউইন, "You talk as if we're at war."
হাক্সলি, "Yes, science is at war with religion and when we win we finally be rid of those dammed archbishops, and their threats of eternal punishments."

এই যুদ্ধের হাতিয়ার হবে ডারউইনের বইটি। ডারউইনের ভীতি আরো বেড়ে যায়। আর হাঁটতে না পেরে বেঞ্চে বসে পড়েন ডারউইন। এ সময় হুকারও বিচলিত হয়ে পড়েন। ডারউইন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু হাক্সলি অবিচলিত। বিদায়ের সময় এমা শেষ চেষ্টা হিসেবে হুকারকে অনুরোধ করেন, "I implore you please do not push him"। দুজনের মধ্যে হুকার মন্দের ভালো। ঘোড়ার গাড়িতে অপেক্ষারত দুষ্টু হাক্সলি সবই বুঝতে পারেন। হুকার কোচে উঠতেই প্রশ্ন করেন, "এমা কী বলল?" বিদায়ের পরের দৃশ্যে ডারউইনকে বমি করতে দেখি। মানসিক উত্তেজনা শারীরিক অসুস্থতায় প্রকাশ পায়। কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ হাক্সলির বল প্রয়োগে কাজ হয়। ডারউইন বইটি শেষ করবেন বলে ঠিক করেন। স্ত্রীর সাথে ঘুমানোর আগে ডারউইন তার সিদ্ধান্ জানান। ডারউইন নিজেকে বিজ্ঞানী বলে অভিহিত করেন। এমা তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। এই বই লিখলে স্বর্গে দুজন একসাথে থাকতে পারবে কিনা এটাই তার চিন্া। ডারউইন নিজেও বলেন, তিনি এ ব্যাপারে চিন্তিত। আবার পরমুহূর্তেই নিজেকে ক্লীব মৌমাছির (neuter bee) সাথে তুলনা করে নিজেকে বিজ্ঞানী বলে অভিহিত করেন ডারউইন। শেষে নিরুপায় এমা বলেন, "I think you are at war with God, Charles. You both know it is a battle you cannot win." এখানে তোমরা দুজন মানে ডারউইন এবং হাক্সলি। দুজনে বিছানায় বিপরীত দিকে মুখ করে শুয়ে পড়েন। এ ভঙ্গিটি প্রতীকী। সিনেমাতে আরো একবার দুজনের অন্রঙ্গ মিলনের দৃশ্যের পর বিপরীতমুখী হয়ে ঘুমাতে দেখা যায় ডারউইন ও এমাকে। সম্ভবত দুজনের মনোজগতের পার্থক্যের প্রতীক হিসেবে এটা দেখানো হয়।

অক্টোবর মাসে ডারউইন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বললেও সিনেমাতে দেখি ১৮৫৮ সালের পূর্বের দৃশ্যে ধর্ম প্রশ্নে ডারউইনের ভীষণ অসহিষ্ণুতা। সবাই যখন চার্চে ধর্ম সঙ্গীত গাইছে, ডারউইন নিশ্চুপ। রেভারেন্ড ইনেস প্রার্থনার সময় ডারউইনকে ইঙ্গিত করে তার পাপমোচনের জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করেন। এরপর ইনেস বাইবেল থেকে পড়বেন। আজ পড়া হবে, সৃষ্টির পর্ব জেনেসিস প্রথম অধ্যায় ভার্স ২৬-৩০। এ সময় ডারউইনকে অসহিষ্ণুভাবে চার্চ ত্যাগ করতে দেখা যায়। এমা তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু ইনেসকে এই পরিবারের বন্ধু হিসেবে সিনেমাতে শুরুতে দেখানো হয়। ইনেস ডারউইনের শুভাকাঙ্ক্ষী। ডারউইনের প্রতি তার সহানুভূতি। ইন্দোনেশিয়ার স্পাইস দ্বীপ থেকে যখন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের চিঠি যখন জুন মাসে পৌঁছায় ডারউইন দেখলেন তার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব ২০ পৃষ্টায় লিখে পাঠানো হয়েছে। ওয়ালেস ম্যালেরিয়ায় আক্রান্। ওয়ালেসের ধারণা তিনি বাঁচবেন না। তাই ডারউইনকে অনুরোধ করেছেন, প্রবন্ধটি ছাপানোর ব্যবস্থা করতে। ডারউইনের এত বছরের গবেষণার কৃতিত্ব অন্যের হাতে চলে যাচ্ছে। ডারউইন উন্মত্ত আচরণ শুরু করেন। জিনিসপত্র ভাঙতে থাকেন। কৃত্রিম নির্বাচন পরীক্ষার কবুতরগুলোর খাঁচার দরজা খুলে দেন। তারপর জ্ঞান হারিয়ে মাঠে পড়ে যান। এ সময় ইনেসকে দেখি ডারউইনকে স্বান্না দিতে। ডারউইন বাগানে বেঞ্চে বসে আসেন। একটু দূরে এমা। ইনেস জানান, এমার অনুরোধে তিনি এসেছেন। ইনেস বলেন অনেক সময় ঈশ্বর রহস্যময় পন্থায় কাজ করেন। ডারউইন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। ঈশ্বর বিষয়ে তিনি ইনেসের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। ইনেস খুব আঘাত পান। এতটা আঘাত পান যে এ ঘটনাকে তিনি দুজনের সম্পর্কের ইতি হিসেবে উল্লেখ করেন ইনেস। "I always valued our friendship. Untill now, I regard you as one of those rare mortals with whom one could disagree and feel no shade of animosity. Sadly, that feeling is no longer reciprocated." ধর্ম প্রশ্নে ডারউইনের অসহিষ্ণুতা এসে ঠেকে ধর্মের মানুষদের প্রতি অসহিষ্ণুতায়।

অ্যানির অসুস্থতা অংশটি বিশদভাবে দেখানো হয়। অ্যানির মৃত্যু হয় ১৮৫১ সালের ২৩ এপ্রিল। অ্যানির মৃত্যুর আগে ডারউইনকে চার্চে হাটু গেড়ে প্রার্থনা করতে দেখি। ডারউইন বলেন, "Sir, I kneel before You in all humility. If it is within Your power, God, to save her… then I will believe in You for the rest of my days. Take me, if you must take someone, but not her... Amen." প্রিয় অ্যানির মৃত্যুতে ডারউইন ভেঙ্গে পড়েন। ডারউইনের হ্যালুসিনেশন শুরু হয়। সবসময় অ্যানিকে দেখতে থাকেন তিনি। অ্যানির সাথে তার কথোপকথন চলতে থাকে। ধর্মীয় বিশ্বাস হারান তিনি। ম্যালভার্ন শহরের চিকিৎসকের কাছে ডারউইনের অসুস্থতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তার বিশ্বাসের প্রশ্নটি। তাদের সংলাপগুলো এমন :
"Do you have faith, Mr Darwin?"
"what?"
"You say you take no comfort from religion, but do you have faith?" উত্তর না দিয়ে ডারউইন বেরিয়ে আসেন।

পরিবারের অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন ডারউইন। ডারউইনের কন্যা ইটিকে বলতে দেখি, "I think when Annie died, he stopped loving us." পরিবার বিচ্ছিন্ন ডারউইনের সাথে এমার সংকট তুঙ্গে উঠে। প্রসঙ্গ অ্যানি। এমা, "She is more real to you than we are. ...She is dead, Charles."
ডারউইন, "I know she's dead."

এভাবে তর্কাতর্কির এক পর্যায়ে এমা বলেন, "Why can you not leave our poor girl in her grave."।
সংলাপের উত্তাপ চরমে গিয়ে ওঠে। এমা, "Get away from me."
শেষ পর্যন্ এমাকে বলতে দেখি, "You've torn everything apart! "

ডারউইন, "How? How? How? "
এমা, "With your cruel theories!"
এমা দরজা বন্ধ করে একদিকে। অন্যদিকে ডারউইন দরজায় ধাক্কাধাক্কি করছেন।
এমা, "I have hated you. I have hated myself."

এক সময় সব উত্তেজনা প্রশমিত হয়। এমা ডারউইনকে শান্ত করতে সমর্থ হন। দেখি ডারউইন আবার লেখা শুরু করেছেন। পরের বছর বইটি লেখা শেষ করতে পারেন। প্রজাতির উৎপত্তি লেখা হলে ছাপা হবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেবার ভার তিনি দেন প্রিয় অভিভাবক এমাকে। এমা সিদ্ধান্ত দেন, বইটি ছাপানোর উপযুক্ত (ধর্মীয় কারণে) না হলে পুঁড়িয়ে ফেলবেন তিনি। ডারউইন সম্মতি প্রকাশ করেন। পরের দৃশ্যে দেখা যায় পান্ডুলিপিটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছেন এমা। তার পরের দৃশ্যে, ডারউইন ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন এমা কি যেন পুঁড়াচ্ছেন। আতংকিত স্বরে ডারউইন বলেন, এমা। ডারউইনের মত দর্শকরা এতটা ভয় নাও পেতে পারে। কারণ ইতিহাস বলে বইটা ছাপা হয়েছিল। কিন্তু ডারউইন যেহেতু ভবিষ্যৎ দেখতে পেতেন না, তার ভীতি গোটা পর্দা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত স্নেহময়ী এমা বইটি ছাপার অনুমতি দেন। কিন্তু মুখে বলেন, "May God forgive us both." ক্লান্ত এবং বিদ্ধস্ত ডারউইন হাঁপাতে হাঁপাতে ডাকের গাড়িতে পাণ্ডুলিপিটি তুলে দেন। সিনেমার শেষ দৃশ্য হিসেবে তিনটি বাক্য পর্দায় দেখা যায়। প্রথমটিতে বলা হয়, প্রজাতির উৎপত্তি বইটি প্রথম দিনেই সবগুলো কপি বিক্রি হয়। দ্বিতীয় বাক্যে বলা হয়, ৭৩ বছর বয়সে মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত চার্লস এবং এমা সুখের বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকেন। শেষ বাক্যে বলা হয়, "He was buried with full christian honours in Wesminster Abbey." সব মিলিয়ে সিনেমাটি কী দাঁড়াল? The ture story of Charles Darwin!

ক্রিয়েশন চলচ্চিত্রটি বিশ্লেষণ করা পয়োজন। ছবিটির নাম (ক্রিয়েশন) একটু ব্যতিক্রমধর্মী। সারা পৃথিবীতে ক্রিয়েশনিস্ট পত্রপত্রিকা এবং ওয়েব সাইটগুলো বিবর্তন-বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে আসছে বহুদিন হল। নাম দেখে মনে হতে পারে সিনেমাটি এদেরই ভাবধারা অনুসারে নির্মিত। কিন্তু বিষয়টি এত সরল না। চলচ্চিত্রকার এবং 'অ্যানির বাক্স' বইটির লেখক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ব্যক্তি ডারউইনকে তারা তুলে এনেছেন। 'ট্রু স্টোরি' বলে একটি তকমা সেঁটে দেয়া হয়েছে ছবিটিতে। এ ধরনের সত্য কাহিনীগুলোর জন্ম হয়েছে বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে। সত্য হল ডারউইন ইচ্ছাকৃতভাবে প্রজাতির উৎপত্তি বইটি প্রকাশে দেরি করেছেন। এর কারণ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেল ভীতি তত্ত্ব। মনস্তত্ত্ববিদ হাওয়ার্ড গ্রুবার ১৯৭৪ সালে মানুষ ডারউইনের মনোজগত বিশ্লেষণ করে একটি বই লেখেন।[৯] সেখানে তিনি ১৮৩৮ সালের ডারউইনের দেখা একটি স্বপ্নকে বিশ্লেষণ করেন। ডারউইন দেখেন একজন ব্যক্তিকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে এবং সে পুনরায় জীবন ফিরে পায়। গ্রুবার বলেন, ডারউইন তার বৈপ্লবিক চিন্তার বিকাশে শাস্তির ভয়ে এমন স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশ শতকের সত্তরের দশকে এই তত্ত্ব বিপুল লেখকপ্রিয়তা পেল। ভীতির কারণ ছিল ঈশ্বরভীতি, বিরূপ সমালোচনা ভীতি, এবং এমা ভীতি ইত্যাদি। র‍্যালফ করপ ১৯৭৭ সালে

ডারউইনের অসুস্থতা নিয়ে একটি চমৎকার গবেষণামূলক বই লিখেন। তিনি দেখান প্রজাতির উৎপত্তি প্রকাশ বিলম্বিত হবার কারণ ডারউইনের অসুস্থতা। কিন্তু তিনিও বলেন বিলম্বের একটি কারণ হল সহযোগীদের বিরূপ সমালোচনা ভীতি।[১০] অসুস্থতার ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন মানসিক চাপ একটি কারণ ছিল। এই মতগুলো দ্রুত প্রচারিত হতে থাকে। বিবিসি ১৯৭৮ সালে ডারউইনের বিগল অভিযান নিয়ে যে সিরিজ তথ্যচিত্র প্রচার করে তাতে জুড়ে দেয় ভীতি তত্ত্ব। রবার্ট রিচার্ড ১৯৮৩ সালে 'কেন ডারউইন দেরি করেছেন' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এড্রিয়ান ডেসমন্ড (Adrian Desmond) তার '*The Politics of Evolution: Morphology, Medicine, and Reform in Radical London*' গ্রন্থে বলেন এস্টাবলিশমেন্টের সাথে দ্বন্দ্বের ভয়ে ডারউইন তার বই প্রকাশে বিলম্ব করেন।[১১] ডেসমন্ড এবং মুর ১৯৯১ সালে 'ডারউইন' নামে যে জীবনী গ্রন্থ লেখেন তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ভীতি। তারা বলেন, "[Darwin] had buried evolution for twenty years, petrified for his respectability, upholding the paternalist order for a generation before being forced into the open."[১২] সে বছরই বিবিসি তথ্যচিত্রে তারা একই মত প্রচার করেন। দশ বছর পর ডেসমন্ড এবং মুর তাদের তথ্যচিত্রে (Evolution: Darwin's dangerous idea) প্রচার করেন ডারউইন আসলে নিজের ফাঁসিই স্বপ্নে দেখেছেন। ২০০২ সালে বিবিসি তথ্যচিত্র 'গ্রেইট ব্রিটনস : চার্লস ডারউইন' ভীতি তত্ত্ব প্রচার করে। অ্যানির বাক্স (২০০১) এবং ক্রিয়েশন (২০০৯) ভীতি তত্ত্বকেই প্রচারিত করেছে। জল চিকিৎসা হিসেবে ডারউইনের শরীরে ধীরগতিতে বিশাল পানির ধারা পড়তে দেখি। জলের ধারা ডারউইনের ওপর সমস্ত চাপের প্রতীক হয়ে ওঠে। এভাবে প্রতীকীরূপে ভীতি দেখানো হয়। পুরোটা সিনেমা ব্যাপী ডারউইনের ভীত চেহারা ভীতি তত্ত্বের সাক্ষ্য হয়ে রয়। এমা যখন জলন্ত আগুনের সামনে, ডারউইন আর্তস্বরে বলেন, 'এমা'। সে সময় মুরগির ডাক শুনতে পাই। সাব টাইটেলে লেখা ওঠে "Emma (chickens cluck)"। এটা কেন দেখানো হল, নির্মাতা বলতে পারবেন। ভীতির পাশাপাশি ক্রিয়েশনে নতুন যোগ হয়েছে বিষাদ। অ্যানির মৃত্যু প্রচণ্ড বিষাদের জন্ম দিয়েছে। বিষাদের ফল হিসেবে ডারউইন ১৮৫১ সালে বিশ্বাস হারান। বিদ্রোহী হয়ে উঠেন ডারউইন। চার্চ থেকে বের হয়ে আসা, ইনেসের সাথে ঈশ্বর বিতর্কে জড়ানো, চিকিৎসকের সাথে বিশ্বাস প্রসঙ্গে আলাপ এসবই তার বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ। এমনকি স্ত্রী এমার সাথে ব্যক্তিত্বের সংঘাত নতুন এক ডারউইনের জন্ম দিয়েছে। বারবার ধর্মের সাথে যুদ্ধের কথা বলার মধ্য দিয়ে ডারউইন এবং হাক্সলিকে ক্রুসেডের (!) যোদ্ধায় পরিণত করা হয়। মনে হয় তাদের লক্ষ্য ছিল ধর্মকে আক্রমণ, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা নয়। ডারউইন সারাজীবন যে যুদ্ধ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পরিহার করতে পেরেছিলেন ক্রিয়েশন তাকে সেই যুদ্ধের যোদ্ধায় পরিণত করে। ডারউইন কখনো চান নি তার লেখা বিতর্কের জন্ম দিক। এজন্য ডারউইন সারাজীবন আপোষ করেছেন। প্রজাতির উৎপত্তি প্রথম সংস্করণে ঈশ্বর শব্দটি ছিল না। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর। দুমাস পরে (৭ জানুয়ারি ১৮৬০) দ্বিতীয় সংস্করণে ডারউইন ঈশ্বর (creator) শব্দটি যোগ করেন। এটা ছিল তার একটা কৌশল। প্রথম সংস্করণ বিক্রি হয় ১২৫০ কপি। দ্বিতীয় সংস্করণ বিক্রি হয় ৩০০০ কপি। আত্মজীবনী (১৮৭৬) লেখা পর্যন্ত শুধু ইংল্যান্ডে প্রজাতির উৎপত্তি বিক্রি হয়েছে

১৬,০০০ কপি। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয় ডিসেন্ট অফ ম্যান গ্রন্থটি। এটা ছিল আরো বেশি বৈপ্লবিক। মানুষের বিবর্তনের প্রমাণ খুঁজেছেন তিনি এই বইতে। মানুষের ভ্রূণের ছবির সাথে কুকুরের ভ্রূণের ছবি রেখে দেখিয়েছেন গঠনের মিল। মানুষের বিবর্তনের ওপর পৃথিবীর প্রথম বই ডিসেন্ট অফ ম্যান। ১৮৭২ সালের বই এক্সপ্রেসন-এ ডারউইন বলেছেন, মানুষের আচরণের সাথে অন্যান্য প্রাণীর কীভাবে মিল রয়েছে। এই বইয়ের ধারণাও চূড়ান্ত র‍্যাডিক্যাল। এ ধরনের বই প্রকাশ এবং তাদের বিপুল প্রচারই হচ্ছে ডারউইনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। ডারউইনের লক্ষ্য ছিল বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করা, ধর্মকে আক্রমণ করা নয়।

একটা কথা মনে রাখতে হবে ক্রিয়েশন একটি চলচ্চিত্র। এটি কোন তথ্যচিত্র নয়। কিন্তু নির্মাতা এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে তথ্যচিত্র বলে ভ্রম হতে পারে। সে কারণেই ভুল তথ্য এবং ভুল উপস্থাপন অবশ্যই খেয়াল করতে হবে। 'ট্রু স্টোরি' তকমা বিষয়টিকে আরো জটিল করে তুলেছে। নির্মাতা স্টোরি শব্দটি ব্যবহার করে নিজের সুবিধা পুরোপুরি আদায় করে নিয়েছেন। এটা তো গল্প, ইতিহাস নয়। কিন্তু এখানে খেলা করা হচ্ছে ইতিহাস নিয়ে। চলচ্চিত্রটির সবচেয়ে বিপদজনক দিক এটাই। ক্রিয়েশন সিনেমার ডারউইন এবং বাস্তবের ডারউইন এক নন। ক্রিয়েশন সিনেমায় ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। কোথায় কোথায় হয়েছে তা আমাদের জানা দরকার।

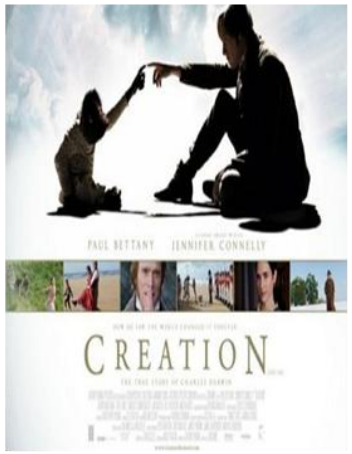

ডারউইন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন লায়েল এবং হুকার প্রজাতির উৎপত্তি লেখার জন্য তাকে বারবার উৎসাহ এবং চাপ দিয়েছেন। এমা নিজে ডারউইনকে সবসময় সাহায্য করে এসেছেন। ১৮৪৪ সালের ৫ জুলাই ডারউইন তার প্রজাতির উৎপত্তির প্রথম রচনা শেষ হলেই চিঠি লিখেছেন এমাকে :

"My Dear Emma,
I have just finished my sketch of my species theory. ….I therefore write this in case of my sudden death, as my most solemn and last request that you will devote 400 pounds to its publication."[১৩]

এই পাণ্ডুলিপিতে ডারউইনের পেন্সিল সংশোধন আছে। আছে এমার হাতে লেখা মন্তব্য।[১৪] ক্রিয়েশন সিনেমাতে সম্পূর্ণ অন্য এক গল্প দেখতে পাই। প্রজাতির উৎপত্তি লেখা শেষ হলে ডারউইন এমাকে বললেন, আমার শেষ হয়েছে। এমাকে পাণ্ডুলিপি পড়তে দিলেন ডারউইন। বাস্তবে পাণ্ডুলিপি কয়েকবার লেখা হতো। প্রকাশকের কাছে পাঠানোর আগেই নরম্যান সংশোধিত পাণ্ডুলিপির কপি তৈরি করতেন। ক্রিয়েশন সিনেমাতে কাটাকাটিতে ভরা পাণ্ডুলিপি দেখার জন্য ডারউইন এমাকে দিলেন। এতে মনে হতে পারে এই প্রক্রিয়ায় এমার কোন অংশগ্রহণ ছিল না। সেই খসড়া পাণ্ডুলিপি এমা প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ডারউইনের লেখালেখির পদ্ধতির সাথে এর কোন মিল নেই।

অ্যানি ডারউইনের দ্বিতীয় সন্তান। সিনেমায় প্রথম সন্তান হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রথম সন্তানের নাম উইলিয়াম ইরাসমাস। ডারউইনের যে মেয়েটি প্রথম মারা যায় তার নাম মেরি এলিনর। ১৮৪২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জন্ম এবং ১৬ অক্টোবর মৃত্যু। অ্যানির মৃত্যুতে ডারউইন খুব আঘাত পেয়েছিলেন কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তার ধর্ম বিশ্বাস এই ঘটনায় লোপ পায়নি। ডারউইনের মতে তার ধর্ম বিশ্বাস কখনো লোপ পায়নি। ১৮৭৯ সালে জে ফর্ডিসকে লেখা চিঠিতে তিনি বলছেন, "in my most extreme fluctuations I have never been an Atheist in the sense of denying the existence of a God. I think that generally (and more and more as I grow older), but not always, that an Agnostic would be the more correct description of my state of mind."[১৫] এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে ডারউইন লিখেছেন, 'এ গড'। বিষয়টি আরেকটু স্পষ্ট হবে আরেকটি উদ্ধৃতি দিলে। একই বছর এক নাছোড়বান্দা এক জার্মান ছাত্রের চিঠির উত্তরে তার পরিবারের একজন সদস্য লিখেছিলেন, "He considers that the theory of Evolution is quite compatible with the belief in a God; but that you must remember that different persons have different definitions of what they mean by God." ডারউইন নিজের জন্য 'এগনস্টিক' প্রত্যয়টি পছন্দ করেছেন। হাক্সলি এ প্রত্যয়ের জন্ম দিয়েছেন। অ্যানির মৃত্যুর সাথে বিশ্বাস হারানোর বিষয়টি যে বানোয়াট তা ১৮৭৬ সালের আত্মজীবনীতেই আছে : "Whilst on board the Beagle I was quite orthodox, …But I have gradually come by this time i.e. 1836 to 1839, to see that the Old Testament was no more to be trusted than the sacred books of the Hindoos. ….I gradually came to disbelieve Christianity as a divine revelation. Thus disbelief crept over me at a very slow rate, but was at last complete. The rate was so slow that I felt no distress."[১৬]

ডারউইনের রূপান্তর ঘটেছিল, ১৮৩৬ থেকে ১৮৩৯ সালের মধ্যে। অর্থাৎ অ্যানির জন্মের আগে। অ্যানির জন্ম ০২ মার্চ ১৮৪১ সাল। তাহলে ট্রু স্টোরির ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? ডারউইন বিশ্বাস হারিয়েছেন আগেই। কিন্তু কাজে এবং লেখায় তিনি কখনো বিতর্কে জড়াতেন না। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "I rejoice that I have avoided controversies, and this I owe to Lyell, who many years ago, in reference to my geological works, strongly advised me never to get entangled in a controversy, as it rarely did any good and caused a miserable loss of time and temper."[১৭]

এমনকি রেভারেন্ড ইনেসের সাথে দ্বন্দ্বের বিষয়টিও ভিত্তিহীন। রেভারেন্ড ইনেস তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন, "On my becoming Vicar of Down in 1846, we became friends, and so continued till his death. His conduct towards me and my family was one of unvarying kindness, and we repaid it by warm affection."[১৮]

ডারউইনের ভীতি এবং অসুস্থতা নিয়ে ক্রিয়েশন সিনেমাটিতে এত জোর দেয়া হয়েছে যে এ বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। ডারউইন ভীতু মানুষ ছিলেন না। জীবনের শুরুতেও না, জীবনের শেষেও না। ক্রিয়েশন ছবিতে ভীত দুর্বল মানুষটি ঠিকমতো হাঁটতেও পারতো না। ডা: বেনস জোনস এর পরামর্শে দুপুরে খাবার আগে ঘোড়া চালাতেন ডারউইন। ডারউইনের ঘোড়ার নাম ছিল টমি। ছেলে ফ্রান্সিস লিখেছেন, ডারউইন উচ্চ কণ্ঠে হাসতেন (free and sounding peal)। ক্রিয়েশন ছবিতে এভাবে হাসতে দেখি না তাকে। মানুষের এক রাতের একটি স্বপ্ন দিয়ে তার চরিত্র বিচার করা যায় না যেভাবে করেছেন হাওয়ার্ড গ্রুবার এবং ডেসমন্ড। ডারউইন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "though I cared in the highest degree for the approbation of such men as Lyell and Hooker, who were my friends, I did not care much about the general public."[১৯] মৃত্যুর আগে ডারউইনের শেষ বাক্য ছিল, "I am not in the least afraid to die."[২০] আসলে শুধু উদ্ধৃতি দিয়ে একজন মানুষের সাহস প্রমাণ বা খারিজ করা যায় না। ডারউইনের সাহসের প্রমাণ তার সমস্ত জীবনের কাজ। ভিক্টোরিয়ান ইংল্যান্ডে থেকে তিনি এমন সব বই লিখেছেন, যা নিষিদ্ধ হতে পারত। চার্চের নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা, যেখানে গ্যালিলিওর বই আছে, তখনো বিদ্যমান এবং কার্যকর ছিল। ১৯৪৮ সালে শেষ প্রকাশিত হয় নিষিদ্ধ বইয়ের তালিকা। প্রকাশক জন মারে প্রথমে প্রজাতির উৎপত্তি বইটি প্রকাশ করতে চায়নি। তাদের ধারণা ছিল বইটি নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। চার্লস লায়েল যখন প্রকাশককে নিশ্চয়তা দিলেন তিনি নিজে পাণ্ডুলিপি পড়েছেন এবং বইটিতে এমন কিছু নেই যার কারণে বইটি নিষিদ্ধ হবে, তখন প্রকাশক বইটি ছাপতে রাজি হন। ডারউইন জীবদ্দশায় রাষ্ট্র থেকে কোন সম্মান পাননি। কেবল মৃত্যুর পর ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে সমাহিত করে রাষ্ট্র তাকে সম্মানিত করে। ডারউইন অসুস্থ ছিলেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মানসিক শক্তি এত প্রবল ছিল যে তার সন্তানেরা পর্যন্ত ঠিকমতো বুঝতে পারতো না তিনি কতটা অসুস্থ। ফ্রান্সিস ডারউইন লিখেছেন, "He bore his illness with such uncomplaining patience, that even his children can hardly, I believe, realise the extent of his habitual suffering. ...they saw him in constant ill-health, and saw him, in spite of it, full of pleasure in what pleased them. …No one indeed, except my mother, knows the full amount of suffering he endured, or the full amount of his wonderful patience."[২১] শেষ বাক্যটি থেকে ডারউইন এমার সম্পর্কের গভীরতা এবং স্বরূপ বোঝা যায়। এই সম্পর্ককে ফ্রান্সিস বলেছেন, পবিত্র (sacred)। ক্রিয়েশন সিনেমাতে যেভাবে দেখানো হয়েছে, এমা-ডারউইন সম্পর্ক মোটেও টান টান ছিল না। প্রতি রাতে খাবার পর দুজনে ব্যাকগেমন খেলতেন। এমা ছিলেন ডারউইনের সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং কাজের প্রেরণা। সংসারের খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ এমা দেখতেন যাতে ডারউইনের লেখার কাজে অসুবিধা না হয়। ক্রিয়েশন চলচ্চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে, মনে হয় প্রজাতির উৎপত্তি ডারউইনের প্রথম বই। আসলে এটা ছিল ডারউইনের প্রকাশিত নবম বই। লেখালেখিতে সবসময় এমা এবং সন্তানেরা তাকে সাহায্য করেছেন। এমা প্রজাতির উৎপত্তির প্রুফ দেখতেন। ডারউইনের চাপ কমানোর জন্য সবাই চেষ্টা করতো। ক্রিয়েশন দেখলে মনে হয় একাকী এক যোদ্ধা পরিবারের মধ্যে বিপ্লব করছেন।

ডারউইন সারা জীবন বিতর্ক এড়াতে চেয়েছেন। তিনি কখনোই ধর্মের সাথে যুদ্ধ করতে চাননি। তিনি চেয়েছেন প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের প্রচার। ডারউইনের নাতির নাতি র‍্যানডল কেইন চেয়েছেন বিতর্কের ঝড় তুলতে। এতে তার প্রচার হবে। ক্রিয়েশন নির্মাতাও বিতর্ক চেয়েছেন। এজন্য প্রয়োজনে দায়িত্বজ্ঞানহীন দৃশ্য দেখাতে তাদের আপত্তি নেই। চার্চে হাটু গেঁড়ে ডারউইন কখনোই অ্যানির প্রাণ ভিক্ষা করেন নি। হাক্সলি কখনোই বলেন নি, 'তুমি ঈশ্বরকে হত্যা করেছো।' ব্যক্তি ডারউইনকে দেখানোর নামে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন এবং প্রেক্ষাপটহীন একজন গবেষককে দেখানো হয়েছে। সিনেমাটির সবচেয়ে আপত্তিকর দিক এটাই।

২০০৯ সালে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এবং কাজ হয়েছে যার বর্ণনা এই স্বল্প পরিসরে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একটি ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব মোটেই ভেঙ্গে পড়েনি। বরং জৈববিবর্তন তত্ত্ব আগের চেয়ে বর্তমানে অনেক শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। লন্ডনের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে ২০০৮ সালে ডারউইন এবং রিচার্ড ওয়েনের মূর্তির স্থান পরিবর্তনের ঘটনা যেন সেই পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী। ডারউইন এবং ওয়েনের সম্পর্ক বহুদিনের। বিগল অভিযানে সংগৃহীত স্ন্যপায়ী নমুনাগুলো পরীক্ষা করতে রাজি হন রিচার্ড ওয়েন। সে সময় তিনি ছিলেন হান্টারিয়ান মিউজিয়ামে। শুরুতে দুজনের সম্পর্ক ছিল মধুর। কিন্তু প্রজাতির রূপান্তরের প্রশ্নে দুজনের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। দুজনেই নিজের মত প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন গবেষণা করেছেন। প্রজাতির উৎপত্তি প্রকাশের পর ডারউইন ওয়েনকে একটি সৌজন্য সংখ্যা পাঠান। ১৮৬০ সালের এপ্রিলে এডিনবার্গ রিভিউ-তে ওয়েন অজ্ঞাতনামা হয়ে প্রজাতির উৎপত্তির একটি সমালোচনা লেখেন। সেখানে তিনি তার রাগ লুকাতে পারেননি। ডারউইনের মতবাদ এবং তার বন্ধুদের তীব্র আক্রমণ করেন তিনি। বইটি সম্পর্কে তার মূল্যায়ন ছিল, 'abuse of science'। সেখানে ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে কটুক্তি করেন তিনি। ডারউইন তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বলেন,

"Spiteful, extremely malignant, clever, and... damaging." পরবর্তীতে ওয়েন সম্পর্কে ডারউইন বলেন, "The Londoners say he is mad with envy because my book is so talked about. It is painful to be hated in the intense degree with which Owen hates me." ওয়েন ছিলেন তুলনামূলক এনাটমি বিশেষজ্ঞ। মানুষের সাথে অন্যান্য প্রাইমেটের মস্তিষ্কের গঠন তুলনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন মানুষের বর্গ আলাদা। টি এইচ হাক্সলি ওয়েনের এই ভিত্তিহীন যুক্তি খণ্ডন করেন। ক্যারোলাস লিনিয়াস ১৭৫৮ সালে স্তন্যপায়ী প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করতে গিয়ে প্রাইমেট বর্গ সৃষ্টি করেন। মানুষকে তিনি এই বর্গে স্থান দেন। এই প্রথম মানুষ প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসে স্থান পেল। ওয়েন চেয়েছিলেন লিনিয়াসের এই শ্রেণীবিন্যাস বদলে দিতে। কিন্তু ওয়েনের মতামত ছিল অবৈজ্ঞানিক তাই কখনো গৃহীত হয়নি। আর্কিওপটেরিক্সের ফসিল ওয়েনের উদ্যোগেই কেনা হয়। ওয়েন নিজে এ ফসিল বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি আর্কিওপটেরিক্সকে 'অন্তর্বর্তী প্রাণী' বলে কখনো মেনে নেননি। তার মতে এটা ছিল পাখি। পরবর্তীতে দুজনের দ্বন্দ্ব ব্যক্তিগত পর্যায়ে গিয়ে ঠেকে। এক পর্যায়ে ডারউইন মন্তব্য করেন, "I used to be ashamed of hating him so much, but now I will carefully cherish my hatred & contempt to the last days of my life."

ডারউইন এবং ওয়েনের মৃত্যুর পরেও এই দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ১৮৮৪ সালে ওয়েনের অবসর গ্রহণের পর, মিউজিয়ামের পরিচালক হন উইলিয়াম হেনরি ফ্লাওয়ার। তিনি প্রাইমেট মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করেছেন। প্রাইমেট মস্তিষ্ক নিয়ে ওয়েন-হাক্সলি বিসংবাদে তিনি হাক্সলির মত সমর্থন করেন। তার উদ্যোগেই ডারউইনের মৃত্যুর তিন বছর পর ১৮৮৫ সালে ২.২ টন মার্বেল পাথরের মূর্তিটি ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়াম কেন্দ্রীয় হলে স্থাপন করা হয়। পরে ১৯২৭ সালে ভারতীয় হাতির কঙ্কালের জন্য পরিসর বাড়াতে তার মূর্তিটি স্থানান্তর করা হয়। সেখানে বসানো হয় রিচার্ড ওয়েনের ১ টন মূর্তি। ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম ডারউইন ২০০তম জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ২০০৮ সালে ডারউইনের মূর্তিটি কেন্দ্রীয় হলে পুনরায় স্থাপন করেছে। ব্যালকনিতে স্থানান্তরিত হল ওয়েনের মূর্তিটি। অত্যন্ত প্রতীকী এই ঘটনাটি। ওয়েনের মেধা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। বিপরীত অবস্থান সত্ত্বেও দুজনই জীবজগৎ নিয়ে বিস্তর পর্যবেক্ষণ এবং লেখালেখি করেছেন। শেষ পর্যন্ত টিকে গেল ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব'। ডারউইনের মূর্তির স্বস্থানে ফিরে আসা যেন আমাদের সেই কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র

১. Dalrymple, G. Brent (2001). "The age of the Earth in the twentieth century: a problem (mostly) solved". Special Publications, Geological Society of London 190: 205–221

২. Thompson, W. (1862) On the secular coolin of the Earth. Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 23: 159.

৩. England, P.; Molnar, P.; Righter, F. (January 2007). "John Perry's neglected critique of Kelvin's age for the Earth: A missed opportunity in geodynamics". GSA Today 17 (1): 4–9.

৪. Kelvin, Lord (1897) The age of the Earth as an abode fitted for life. Annual Report of the Smithsonian Institution, 1897: 345.

৫. Eve, Arthur Stewart (1939). Rutherford: Being the life and letters of the Rt. Hon. Lord Rutherford, O. M.. Cambridge: Cambridge University Press.

৬. Harrison, L., The Migration Route of the Australian Marsupial Fauna, Australian Zoologist, Volume 3, Pages 247-263, 1924

৭. Palaeontology, Vol. 52, Part 1, 2009, pp. 65–81

৮. Animal Behaviour Volume 78, Issue 2, August 2009, Pages 537-541

৯. H. Gruber, Darwin on man: a psychological study of scientific creativity (Wildwood, London, 1974).

১০. R. Colp, To be an invalid: the illness of Charles Darwin (University of Chicago Press, 1977), p. 17.

১১. A. Desmond, The politics of evolution (University of Chicago Press, 1989), p. 408.

১২. A. Desmond and J. R. Moore, Darwin (Penguin, London, 1991)

১৩. http://www.darwinproject.ac.uk/entry-761

১৪. F. Darwin (ed.) Foundations of the origin of species (Cambridge University Press, 1909).

১৫. Autobiography of Charles Darwin with two appendices by his son Francis Darwin, Rupa & Co. 2003, page 131-132.

১৬. Autobiography of Charles Darwin with two appendices by his son Francis Darwin, Rupa & Co. 2003, page 135-136.

১৭. Autobiography of Charles Darwin with two appendices by his son Francis Darwin, Rupa & Co. 2003, page 59.

১৮. Autobiography of Charles Darwin with two appendices by his son Francis Darwin, Rupa & Co. 2003, page 112.

১৯. N. Barlow (ed.), The autobiography of Charles Darwin, 1809–1882 (Collins, London, 1958) p 81.

২০. Darwin, F. ed. 1887. The life and letters of Charles Darwin, including an autobiographical chapter. 3: 358.

২১. Autobiography of Charles Darwin with two appendices by his son Francis Darwin, Rupa & Co. 2003, page 129-130.

২২. ইডা সম্পর্কে জানতে নিচের দুটো ওয়েব সাইট দেখুন :

১. http://www.revealingthelink.com

২. http://www.age-of-the-sage.org/evolution/darwinius_masillae.html

ডারউইনের মূল লেখা যারা পড়তে আগ্রহী তারা নিচের ওয়েব সাইট থেকে বিনামূল্যে ডারউইনের বই সংগ্রহ করতে পারবেন, পাশাপাশি ডারউইনের সমস্ত লেখা এই সাইটে পাওয়া যাবে : http://darwin-online.org.uk। ক্রিয়েশন সিনেমার একটি ওয়েব সাইট আছে : www.creationthemovie.com।

অরিজিন অব স্পিসিজ : মানবজাতির জন্য আলোর ঝলক

আসিফ[+]

ছোটবেলা থেকে আমরা খামার ও গৃহপালিত প্রাণী, ফল ও গাছ এবং শাকশব্জি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এগুলো কোথা থেকে এসেছে? তারা কি এক সময় বনে মুক্ত জীবন-যাপন করেছিল এবং তারপর খামারে এসে অপেক্ষাকৃত কম কষ্টকর জীবনে অভ্যস্ হয়ে পড়লো? না, সত্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। তাদের বেশিরভাগেরই আমাদের হাতে তৈরি। এই ধরনের প্রক্রিয়াকে 'কৃত্রিম নির্বাচন' বলে। এই কত্রিম নির্বাচনের মূলকথা হচ্ছে—তা হেইকি কাকড়াই হোক অথবা কুকুর বা গরু বা শস্যদানাই হোক—উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রে অসংখ্য শারীরিক আচরণগত যে বৈশিষ্ট্য থাকে তা বংশগতির মধ্যে প্রোথিত। তারা বংশবিস্তার করে সত্য। মানুষেরা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে কিছু প্রকরণকে (varieties) পুনরুৎপাদনে উৎসাহিত করে এবং অন্যগুলোকে নিরুৎসাহিত করে। ফলে যে প্রকারটি অধিকতর পছন্দনীয় হিসেবে সহযোগিতা পায়; তাদের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় আর যেগুলো বাধা পায় সেগুলো দুর্লভে পরিণত হয় এবং বিলুপ্তির পথে চলে যায়। যদি মানুষেরা উদ্ভিদ ও প্রাণীর নতুন নতুন প্রকরণ তৈরি করতে পারে, তাহলে প্রকৃতি কেন পারবে না? প্রকৃতির এই ধরনের প্রক্রিয়াকে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বলে। পৃথিবীতে অল্প সময় ধরে নিয়ন্ত্রণ করে আমরা যে পরিবর্তনগুলো ঘটিয়েছি পশু ও শাক-শব্জির মধ্যে, তা থেকে এবং সেইসাথে ভূত্বকের বিভিন্ন স্তরে জীবাশ্মের চিহ্ন হতে এটা সম্পূর্ণভাবে পরিস্কার যে প্রাণ মহাকালব্যাপী মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ফসিল রেকর্ড আমাদেরকে দ্ব্যর্থহীনভাবে ওই সব প্রাণীর কথা বলে যারা একদা বিশাল সংখ্যায় ছিল এবং এখন যা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আজ যে সংখ্যক প্রজাতি পৃথিবীতে আছে তার অনেক বেশিসংখ্যক প্রজাতি পৃথিবীর ইতিহাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারা হয়েছে বিবর্তনের বলি।

গার্হস্থায়নের প্রভাবে বংশগতির পরিবর্তন ঘটেছে খুব দ্রুত। ১০ হাজার বছরেরও কম সময়ের মধ্যে গার্হস্থায়নের ফলে ১ কিলোগ্রামেরও কম অবস্থা থেকে ভেড়ার রুক্ষ পশম বৃদ্ধি পেয়ে ১০ অথবা ২০ কিলোগ্রামে পৌঁছেছে, পশমগুলো সূক্ষ্ম ও মসৃণ হয়েছে; অথবা গবাদি পশুর একবার দহনে দুধ দেয়ার পরিমাণ বেড়েছে কয়েকশত থেকে কয়েক লক্ষ ঘন সেন্টিমিটার পর্যন্ত। যদি কৃত্রিম নির্বাচন এত অল্প সময়ে এত বড় রকমের পরিবর্তন ঘটাতে পারে তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচন—যে প্রক্রিয়াটি কোটি কোটি বছর ধরে জীবজগতে ক্রিয়াশীল, সেটা কেন সামর্থ্য হবে না? এই কথার উত্তর হল উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে আজ এত সৌন্দর্য এত বৈচিত্র্য হল প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলাফল। এ সবই ডারউইনের '*অরিজিন অব স্পিসিজ*'র মূল বক্তব্য।

[+] আসিফ : বিজ্ঞান লেখক, পেশাদার বিজ্ঞান বক্তা। প্রতিষ্ঠাতা, *ডিসকাশন প্রজেক্ট*।

প্রজাতির উৎপত্তি'র (*Origin of Species*) গ্রন্থের ভূমিকায় প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের ব্যাখ্যাদাতা চার্লস ডারউইন লিখেছিলেন :

> আমাদের চারপাশে বিদ্যমান জীবদের মধ্যবর্তী পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে আমাদের প্রগাঢ় অজ্ঞতার কথা যদি কেউ মনে রাখেন তবে কারো অবাক হবার কিছু নেই যে প্রজাতি ও প্রকরণের উৎপত্তি সম্পর্কে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন, কেন একটি প্রজাতির বিস্তার সুবিশাল স্থান নিয়ে এবং তার সদস্যসংখ্যা অনেক বেশি, কেন অন্য প্রজাতিটির বিস্তার সঙ্কীর্ণ পরিসরে এবং বিরল? অথচ এসব সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা নির্বাচন করে প্রতিটি জীবের কল্যাণ এবং আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ পরিবর্তন ও সাফল্য। ...আমি পরিপূর্ণভাবে নিঃসন্দেহ যে প্রজাতি সুস্থিত নয়; বরং মনে করি, এখন যেগুলোকে একই গণভুক্ত করা হয়, সেসব প্রজাতি বর্তমানে বিলুপ্ত প্রজাতির সরাসরি উত্তরসূরি, একই প্রজাতির বিভিন্ন পরিবৃত্তি। সম্পূর্ণভাবে না হলেও এ পরিবর্তন সাধনের মূল কাজটি করেছে প্রাকৃতিক নির্বাচন।

ডারউইন তার এই মহাগ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বলেছেন,

> এই পৃথিবীতে সমস্ জৈবসত্ত্বা সম্ভবত কোন এক খুব আদিম অবস্থা হতে বংশধররূপে উদ্ভূত হয়েছে, বরং এর মধ্যদিয়ে প্রথম তাদের অস্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়েছিল। ...যখন থেকে পৃথিবী সুনিয়ন্ত্রিত মহাকর্ষ সূত্রানুসারে চক্রাকারে ঘুরছে, তখন হতে প্রাণের এই চিত্রের চমৎকারিত্ব বা মোহনীয়তা হল একটি খুবই সরল গঠন হতে আরম্ভ করে অন্তহীন প্রক্রিয়ার ও পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক প্রাণের উদ্ভব হচ্ছে এবং হয়েছিল।

চার্লস ডারউইনের জন্ম ১৮০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। পেশাগত দিক দিয়ে তার পিতা ও পিতামহ উভয়েই ছিলেন ডাক্তার। ছয় ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পঞ্চম। তাঁর মধ্যে ছোটবেলা থেকে কীটপতঙ্গ সংগ্রহ, নানারকম উদ্ভিদের নাম জানা, খনিজ পদার্থ, শিলা, ফসিল সংগ্রহের ঝোঁক দেখা যায় বেশি। ফলে ১৮২৫ সালে দুবছর ডাক্তারি পড়ার পরও তা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হন তিনি। ১৮২৭ সালে যাজক হওয়ার জন্য ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থিওলজি পড়তে গেলেও তা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হন। ১৮৩১ সালে ২৭ ডিসেম্বর, ক্যাপটেন ফিটজরয়ের অধিনায়কত্বে প্লাইমাউথ বন্দর থেকে ২৩৫ টন ওজনের বিগল জাহাজে আমেরিকার দক্ষিণ উপকূলে জরিপের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এই জাহাজে ডারউইন অবৈতনিক উদ্ভিদবিদ হিসেবে এ অভিযানে যোগ দেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর তার এ ভ্রমণ স্থায়ী

হয়, ১৮৩৫-এ ফিরে আসেন। তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিসাস, ব্রাজিল, সেন্টহেলেনা, আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জ ও গ্যালাপোগাস দ্বীপপুঞ্জের উপকূলে ঐ জাহাজ জরিপ চালায়। তিনি প্রত্যেক জায়গা থেকে উদ্ভিদ, পতঙ্গ, প্রাণী ও ফসিলের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং সেই সাথে ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ করেন। জাহাজ প্রত্যেক বন্দরে পৌঁছার সংঙ্গে সংঙ্গে তিনি সংগৃহীত নমুনাগুলো দেশে হেনস্লোর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। হেনস্লো হলেন ক্যামব্রিজের একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক, ক্যামব্রিজ থাকাকালীন সময়ে তাঁর কাছ থেকে চার্লস লায়েলের *প্রিন্সিপল অব জিওলজি* নামে একটি অসাধারণ বই পড়েন, যা তার পূর্বের চিন্াচেতনাকে পরিবর্তিত করে দেয়। এ অনুসন্ধানে গ্যালাপোগাস দ্বীপপুঞ্জই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর দেশে ফেরার পর হেনস্লোর কাছে পাঠানো বিভিন্ন পাঠানো তথ্যাদি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরবর্তী ২০ বছর সময়কাল তিনি তাঁর ভ্রমণকালীন ভূতাত্ত্বিক নিরীক্ষা ও প্রাণীজগতের বিবর্তন নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এরই ফলাফল হিসেবে *অরিজিন অব স্পিসিজ* লেখা হয় এবং আবিস্কৃত হয় জৈববিবর্তনের মূল তত্ত্ব 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'।

১৮৫৮ সালের ১৪ই জুন ইস্ট ইন্ডিজ থেকে একটি চিঠি পৌঁছায় লন্ডন শহর থেকে উনিশ মাইল দূরে ডাউন গ্রামে বসবাসরত ডারউইনের কাছে। লেখক অখ্যাত ইংরেজ, আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস, বয়স মাত্র ৩৫ বছর। চিঠিটা পাঠ করে ডারউইন স্তম্ভিত, হতবাক হয়ে যান। এ যে তারই প্রজাতির উদ্ভব সংক্রান্ চিন্াধারার সার-সংক্ষেপ। এটাকে বলা যায় কাকতালীয়ভাবে দুজন বিজ্ঞানীর স্বতন্ত্রভাবে অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। তবে সমস্ত তত্ত্বটিকে নিখুঁত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ব্যাপক তথ্যাবলী দরকার তা শুধুই ডারউইনের কাছে ছিল। শেষ পর্যন্ ডারউইনের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বে আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস নামটি যুক্ত হয়ে গেল। ডারউইন যে কাজের উপর কয়েক হাজার পৃষ্ঠার মহাগ্রন্থ রচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা বাতিল করে মাত্র পাঁচশত পৃষ্ঠায় নামিয়ে আনেন। ১৮৫৯ সালের মার্চ মাসে পাণ্ডুলিপিটি লেখাটি শেষ হয় আর প্রকাশিত হয় নভেম্বরে। বইটির পুরো নাম *The Origin Of Species by Means of Natural Selection or the preservation of favoured races in the struggle for life* অথবা সংক্ষেপে Origin Of Species আর বাংলায় 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি, বা জীবন সংগ্রামে আনুকূল্যপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীর সংরক্ষণ'। গ্রন্থটির মূল বক্তব্য হচ্ছে : "প্রকৃতি বহু সন্তান প্রসবা–যা টিকে থাকবে তার থেকে অনেক বেশি প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্ম হয় এবং পরিবেশ নির্বাচন করে ঐ প্রকরণগুলো থেকে, যেগুলো টিকে থাকার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি উপযোগী। মিউটেশন—বংশগতিতে আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটায়। তারা বিবর্তনের কাঁচামাল সরবরাহ করে। পরিবেশ নির্বাচন করে ওই অল্পকিছু মিউটেশনকে যারা জীবের টিকে থাকাকে উপযোগী করে। ফলাফলস্বরূপ পর্যায়ক্রমিক ধীর রূপান্তরের মাধ্যমে জীবন এক কাঠামো থেকে অন্য কাঠামোতে যায়, নতুন প্রজাতির উৎপত্তি ঘটে।"

সাধারণ সবুজ কাপড়ে বাঁধাই ও ১৫ শিলিং মূল্যের 'প্রজাতির উৎপত্তি' বইটির প্রথম সংস্করণে ১২৫০ কপি প্রকাশিত হয়। রুশ, স্পেনিশ, জাপানি ভাষাসহ বহু ভাষায় এই বইটি অনূদিত হয়েছে কিন্ বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থটি অনুবাদ হতে আমাদের প্রায় দেড়শ বছর পর্যন্ অপেক্ষা করতে হয়েছে। তারপরও এটা আমাদের জন্য সুখবর যে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে '*প্রজাতির উৎপত্তি* শিরোনামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. ম. আখতারুজ্জামান কর্তৃক ভাষান্র করা হয়েছে। বাংলায় অনুবাদকের ১৫ পৃষ্ঠার নিজস্ব ভাষ্যসহ ৩৯২ পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্য। অনুবাদকের ভাষ্যটি বেশ তথ্যবহুল ও প্রাঞ্জল। ইতিহাসে এত উত্তেজনাকারী বই বোধহয় আর কখনো লিখিত হয়নি। গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথে এটি প্রচণ্ড ও ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করে। এই বিতর্ক শুধু বিশেষজ্ঞরাই করেন নি, সাধারণ মানুষও জড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে ধর্মযাজকদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই বই। Great Books of the Western Worlds-এর ৪৯-তম খণ্ডে ২৫১ পৃষ্ঠা জুড়ে অন্তর্ভুক্ত করা আছে '*অরিজিন অব স্পিসিজ*'।

ডারউইন তার *প্রজাতির উৎপত্তি* বইটির মাধ্যমে জীববিজ্ঞানে সফলভাবে বেকনীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং জীববিদ্যাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে উন্নীত করেন। প্রজাতির উৎপত্তি বইটি ১৮৭২ সালের মধ্যে ৬টি সংস্করণ বের হয়। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে এই বইয়ে আরোহ-অবরোহমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করেছিলেন ডারউইন। প্রজাতির উৎপত্তি গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (৭ জানুয়ারি, ১৮৬০) থেকে লেখক বিভিন্ন সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে লামার্কীয় মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং তার তত্ত্বের জন্য ক্ষতিকর কিছু বক্তব্য যুক্ত করে ফেলেন। মিউটেশন ও বংশাণুসৃতি প্রজন্মান্তরে সঞ্চরণ ব্যাখ্যা করতে

গিয়ে তথাকথিত 'প্যানজিন' বা মিশ্রণ মতবাদ প্রচার করেন। এমন কী পরবর্তী সংস্করণগুলোতে প্রথম সংস্করণের মতো অস্পষ্ট না রেখে বিবর্তনের চালিকা শক্তি হিসেবে স্রষ্টাকে টেনে নিয়ে আসেন যদিও সামগ্রিকভাবে তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করেন নি। এই পদ্ধতি সফলভাবে ব্যবহার করা দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন বংশগতি সঞ্চরণের অন্যতম ব্যাখ্যাদাতা গ্রেগর জোহান মেন্ডেল।

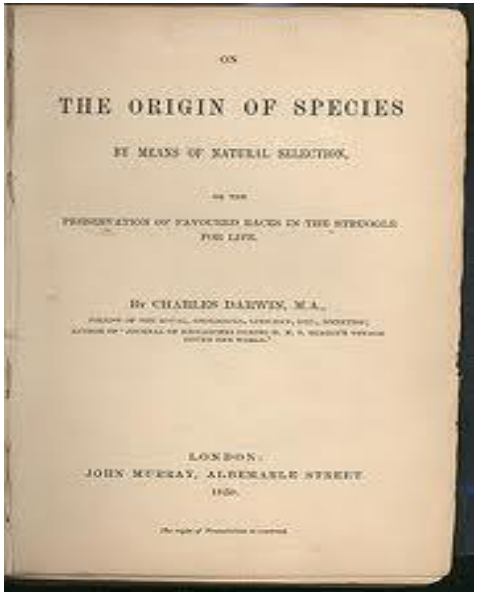
ON

THE ORIGIN OF SPECIES

BY MEANS OF NATURAL SELECTION,

OR THE

PRESERVATION OF FAVOURED RACES IN THE STRUGGLE FOR LIFE.

By CHARLES DARWIN, M.A.,

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET.
1859.

উনবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে দক্ষ তার্কিক এবং জৈববিবর্তন তত্ত্ব জনপ্রিয়করণের হোতা টমাস হাক্সলি লিখেছিলেন, ডারউইন এবং ওয়ালেসের রচনা বা গ্রন্থ হলো : "একটি আলোর ঝলক, এমনসব মানুষের কাছে যে রাত্রির অল্প অন্ধকারে পথ হারিয়েছে, হঠাৎ করেই তার কাছে প্রকাশ করে একটি পথের যে পথটি তাঁকে নিয়ে যেতে পারে সরাসরি তার বাড়িতে অথবা নাও নিতে পারে, তবে নিশ্চিতভাবে তার পথে যাবে...। *অরিজিন অব স্পিসিজ*-এর মূল বক্তব্য আত্মস্থ করার পর প্রথমে আমার মনে হলো কত বড় বোকা হওয়ায় একথাটা আগে ভাবিনি!" গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের পরবর্তীতে একটি ঐতিহাসিক রূপরেখা যোগ করেছেন : প্রাচীনকালের দার্শনিকদের কথা সংক্ষেপ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি প্রত্নজীবাশ্মবিদ বুঁফো থেকে আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি মূলত লামার্কবাদকে গুরুত্ব দিয়ে তার রচনা শুরু করেন। বইটির ১৪ টি অধ্যায় হলো যথাক্রমে গৃহপালিত অবস্থায় পরিবৃত্তি, প্রকৃতিতে পরিবৃত্তি, জীবন সংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন, পরিবৃত্তির নিয়মাবলী, তত্ত্বের অসুবিধাসহ, সহজাত প্রবৃত্তি, সংকরত্ব, ভূতাত্ত্বিক দলিলের অসম্পূর্ণতা, জীবের ভূতাত্ত্বিক পর্যায়ক্রম, ভৌগলিক বিস্তার-অনুবর্তন, আন্তঃজীব সম্পর্ক-অঙ্গসংস্থানবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা ও লুপ্তপ্রায় অঙ্গ, এবং চতুর্দশ অধ্যায় পুনরাবৃত্তি ও উপসংহার। তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচন বোঝাতে গিয়ে গ্রন্থটি আরম্ভ করেছেন কৃত্রিম নির্বাচন দিয়ে, তা করতে গিয়ে প্রায় সকল মানুষের কাছে সুপরিচিত পোষা পাখি, জীব-জন্তু ও আবাদী উদ্ভিদের মধ্যে দেখা নির্বাচনের কথা বলেছেন। এর ফলে বিশেষজ্ঞ থেকে সাধারণ মানুষ সবাই এটা সহজেই পড়তে পারেন। ফলে সহজেই জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এত ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে আলোড়িত করেছে।

জৈববিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব—উভয়েই দীর্ঘ সময় ধরে কুৎসা-অপপ্রচারের শিকার। আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীতে জীবনের সৌষ্ঠবের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিল, প্রাণের গঠনের কার্যক্রমের নৈপুন্য দেখে অবাক হয়েছিল, এবং স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেছিল। ডারউইন যুগের পূর্বে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল 'প্রত্যেক প্রাণী এমন বিশেষভাবে নক্সা করা যে একটি প্রজাতি অন্যটিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। প্রজাতি স্থির।' তারা আরো মনে করতেন 'প্রত্যেক প্রাণী স্রষ্টা কর্তৃক অতি সতর্ক ও পরিমিতির ভিতর দিয়ে গঠিত, এবং মানুষ প্রকৃতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।' কিন্তু ডারউইন ও ওয়ালেস দেখিয়েছেন, প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যময়তা উদ্ভবের আরেকটি উপায় আছে, যা সমানভাবে আবেদনপূর্ণ, সমানভাবে মানবিক, এবং অনেক বেশি তথ্য-প্রমাণসমৃদ্ধ; 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'—যা যুগে যুগে জীবনগীতি আরও বাঙময় করে তোলে। ফলে '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' বের হবার পর মানুষের শত শত বছর ধরে গড়ে ওঠা সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাস ধ্বসে পড়তে পারে, এমন আশঙ্কা বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে ধর্মীয়নেতা—অনেকেই করেছিলেন; বিরোধীদের বিপুল প্রচারণায় উল্টো ফলও হয়েছে, সাধারণ মানুষকে এ তত্ত্বটা এত বেশি আকর্ষণ করেছে। এত বেশি নাড়া দিয়েছিল এবং দিচ্ছে। এরকম প্রায় সম আলোড়নকারী আরো কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে। কিন্তু তা সাধারণ মানুষের বোধের বাইরে বলে বিষয়টা ধর্মপ্রবক্তাদের তেমন মাথা-ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। ডারউইন জৈববিবর্তনের আবিষ্কারক নন, প্রক্রিয়াটির ব্যাখ্যাদাতা মাত্র। তার এই তত্ত্ব পরবর্তীতে আরও সংশোধিত, বিকশিত হয়েছে। তারপরও আমাদের দেশের অনেকেই বলেন 'ডারউইন মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছেন'। তারা বোধহয় জানেন না একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পর্যবেক্ষণের সমর্থনে কীভাবে তৈরি হয়। তা বিকশিত হওয়া মানে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া নয় বরং আরও ব্যাপক অর্থে সত্য হওয়া।

আমাদের দেশে নব্বই দশকের পর থেকে সরকারের অদৃশ্য শক্তির ইশারায় ধীরে ধীরে স্কুলে-কলেজে জৈববিবর্তন পড়ানো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সরকারের ঐ অদৃশ্য শক্তি অবশ্য গায়েবি মন্ত্রে আস্থা না রেখে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ঠিকই যান! প্রতি বছরই সরকার প্রকাশনা শিল্পকে সহায়তা করা এবং দেশের স্কুল-কলেজ ও পাবলিক গ্রন্থাগারে ভাল বই পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে বই কিনে থাকেন। এই বই কেনাকে কেন্দ্র করে প্রতি সরকারের সময়ই গুণগতমানের মূল্যায়ন থেকে স্বজনপ্রীতি বেশি ঘটে। প্রত্যেক বছর যে-সব গ্রন্থ কেনা হচ্ছে তাতে বিজ্ঞান তো দূরের কথা, প্রচণ্ড বিজ্ঞান বিরোধী এবং অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যাকারী বইগুলো স্থান পেয়ে যায়। অথচ *অরিজিন অব স্পিসিজ*-এর মত বিজ্ঞানের বইগুলো সরকারের সুনজরে আসে না।

কার্ল মার্কস ডারউইনের *প্রজাতির উৎপত্তি* পরম উৎসাহে পড়েছিলেন এবং তার পরম বন্ধু ও সহকর্মী ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসকে এই বইয়ের কথা এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন। *প্রজাতির উৎপত্তি* প্রকাশের তিন বছর পর মার্কস এঙ্গেলসকে এক পত্রে লেখেন, 'এটি খুবই উল্লেখযোগ্য বিষয় যে পশু ও উদ্ভিদ জগতে তিনি ইংরেজ সমাজের শ্রমবিভাগ প্রতিযোগিতা, নতুন বাজারে প্রবেশ, উদ্ভাবন ও ম্যালথাসিয় সংগ্রাম দেখতে পেয়েছেন।' মার্কস পুজি গ্রন্থটি প্রকাশের পর উপহার হিসেবে এটি তিনি ডারউইনের নিকট প্রেরণ করেন। অনেকে বলেন ডারউইন সমাজের পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় জৈববিবর্তন তত্ত্বকে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিলেন

না। হয়তো সম্ভব বলেও মনে করতেন না। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস মানবসমাজে বিপ্লবের কথা বলেছেন, বিপ্লবের অনিবার্যতার কথা বলেছেন। তারা মানবসমাজের ক্রমবিকাশকে, সমাজের মার্কসীয় 'শ্রেণী সংগ্রামকে' জীবজগতের 'জীবন সংগ্রাম'-এর সমার্থক বলে মনে করেছিলেন। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানের ইতিহাসকার জর্জ সার্টন বলেছেন, 'বিজ্ঞানের ইতিহাসকে কোন প্রকার সামাজিক বা দার্শনিক মতবাদের সমর্থনের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা উচিত না। তার ব্যবহার কেবল তার নিজের উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত। সে নিরপেক্ষভাবে দেখাবে অযুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তির কাজ, দেখাবে সর্বপ্রকারের আকারে সত্যের ক্রম-উদ্ঘাটন—আর সে সত্য সুখকর হোক বা দুঃখকর হোক, সাদরে গৃহীত হোক বা অনাদরে প্রত্যাখ্যিত হোক।'

১৮৬০ সালে ৩০ জুন ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিজ*কে নিয়ে এক বিতর্ক সভায় অক্সফোর্ডের বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স তার বক্তৃতা শেষে তিনি হাক্সলিকে প্রশ্ন করছিলেন, 'আমার একটা বিষয় পরিস্কার হয় নি, রয়াল সোসাইটির মহাপণ্ডিত হাক্সলি কোন দিক থেকে নিজেকে বানরের উত্তরাধিকার দাবি করছেন, অর্থাৎ দাদা অথবা দাদীর কোনজন বানরের উত্তরাধিকার ছিলেন।' হাক্সলি এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছিলেন তা এভাবে বলা যায়, নির্বাচনের সুযোগ যদি থাকতো, দুজনের মধ্যে কাকে আমি পিতামহ বলে নির্বাচন করবো–একজন হতভাগ্য বনমানুষকে, না এমন একজন চিন্নাশক্তি সম্পন্ন পণ্ডিতকে, জনমানুষে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলার ক্ষমতা যার করায়ত্ত, অথচ সেই সুযোগ ও ক্ষমতাটা তিনি প্রয়োগ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আলোচনার ভিতরে কিছু চটুল ব্যঙ্গ আমদানি করে হাততালি পেতে—তাহলে নির্দ্বিধায় ঐ বনমানুষটিকে আমি বেছে নিতাম।'

সহায়তাকারী তথ্যপঞ্জি :

Carl Sagan, *Cosmos: One Voice In The Cosmic Fugue*.
Charles Darwin, *Origin Of Species*.
চার্লস রর্বাট ডারউইন, *প্রজাতির উৎপত্তি*, (ভাষান্র ম. আখতারুজ্জামান), প্রথম প্রকাশ ২০০০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জৈববিবর্তন তত্ত্ব এত প্রয়োজনীয় কেন

মনিরুল ইসলাম*

বিশ শতকের বিশিষ্ট জৈববিবর্তন বিজ্ঞানী এবং চিন্নাবিদ জুলিয়ান হাক্সলি তাঁর '*Evolution In Action*' বইয়ের মুখবন্ধে লিখেছেন : "জ্ঞানান্বেষণের সকল শাখায় এমন বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকে যে আমাদের দৃষ্টি সীমার জুড়ে দাঁড়ানো কয়েকটি গাছের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় একটি গোটা অরণ্য। এ ঘটনা জৈববিবর্তনের ক্ষেত্রে যতটা ব্যাপকভাবে ঘটেছে অন্য কোন ক্ষেত্রেই ততটা ঘটেনি।"[১] জৈববিবর্তনের ধারণা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে এবং আমাদের সার্বিক চিন্না ও দর্শনকে এতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে যে এর ফলে জগৎ সম্পর্কে মানুষের অনেক মৌলিক ধারণার ভিত্তি পাল্টে গেছে। মানুষের আধুনিক বোধ নির্মাণের ক্ষেত্রে জৈববিবর্তন তত্ত্বের এই ব্যাপক অবদান সম্পর্কে সাধারণভাবে বিদ্যাচর্চার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের ধারণাও এতটা সীমিত যে এর থেকে আমরা হাক্সলির এই উক্তির সত্যতা খুঁজে পাই। বেশির ভাগ 'বিদ্বান' ব্যক্তিদের ধারণা জৈববিবর্তন তত্ত্ব জীবের (মানুষেরও) উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের যে কৌতূহল এবং প্রশ্ন আছে কেবল তারই কিছু যুক্তিসঙ্গত উত্তর ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছে। কিন্তু জীবের উৎপত্তি ও বিকাশের ব্যাখ্যা জৈববিবর্তন তত্ত্বের প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি অবদান হলেও সবটা নয়। প্রকৃতিজগতের আরও অনেক গভীর প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয় ভিত্তি হয়ে উঠেছে জৈববিবর্তনের তত্ত্ব। প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History), পরিবেশ বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান, মনস্ত্ব, পুরাতত্ত্ব (Archeology), নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি, এমনকি দর্শন, ইতিহাস এবং অর্থনীতির অনেক গভীর প্রশ্নের সমাধানের জন্যেও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে জৈববিবর্তনের জ্ঞান।

বিজ্ঞানের মূল কাজ দু'টি। জগতকে ব্যাখ্যা করা এবং জগতকে নিয়ন্ত্রণ করা। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যে কোনো শাখার কাছে আমাদের প্রয়োজনও মূলত দু'টি, প্রথমত জগতের সব কিছু সম্পর্কে আমাদের যে কৌতূহল আছে তা মেটাবার প্রয়োজন, এবং দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের জীবনধারণকে আরও সহজ করে তোলার প্রয়োজন। জীববিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে জৈববিবর্তন তত্ত্ব বা বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছে দেড়শো বছর আগে। ১৮৫৮ সালে ইংল্যান্ডে লিনিয়ান সোসাইটির জার্নালে ডারউইন-ওয়ালেস তত্ত্বের প্রকাশকেই বিজ্ঞানের এই শাখার সূচনা-লগ্ন বলে ধরা হয়। সূচনা হবার পর প্রায় সাত-আট দশক জৈববিবর্তনের তত্ত্ব কেবল প্রকৃতি-জগতের নানা 'রহস্য'-কে ব্যাখ্যা করেছে; অর্থাৎ (বিজ্ঞানের কাছে) আমাদের প্রথম প্রয়োজনটি মিটিয়েছে। কিন্তু এরপর

---

* মনিরুল ইসলাম : সহকারী অধ্যাপক, স্যার সলিমুলাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *জৈববিবর্তনবাদ : দেড়শ' বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ* (২০০৭, সংহতি প্রকাশন), *বিজ্ঞানের মৌলবাদী ব্যবহার* (২০০৮, ক্যাথার্সিস পাবলিশিং) এবং *নারী পুরুষ বৈষম্য : জীবতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট* (২০১০, সংহতি প্রকাশন), ঢাকা। আলোচ্য প্রবন্ধটি ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখে *বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ* আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

থেকে জৈববিবর্তন তত্ত্ব বিভিন্ন প্রায়োগিক বিজ্ঞানেরও অপরিহার্য ভিত্তি হয়ে উঠতে শুরু করেছে। অর্থাৎ জগতকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রেও জৈববিবর্তনের জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

বিংশ শতাব্দী শুরু হয়েছিল পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দুটি যুগান্তকারী অবিষ্কার দিয়ে। প্রথমটি হচ্ছে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এবং অন্যটি হল কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মনে হয়েছিল এটি হবে পদার্থবিজ্ঞানের শতক। কিন্তু এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশেষত বংশগতি বিজ্ঞান (Genetics), মলিকুলার বায়োলজি এবং বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি জগত সম্পর্কে আমাদের ধারণা এবং আমাদের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাকে এতটাই এগিয়ে দিয়েছে যে বিংশ শতাব্দী এমনকি একবিংশ শতাব্দীকেও আমরা বলতে পারি জীববিজ্ঞানের শতক। বর্তমান সময়ের আমেরিকার বিখ্যাত তরুণ বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানী, পরিবেশবিদ এবং দর্শনের অধ্যাপক মাসিমু পিগসি'র (Massimo Pigluicci) ভাষায় : "আমরা এখন সবিস্তারে জানি কীভাবে মানুষের শরীর গড়ে ওঠে। এমনকি আমরা (জ্ঞানের) এমন একটি পর্যায়ে চলে যাচ্ছি যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে মানুষের শরীরের গড়ে ওঠাকে নিয়ন্ত্রণও করতে পারবো। ...যদিও (বিংশ শতাব্দীর শুরুতে) আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ (General Theory of Relativity) দ্বারা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ শতকে জীববিজ্ঞানেরই জয় হয়েছে।"[২]

জৈববিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উদ্ভবের একশো বছরের কম সময়ের মধ্যে এটি জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে চিন্তা এবং বিশেষণের পদ্ধতিতে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে। এর ফলে এই ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তার ধরন এবং উপলব্ধিও পাল্টে যাচ্ছে। যে কোন জৈবনিক প্রবণতা বা প্রক্রিয়াকে সম্যকভাবে বোঝার জন্য জীববিজ্ঞানের যে কোন শাখায় এখন দুরকমের ব্যাখ্যা খোঁজা হয় : (ক) একটি সন্নিহিত ব্যাখ্যা, যা আমাদের কাছে তুলে ধরে—কিভাবে প্রবণতাটি ক্রিয়া করে। (খ) একটি বিবর্তনিক ব্যাখ্যা, যা বিশ্লেষণ করে কিভাবে প্রবণতাটি অস্তিত্বশীল হয়েছে।[৩]

এই দুই ধরনের ব্যাখ্যা আবার একটি অপরটির বিকল্প নয়। পরিপূর্ণ ধারণা এবং উপলব্ধির জন্য দুটোই অপরিহার্য[৩], যেমন আফ্রিকার আদিবাসীদের গায়ের রঙ কালো কেন এই প্রশ্নের সন্নিহিত ব্যাখ্যা হচ্ছে : তাদের ত্বকে রঞ্জক পদার্থ (মেলানিন) উৎপন্নকারী কোষ (মেলানোসাইট) বেশি এবং বংশগতির বিচারে বলা যায়, তাদের ক্রোমোজমে জিনের বিন্যাস এমন যে এর ফলে ত্বকে প্রচুর ঐ জাতীয় কোষ এবং রঞ্জক উৎপন্ন হয়। অন্য দিকে কেন এদের গায়ের রঙ কালো হল এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারে কেবল একটি বিবর্তনিক ব্যাখ্যা। কালো রঙ সূর্যালোকের ক্ষতি থেকে অনেক কার্যকরভাবে ত্বক রক্ষা করতে পারে। তাই ক্রমবিবর্তনের কোন এক পর্যায়ে আফ্রিকার মানষদের ত্বকের এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল।

পরিবেশের বিপর্যয় সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ বোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণে আমাদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে হলে জৈববিবর্তনের জ্ঞান অপরিহার্য। কারণ বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানীরা মূলত যে বিষয়টিকে জানতে চেষ্টা করেন তা হল কীভাবে একটি প্রজাতি (Species) তার প্রতিবেশের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে কিংবা কীভাবে এটি তার পরিবেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে। আমরা দেখি কিছু কিছু প্রজাতি (টিকে থাকার সংগ্রামে) বেশ সফল এবং এরা নানা রকম পরিবেশে নিজেদের অস্তিত্ব দ্রুত ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে এমন অনেক প্রজাতি রয়েছে যারা বিভিন্ন পরিবেশে টিকে থাকতে না পেরে ক্রমান্বয়ে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। এই দুটি বিষয়ই অপরিহার্যভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন অর্থাৎ বিবর্তনিক প্রক্রিয়া। সময়ের সাথে সাথে জীবের জনগোষ্ঠিগত (Population), জনসংখ্যাতাত্ত্বিক (demographic) এবং বংশগতির (genetic) যে পরিবর্তন ঘটে তারই ধারাবাহিকতায় পাল্টে যায় বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানে জীবের অবস্থান ও বিস্তৃতি। এ বিষয়টি পরিবেশের গতিশীলতার একটি নির্ধারক (decisive) উপাদান। এ বিষয়টিকে সম্যকভাবে বোঝার জন্য বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞানীরা প্রজাতিসমূহের ভৌগলিক বিস্তৃতি (distribution) এবং কী প্রক্রিয়ায় এই বিস্তৃতি ঘটে তা জানার জন্য অনেকটা সময় ব্যয় করেন। বিজ্ঞানের যে শাখা জীবের ভৌগলিক বিস্তারকে অনুসন্ধান ও নিরীক্ষণ করে তাকে বলা হয় জৈব-ভূগোল (Bio-Geography)। ডারউইনের সময় থেকে জৈব-ভূগোল জৈববিবর্তন তত্ত্বের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। ডারউইন এবং ওয়ালেস দুজনই জৈববিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র পেয়েছিলেন জীবের ভৌগলিক বিন্যাস থেকে।

যে সব প্রক্রিয়া জীবের জীবের ভৌগলিক বিন্যাসের নির্ধারক সেগুলোই পরিবেশের সঙ্গে জীবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার (Interaction) জন্য দায়ী। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : (ক) প্রাকৃতিক নির্বাচন (খ) বিভিন্ন প্রজাতির ভৌগলিক অবস্থান পরিবর্তনের ধরন (গ) নতুন নতুন জেনেটিক মিউটেশনের উদ্ভব। (ঘ) ডিএনএ বা বংশগতির পরিবর্তন, যা কোন একটি নতুন পরিবেশে কোন একটি প্রজাতির টিকে থাকার উপযোগিতা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেয়। বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান তাই পরিবেশ সংরক্ষণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। জীববিজ্ঞানের এ দুটি শাখা একে অপরের বিকাশে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কারণ একই মৌলিক প্রশ্ন এবং সমস্যার সমাধানে কাজ করে চলেছে এই দুটি শাখা ।

কৃষির ক্ষেত্রে মানুষ যে পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছে তার সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত জৈববিবর্তন। উনিশ শতক থেকেই উদ্ভিদজ ফসল এবং পশুপালনসহ অন্যান্য প্রাণীজ পণ্য উৎপাদনে 'কৃত্রিম নির্বাচন'কে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো শুরু হয়েছিলো। আসলে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' কথাটি ডারউইন ব্যবহার করা শুরু করেন উদ্ভিদ এবং প্রাণির কৃত্রিম প্রজননকারীদের ব্যবহৃত 'কৃত্রিম নির্বাচন' কথাটির সাথে মিলিয়ে। কৃষি ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ যে নতুন নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করছে, সেখানেও ব্যবহৃত হচ্ছে জৈববিবর্তনের প্রক্রিয়া। এখানে মানুষ 'প্রাকৃতিক নির্বাচকে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। শুধু তাই নয় কৃষিকে উন্নত এবং বহুমাত্রিক করতে গিয়ে মানুষ ক্রমান্বয়ে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। এর ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণির বহু প্রজাতি টিকে থাকার (বিবর্তনিক) সংকটে পড়ে। ফলে ঐ সব এলাকা

থেকে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয় বা টিকে থাকার পয়োজনে তারা বিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনগুলো যেহেতু বিবর্তনিক প্রক্রিয়া, কৃষির উন্নতি এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাবকে সম্যকভাবে বোঝার জন্য এবং একটি পরিবেশ-উপযোগী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে জৈববিবর্তনের জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

গত বিশ বছরের বেশি সময় ধরে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি শাখাকে বলা হচ্ছে এভোলিউশনারি মেডিসিন বা বিবর্তনমূলক চিকিৎসা বিজ্ঞান। অন্য যে কোন প্রাণির মত মানুষ প্রকৃতির মধ্যেই বাস করে এবং জৈবপ্রকৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে। অন্যান্য প্রাণির ক্ষেত্রে যে প্রাকৃতিক নিয়ম এমনকি প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল মানুষও তার আওতার বাইরে নয়। একুশ শতকে মানুষের সম্পূর্ণ জিনোম (বংশগতির বিস্ত পরিচয়) আবিষ্কারের পর দেখা গেছে শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের জিনোমের মিল প্রায় শতকরা ৯৮.৬ ভাগ; অর্থাৎ গরিলা বা অন্যান্য এপদের চেয়েও শিম্পাঞ্জির সাথে মানুষের বংশগতির সাদৃশ্য বেশি। বিবর্তন বৃক্ষে কাছাকাছি প্রাণীদের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ মানুষের শারীরতত্ত্ব এবং রোগতত্ত্বের বোধের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিবর্তনমূলক জীববিজ্ঞান বিশেষত যেসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে তার মধ্যে রয়েছে কোন একটি রোগের মূল উৎস এবং উৎপত্তির কারণ, কেন এক ধরনের রোগ কোন একটি প্রজাতিকে বেশি আক্রান্ত করে, বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায়। মানুষের শারীরতাত্ত্বিক (Physiological) অনেক প্রবণতাকে বোঝার ক্ষেত্রে জীববিজ্ঞানীরা নির্ভর করছেন জৈববিবর্তনের জ্ঞানের উপর। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্লিনিক্যাল এবং অন্যান্য প্রায়োগিক অংশও মূলত দাঁড়িয়ে আছে শারীরতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। ক্লিনিক্যাল বিজ্ঞানসমূহের অনেক সিদ্ধান্ত জৈববিবর্তনের জ্ঞান দ্বারা নির্ধারিত হয়।

নৃতত্ত্বের প্রধান একটি ধারা হচ্ছে ভৌত নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology) যা মানুষের উৎপত্তি, বংশগতি, অভিযোজন ক্ষমতা (Adaptation) ছাড়াও অন্যান্য প্রাণীদের সাথে (বিশেষত প্রাইমেট) মানুষের তুলনামূলক আলোচনা করে থাকে। ভৌত নৃতত্ত্বে মানুষের এবং মানুষের পূর্বপুরুষের বিভিন্ন শারীরিক বৈশিষ্ট্য এবং জীবনাচরণের উৎপত্তি ও বিকাশের কারণসমূহকে প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং জৈববিবর্তনের অন্যান্য মূলনীতি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব এবং জৈববিবর্তন তত্ত্বের '*আধুনিক সংশ্লেষ*' (Modern Synthesis) তত্ত্বের অবির্ভাবের পর নৃতত্ত্ববিদগণ তাদের অনুসন্ধানের পক্ষে জীবজগত থেকে নতুন ধারার অনেক তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ করতে পারছেন যা এ বিষয়টিকে একটি নতুন মাত্রায় উপনীত করেছে। এ কারণেই অনেক নৃতত্ত্ববিদ ভৌত নৃতত্ত্বের পরিবর্তে বিষয়টির নতুন নামকরণ করেছেন জীবতাত্ত্বিক নৃতত্ত্ব (Biological Anthropology)।

ভৌত জগতের মত জীবজগতেও জটিলতা এবং আপাতদৃষ্টিতে 'নিখুঁত' 'উদ্দেশ্যমূলক' এবং 'পরিকল্পিত' নানান সংগঠন কী করে কোন পরিকল্পনা ছাড়াই *'প্রাকৃতিক নির্বাচনের'* মাধ্যমে বস্তুগতভাবে বিবর্তিত হতে পারে জৈববিবর্তনের তত্ত্ব সেটাই পমাণ করেছে। এটি বস্তুবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী অর্জন। এই তত্ত্ব জীবজগৎ তথা সমস্ত জগৎ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে পাল্টে দিয়েছে। জৈবিক মাত্রা রয়েছে এমন যে কোন কিছুকে গভীরভাবে বোঝার ক্ষেত্রে জৈববিবর্তনের তত্ত্ব অপরিহার্য। যেমন মানুষের আচরণ (Behaviour), লিঙ্গভিত্তিক দ্বিরূপতা (sexual dimorfism), খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি। অতএব আধুনিক বস্তুবাদী দর্শনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে 'জৈববিবর্তন তত্ত্ব'।

পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জৈববিবর্তনের জ্ঞান

বিশ্বব্যাপী পরিবেশের বিপর্যয় নিয়ে চিন্তিত আজ সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। পরিবেশ সংরক্ষণ অর্থাৎ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে এখন হুমকির মুখে অনেক প্রজাতির অস্তিত্ব। এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণ এবং বিপর্যস্ত প্রজাতিগুলোকে (endengoured species) সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা পাওয়া যায় জৈববিবর্তনের জ্ঞান থেকে। বিলুপ্তপ্রায় সব প্রজাতির ক্ষেত্রেই কোন একটি জনগোষ্ঠিতে সদস্য সংখ্যা বেশ কম হয়ে থাকে। আর সদস্য সংখ্যা কম হলে তাদের পক্ষে প্রকৃতিতে টিকে থাকা আরও কঠিন হয়ে পরে, কিন্তু কেন? বিলুপ্তপ্রায় সব প্রজাতির সংরক্ষণের প্রয়োজনে এই প্রশ্নের উত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। জৈববিবর্তনের জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি অন্ত-প্রজনন মন্দা (inbreeding depression) এবং প্রজাতির ঐ জনগোষ্ঠির জীবসমূহের মধ্যে বংশগত বৈচিত্রের ঘাটতি (low genetic variation) টিকে থাকার ক্ষেত্রে প্রধান হুমকি। জৈববিবর্তনের জ্ঞান থেকে আমরা জানি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বেশিরভাগ ক্ষতিকর ডমিনেন্ট জিন বা বংশগত বৈশিষ্টগুলো 'পরিত্যক্ত' হয় কিন্তু রিসেসিভ জিনগুলো থেকে যায়। অধিক মাত্রায় অন্তপ্রজনন ঘটলে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যৌন মিলন হয় ফলে রিসেসিভ জিনের বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হয় এবং ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্যের কারণে আক্রান্ত সত্তা (individual) টিকে থাকতে পারে না।

সুইডেনের গ্রামাঞ্চলে আধুনিক চাষাবাদের ব্যাপক প্রচলনের ফলে অ্যাডার জাতীয় সাপের বিচরণক্ষেত্রগুলো (habitat) বিভক্ত হয়ে যায়। সীমিত বিচরণক্ষেত্রে এদের জনগোষ্ঠীর আকার ছোট হয়ে পড়ে, ফলে দেখা দেয় অন্ত-প্রজনন মন্দা। অ্যাডার হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত প্রজাতি (endengoured species)। বিবর্তনের জ্ঞান থেকে অত্যন্ত সহজ উপায়ে সুইডিশ অ্যাডার সংরক্ষণ করা গিয়েছিল তা হল–অন্যান্য জনগোষ্ঠী থেকে অ্যাডার নিয়ে এসে এই জনগোষ্ঠীতে যুক্ত করা। কিন্তু অনেক বিপর্যস্ত প্রজাতির ক্ষেত্রে এই উপায়ে প্রজাতি সংরক্ষণ সম্ভবই হয় না কারণ তাদের অন্য কোন জনগোষ্ঠী থাকে না; যেমন হেয়ারি নোজ ওমবাট বা কিংবা কেম্পস রিডলি সামুদ্রিক কচ্ছপ ইত্যাদি। জৈববিবর্তনের তত্ত্ব বলে কোন প্রজাতির দীর্ঘমেয়াদী টিকে থাকা নির্ভর করে তার বিবর্তিত হওয়ার ক্ষমতা কতটুকু রয়েছে তার উপর। যে প্রজাতির জীবদের মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য যত বেশি তাদের বিবর্তিত হওয়ার এবং টিকে থাকার ক্ষমতাও তত বেশি। প্রজাতির একটি জনগোষ্ঠীতে যদি অনেক ধরনের বংশগত বৈশিষ্ট্য থাকে তাহলে নতুন কোন জীবাণুর আক্রমণ হলে বা কোন রাসায়নিক বস্তুর প্রাদুর্ভাব হলে ঐ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি ঐ প্রতিকূলতাকে সহ্য করতে পারে

(resistant) এমন বৈশিষ্ট্যের কিছুসংখ্যক জীব থাকে তাহলে প্রজাতিটির ঐ জনগোষ্ঠী বিবর্তিত হবে এবং টিকে থাকতে পারবে। অন্যদিকে ঐ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যদি ঐ প্রতিকূলতাকে সহ্য করতে পারে এমন বৈচিত্র্যের কেউ না থাকে তাহলে ঐ জনগোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কোন প্রজাতির একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্য কম বা বেশি থাকলে জৈববিবর্তনের নীতি অনুসারে এর টিকে থাকা সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করা সম্ভব; যেমন আফ্রিকার সাভানায় অবস্থানরত বিড়াল জাতীয় দুটি প্রজাতি চিতা এবং সিংহের মধ্যে চিতার বিলুপ্ত হবার সম্ভাবনা সিংহের চেয়ে বেশি। সিংহ টিকে থাকবে, তার শরীরের শক্তি বেশি বলে নয়, বরং তার জনগোষ্ঠীতে বংশগতির বৈচিত্র্য চিতার জনগোষ্ঠীর চেয়ে বেশি।

অর্থাৎ জৈববিবর্তন তত্ত্বের প্রয়োগ থেকে আমরা জানতে পারছি মানুষ সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করলেও সকল বিপর্যস্ প্রজাতিকে রক্ষা করতে পারবে না। আমাদের সীমিত শক্তি দিয়ে কোন প্রজাতিকে আমরা বাঁচাতে চেষ্টা করব, এবং কী প্রক্রিয়ায় তা করব, কোনটিকে বাঁচাতে চেষ্টা করব না–সে ব্যাপারেও আমাদের পথ দেখাবে জৈববিবর্তনের জ্ঞান। আমরা সেই জনগোষ্ঠীকেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাঁচাবো যেটিতে বংশগতির বৈচিত্র্য বেশি এবং আমরা সেই প্রতিবেশকে (habitat) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রক্ষা করার চেষ্টা করব যা অধিক জৈববৈচিত্রকে সংরক্ষণ করে।

কৃষি, কৃষি-প্রযুক্তি এবং জৈববিবর্তন

প্রাকৃতিক পরিবেশের মত কৃষি ক্ষেত্রেও জৈববৈচিত্র্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই জৈববিবর্তন তত্ত্ব শস্য, কৃষি এবং কৃষি-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও অত্যন্ গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪০ এর দশকে আয়ারল্যান্ডে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এর জনসংখ্যা এবং অর্থনীতিকে বিধ্বস্ করে দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষকে সবাই *আলু দুর্ভিক্ষ* বলে ডাকত; এ রকম নাম দেবার কারণ ব্যাপক হারে আলুর ফসল মন্দা হওয়ায় বহু মানুষ সে বছর না খেয়ে মারা যায় এবং অধিকাংশ মানুষকে বহুদিন অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়েছিল। এক সময় আয়ারল্যান্ড খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। উনিশ শতকের প্রথম দশক থেকে দেশটি আলুর উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য সমস্যার সমাধান করেছিল, বিশেষ করে লাম্পার (Lumper) নামের উচ্চফলনশীল একটি জাতের চাষ করে। যেহেতু লাম্পার ছিল ক্লোন করা একটি জাত, এর বীজগুলোর মধ্যে বংশগত বৈচিত্র্য ছিল অনেক কম । জৈববিবর্তন সম্পর্কিত জ্ঞান তেকে আমরা জানি, এরকম একটি জাত আবহাওয়া বা জলবায়ুর ক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন পরিবর্তন কিংবা পরিবেশ থেকে আগত অন্য কোন বিপদ (যেমন, নতুন কোন জীবাণুর আক্রমণ) মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারবে না। ফলে ১৮৪০ এর দশকে আয়ারল্যান্ডে জলবায়ুর পরিবর্তন হওয়াতে লাম্পারের ফলন ব্যাপকভাবে মার খায়।

জৈববিবর্তনের পাঠ থেকে আমরা জৈববৈচিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছি, কৃষি ক্ষেত্রেও ফসলের কোন টেকসই জাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের সেই মূলনীতিকেই মেনে চলতে হচ্ছে। এই মূলনীতিকে উপেক্ষা করে ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি মাত্র উচ্চফলনশীল ভুট্টার ক্লোন জাত চাষ করা হয়েছিল। নতুন এক জাতের ছত্রাকের আক্রমণ হওয়ায় এ সময় ব্যাপকভাবে ফসলহানি হয়। এতে ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি ডলারের বেশি। একই ধরনের ঘটনা ঘটে ১৯৮০'র দশকে ক্যালিফোর্নিয়ার আঙ্গুর চাষীদের ক্ষেত্রে।

বর্তমান যুগে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈবপ্রযুক্তি যা কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মার্কিন দেশে দেশিয় ভুট্টাকে (maize) ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে এমন একটি জাত তৈরি করার চেষ্টা চলছিল যেটি ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু এর জন্য উপযুক্ত কোন জিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। আসলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিজ্ঞানীরা নতুন কোন জিন (gene) তৈরি করেন না; প্রকৃতি থেকে উপযুক্ত কোন জিন নিয়ে কাঙ্ক্ষিত স্থানে স্থাপন করেন। উপযুক্ত জিন খুঁজে পাওয়ার জন্য তখন বিজ্ঞানীরা জৈববিবর্তনের তথ্যের সাহায্য নিয়েছিলেন। জীববিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন টিওসিন্ট (teosinte) নামের এক ধরনের বন্য আগাছা 'বিবর্তন বৃক্ষে' ঐ ভুট্টার খুব কাছাকাছি। আশা করা যাচ্ছিল টিওসিন্ট থেকেই একটা সমাধান পাওয়া যাবে। ১৯৭৭ সালে মেক্সিকোর জীববিজ্ঞানী র‍্যাফেল গুজম্যান টিওসিন্টের নতুন একটি প্রজাতির সন্ধান পান। এ প্রজাতির মধ্যেই পাওয়া যায় কাঙ্ক্ষিত ভাইরাস-প্রতিরোধী জিন। এই জিনগুলোকে ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ভুট্টার ভাইরাস-প্রতিরোধী জাত তৈরি করতে পেরেছেন।

কীটনাশকের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি অনুযায়ী পোকাটির 'কীটনাশক-পতিরোধী' নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। এই কীটনাশক-প্রতিরোধী জাত যাতে একছত্রভাবে ছড়িয়ে যেতে না পারে সে জন্য কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি অনুযায়ী রিফিউজ নামের এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। যে শস্যক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অংশে কীটনাশক দিলে কীটনাশক-প্রতিরোধী নতুন প্রজাতির কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তাদের এতটা প্রসার ঘটে যে ক্ষেতে পোকার সংখ্যা আগের মতই হয়ে যায়। কিন্তু যদি ক্ষেতের কিছু অংশ কীটনাশকমুক্ত রাখা হয়। তাতে কীটনাশক-প্রতিরোধী এবং কীটনাশক-সংবেদনশীল উভয় প্রকার পোকার মধ্যে আন্-প্রজাতি সংগ্রামের ফলে উভয় জাতের পোকার সংখ্যাই অত্যন্ সীমিত থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে জৈববিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতা

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূলনীতি (principle) অনুযায়ী আমরা জানি জীবের কোন একটি বৈশিষ্ট্যের উৎপত্তি তখনই ঘটে যখন তার টিকে থাকার ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যটির উপযোগিতা থকে। কিন্তু অসুস্থতার সময়ে বেশ কিছু শারীরবৃত্তিক ঘটনা ঘটে, যেগুলো কেন বিবর্তিত হল সে ব্যাপারে অনেকের মনেই প্রশ্ন রয়েছে; যেমন কাশি, বমি, ডায়রিয়া, শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এ ধরনের অস্বস্কির ব্যাপারগুলোর কোন উপযোগিতা না থাকলে এগুলোর উৎপত্তি হয়েছে কেন? দেখা গেছে শরীর থেকে ক্ষতিকর জীবাণু বের করে দেবার ক্ষেত্রে এসবের

উপযোগী ভূমিকা আছে। মানুষ যখন জীবাণ্ নাশ করার প্রযুক্তি অবিষ্কার করে নি সে সময়ে এ ধরনের শারীরবৃত্তীয় বিষয়গুলো টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল বলে এগুলো প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে সন্তান ধারণ করার পর প্রথম তিন মাসে (trimaster) কোন জীবাণুর সংক্রমণ ছাড়াই বমি এবং খাওয়ার অরুচি হয়। এই বৈশিষ্ট্যটি কেন বিবর্তিত হল সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আসলে গর্ভকালের প্রথম তিন মাসেই শিশুর-অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি (Organogenesis) হওয়ার সময়। এ সময়ে কোন ক্ষতিকর (teratogenic) রাসায়নিক বস্তু খেলে তা থেকে বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসম্পন্ন শিশুর জন্ম বা গর্ভপাত (miscarage) হয়ে যেতে পারে। মানুষ যখন সভ্য হয়নি, ক্ষতিকর রাসায়নিক বস্তু সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল না; তখন এই খাওয়ার অরুচিটাই ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছে। এ সময়ের গবেষণা থেকেও দেখা গেছে, যে সব মায়েদের গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে বমি এবং অরুচি বেশি হয় তাদের মধ্যে গর্ভপাতের হার কম।

বর্তমানকালে বিস্তার ঘটেছে এমন অনেক রোগ আছে যা অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রয়োজনে বিবর্তিত কোন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বর্তমান জীবনধারার সংঘাত থেকে জন্ম নিয়েছে। বর্তমান কালে অতিরিক্ত খাওয়া থেকে হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, বাত ব্যাথা এরকম অনেক ধরনের অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও বেশিরভাগ মানুষ বেশি বেশি খেয়ে চলছেন, কারণ এটি একটি শক্তিশালী জৈবিক প্রবণতা যা মস্তিষ্কের সুনির্দিষ্ট কেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বেশি খাওয়ার এই প্রবণতা মানুষের বর্তমান জীবন ধারায় ক্ষতিকর হলেও একসময় মানুষের টিকে থাকার জন্য এর প্রয়োজন ছিলো বলেই এটি প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছিল। সুদূর অতীতে মানুষ যখন অফ্রিকার সাভানায় কঠোর পরিশ্রম এবং সংগ্রামী জীবন যাপন করছিল তখন অথবা আরও আগে মানুষের যে জীবনধারা ছিল, সে সময় এ প্রবণতা ছিলো বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের মনস্তাত্বিক অনেক প্রবণতা এক সময় তার অস্তিত্বের প্রয়োজনেই বিবর্তিত হয়েছিল। বর্তমান যুগে সে সব প্রবণতার অতিরঞ্জন থেকে জন্ম নিচ্ছে বিভিন্ন রকম মনস্তাত্বিক বিপর্যয় এবং মানসিক রোগ ।

ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের 'জীবাণুনাশক প্রতিরোধক' হয়ে যাওয়ার ঘটনাগুলোও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূলনীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। তাই এই বিষয়গুলোকে মোকাবেলা করতে হলে জৈববির্বতন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। জৈববিবর্তনের জ্ঞান প্রয়োগ করে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কার্যকর নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এইডসের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও জৈববিবর্তনের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্সের সমস্যাকে কার্যকরভাবে সমাধান করা গেছে। বংশগত অনেক রোগের (যেমন হান্টিংটন্স কোরিয়া) গতিপ্রকৃতিকে বোঝা এবং এর সমস্যাগুলোকে সমাধানের ক্ষেত্রে জৈববিবর্তনের জ্ঞান অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

প্রয়োজন জৈববিবর্তনকে গভীরভাবে বোঝা

জৈববিবর্তনের জ্ঞান আমাদের জীব, জীবজগত এবং জৈবনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীরভাবে জানার সুযোগ দেয় এবং এসব ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ সব সমস্যার সমাধান করতে সহায়তা করে। পরিবেশের বিপর্যয় রোধ এবং বিপর্যস্ত প্রজাতি এবং তাদের বিচরণক্ষেত্রকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জৈববির্তনের জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আধুনিক কৃষি এবং কৃষি-প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বের প্রয়োগ এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পিক্লিনিক্যাল এবং ক্লিনিক্যাল সব ধরনের বিষয়ের গভীর বোধ তৈরি এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অনেকটা এগিয়ে এসেছে বিজ্ঞানের এই শাখা। এগুলোসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরও অনেক শাখাকে সমৃদ্ধ এবং পূর্ণ করেছে জৈববিবর্তনের তত্ত্ব। ভবিষ্যতে এই তত্ত্বকে নতুন নতুন ক্ষেত্রের অনেক নতুন সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করতে হবে। তাই মানুষের জীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ তত্ত্ব সম্পর্কে ভাসা ভাসা ধারণা নয় , গভীর এবং স্পষ্ট বোধ ছড়িয়ে দিতে হবে সর্বত্র।

তথ্যসূচি

1. Julian Huxley: *Evolution in Action*; Chatto & Windus, London, 1953, Preface pp vii.
2. Massimo Pigliucci: *Evolution's Importance to Society* An Action Bioscience.org original interview, http://www.actionbioscience.org/evolution/pigliucci.html
3. RANDOLPH M. NESSE: *Evolutionary Biology: A Basic Science For Psychiatry*, World Psychiatry. 2002 February; 1(1): 7–9.

জৈববিবর্তন তত্ত্বের আলোকে চিকিৎসাবিজ্ঞান

বিরঞ্জন রায়*

'জৈববিবর্তনের বোধ ব্যতীত জীববিজ্ঞানে কিছুই অর্থবহ নয়'—থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি

ভূমিকা

অসুখে কে না ভুগে? আমরা সবাই সম্ভাব্য রোগী। তাই তো প্রাচীন প্রাজ্ঞজন উচ্চারণ করেছেন, "শরীরম ব্যাধি মন্দিরম"। কিন্তু এমনটি কেন? প্রশ্নটি আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে এতটাই জড়িত যে, তার উত্তর অন্বেষণে মানুষ বাধ্য। মানুষেরা এ প্রশ্নের কি উত্তর পেয়েছে?

প্রথমেই আমরা এর একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা করব। তাতেই দেখা যাবে এ প্রশ্নে বর্তমান চিকিৎসাশাস্ত্রের অবস্থানটি কী। পরে আমরা আলোচনা করব জৈববিবর্তন তত্ত্বের আলো চিকিৎসাবিজ্ঞানকে পথ চলতে কিভাবে সাহায্য করছে।

রোগের নিদানের (etiology) ঐতিহাসিক সমীক্ষা

কবিগুরু বলেছিলেন ইতিহাস 'ভুবনে ভুবনে' 'গোপনে গোপনে' কাজ করে যায়। আমি তো দেখছি, ইতিহাস এ দেশের 'ভবনে ভবনে' 'বিজয় কেতনে'ই বর্তমান। আমাদের হেঁসেলে প্রস্তর যুগের যন্ত্র শিলনোড়ার সঙ্গে অত্যাধুনিক যন্ মাইক্রোওভেনের সহাবস্থান নিয়ে কি কখনো ভেবেছেন? আমাদের চিন্ার জগতে এ সহাবস্থান আরও প্রকট। তাই রোগের নিদানের ঐতিহাসিক সমীক্ষা এ দেশের এ সম্বন্ধীয় জনচেতনার বর্তমান সমীক্ষাও বটে।

কেন মানুষ অসুস্থ হয় এ প্রশ্নে আমাদের আদিম সর্বপ্রাণবাদী যাদুবিশ্বাসী পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস ছিল, শরীরে কোনো অশরীরি অপশক্তির ভর হলেই মানুষ অসুস্থ হয়। বিভিন্ন যাদুক্রিয়ায় (ঝাড় ফুঁক, কবজ-মাদুলী, শারীরিক নির্যাতন) মাধ্যমে এ অপশক্তিকে তাড়িয়েই মানুষকে রোগ মুক্ত করা সম্ভব। এসবের সর্বপ্রাচীন দলিলের অন্যতম অথর্ববেদ (আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ - ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। আমাদের বর্তমান সমাজে কি এ বিশ্বাসের কোনো কমতি আছে ?

* বিরঞ্জন রায় : পেশায় মনোরোগ চিকিৎসক। অধ্যয়নের বিষয়, প্রকৃতি ও মানুষ এবং বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে তার প্রতিফলন। সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যুক্ত। প্রকাশিত গ্রন্থ : *চেতনার বিজ্ঞান : সামাজিক চেতনার মনস্তত্ত্ব*, ২০১০, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা।

যাদুবিশ্বাস ক্রমে ধর্মতন্ত্রের রূপ নিলে মানুষের রোগের নিদান সম্পর্কে বিশ্বাসেও নতুন ধারণা যুক্ত হয়। তা হল রোগ হচ্ছে পাপের শাস্তি অথবা ঈশ্বরের বান্দাদের ঈমান পরীক্ষার উপায়। তাই পূজা, এবাদত, মানত, ধর্ণা এসবই রোগ মুক্তির উপায়। এ বিশ্বাসেও কি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের থেকে পিছিয়ে আছি ?

এসব বিশ্বাসে আপত স্বস্তি মিললেও রোগ মুক্তি মেলে না। তাই প্রাচীনকালেই রোগ নিদানের লৌকিক কারণের অনুসন্ধান এবং এসব নিরাময়ের চেষ্টাও শুরু হয়। এরই একটি চূড়ান্ত রূপ দেখি আয়ুর্বেদে (আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ); যা পাচীন ভারতের ফলিত বিজ্ঞানের সবচেয়ে বিকশিত শাখা। আয়ুর্বেদকারগণ চিকিৎসাকে 'দৈব ব্যাপাশ্রয়ী ভেষজ' এবং 'যুক্তি ব্যাপাশ্রয়ী ভেষজ'-এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে পড়ে অলৌকিক যাদুবিশ্বাস ও ধর্মতন্ত্রীয় বিশ্বাস এবং দ্বিতীয় ভাগে লৌকিক-যৌক্তিক বিশ্বাস।

আয়ুর্বেদের সমসাময়িক কালেই গেকো-রোমান সভ্যতায় চিকিৎসা শাস্ত্রের বিকাশ ঘটেছে হিপোক্রিটাস-গ্যালেন-এর হাত ধরে (আনুমানিক ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ-২০০ খ্রিস্টাব্দ)। মধ্যযুগে, যখন ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যা সমেত সব ধরনের জ্ঞানচর্চা স্মিত হয়ে যায়, তখন গ্রেকো-রোমান ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থসমূহকে আরবিতে অনুবাদ করে, চিকিৎসাশাস্ত্রকে বিকশিত করেন আরব (জাতিগত অর্থে নয়, ভাষাগত অর্থে) বিজ্ঞানীরা, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিজেতা মুসলমানদের দ্বারা ভারতে আনীত এ আরবীয় চিকিৎসাশাস্ত্র ভারতে 'ইউনানী' নামে পরিচিত হয়। এরপর দীর্ঘ দিন আয়ুর্বেদ ও ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র ভারতীয় উপমহাদেশে সহাবস্থান করেছে, কিন্তু এ দুয়ের তাৎপর্যপূর্ণ সংশ্লেষ কিংবা গুণগত উন্নয়ন ঘটেনি। কিন্তু রেনেসাঁ-রিফর্মেশন উত্তর ইউরোপ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পত্তন করে আরবীয় চিকিৎসা শাস্ত্রেরই ভিতের উপর, সপ্তদশ শতাব্দীতে। এর আগে, ইবনে সিনার চিকিৎসা গ্রন্থ 'কানুন' (আরবি শব্দটি থেকে ইংরেজি Canon শব্দটি জাত) ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে টেক্সটবুক হিসেবে পঠিত হয়েছে চারশ বৎসর!

প্রাচীন ভারত ও গ্রিসের পাশাপাশি প্রাচীন চীনেও (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে) চিকিৎসার বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছিল। আধুনিক চীন তাদের সে ঐতিহ্যকে নবায়িত করে চলেছে। এজন্য তারা গর্ব করার অধিকারী।

প্রাচীন এসব চিকিৎসা শাস্ত্রগুলোর কালিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এসবের সাধারণ লক্ষ্যণীয় ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যটি হলো এসবে মানুষকে মনোশারীরিক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে; মন ও শরীর এ দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয় নি।

ঠিক এর বিপরীত ঘটনাটি ঘটেছে পাশ্চাত্যে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বিকাশের সময়; এর একটি কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তখনও এমন বিকশিত হয়নি যে, মানসিক বিষয়সমূহকে এর আওতায় আনতে পারে। অন্য কারণটি প্রতাপশালী চার্চের সঙ্গে আপোষ–'তোমরা পবিত্র

আত্মা বা মন নিয়ে থাকো, আমরা অপবিত্র শরীর নিয়ে ঘাটাঘাটি করি, আমাদের ঘাটিও না।' শরীর-মন বিভাজনের দার্শনিক উদগাতা, আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের পথিকৃৎ রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০); যিনি একই সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পথিককৃৎও বটে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান শারীরিক রোগের প্রতি নজর দিল এবং এর বিশ্লেষণের ধারা শারীরিক রোগকে ক্রমে বিভিন্ন 'অঙ্গের বিকার' (Organic Pathology) এবং শেষ পর্যন্ত 'কোষের বিকার' হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চাইল। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত রোগতত্ত্ববিদ ভিরকো (Virchow) ঘোষণা করলেন : 'Pathology is the pathology of the cell'। কোষের কাজের নিয়ন্ত্রক বংশাণুর (Gene) আবিষ্কার বিশ্লেষণী ধারার পালে নতুন হাওয়া দিল। এবার তারা রোগকে বংশাণুর বিকার হিসেবেই বুঝে নিতে চাইলেন। দার্শনিক পরিভাষায় এটি Reductionist (খণ্ডতাবাদী) দৃষ্টিভঙ্গি। এ Reductionism (খণ্ডতাবাদ) চিকিৎসাবিজ্ঞানকে অনেক কিছুই উপহার দিয়েছে। তবে বংশাণুতে এসে খণ্ডতাবাদের দোলকটি তার চূড়ান্ত বিন্দু স্পর্শ করেছে। এবার উল্টো পথে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর নেই। দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ রোগই একক বংশাণুর কৃতি নয়; অনেক বংশাণুর মিথস্ক্রিয়ার ফলাফল। শুধু তাই নয়, বংশাণুর কার্যকারিতা পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং খণ্ডতাবাদের বিশ্লেষণকে সংশ্লেণ দ্বারা পরিপূরিত করা ছাড়া আর উপায় রইল না। অন্য দিকে দেখা গেল, অনেক শারীরিক রোগের কারণ মানসিক এবং মানসিক প্রক্রিয়ায় এসব সারিয়ে তোলা যায়। বিপরীতক্রমে অনেক মানসিক রোগের কারণ শারীরিক এবং শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের সারিয়ে তোলা যায়। এভাবে দীর্ঘদিনের মানসিক-শারীরিক এ অভেদ্য ভূতুরে দেয়ালটির অস্তিত্বও গেল উবে।

রোগের নিদান ও আরোগ্যের উপায় সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সীমিত গণ্ডিটির বাইরে গবেষণায় নামলেন সমাজবিজ্ঞানীরা এবং এসবের সামাজিক নিয়ামকগুলোকে চিহ্নিত করে চললেন। ক্রমেই দেখা গেল রোগের নিদানে, এর উপসর্গে এবং রোগের চিকিৎসায় শারীরিক মানসিক এবং সামাজিক এ তিন ধরণের নির্ণায়কই ক্রিয়াশীল। এ ধারণাটি Biopsychosocial Model of Dieases বা রোগের জৈব-মনো-সামাজিক মডেল নামে পরিচিত। এ দৃষ্টিভঙ্গিটিরই প্রতিফলন দেখি বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা প্রণীত স্বাস্থ্যের সংজ্ঞায় : "শুধুমাত্র অসুস্থতা বা বিকলতার অনুপস্থিতি নয়, পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সুস্থ অবস্থাই স্বাস্থ্য।" (Health is a state of complete physical mental and social well being and not merely an absence of disease or infirmity.)

এখানে গুরুত্বের সঙ্গেই একটি তথ্য উল্লেখ করা দরকার, আজও জনমানসে রোগের নিদান সম্পর্কে যেমন অতীতের ভূত, যাদু ও ধর্মতন্ত্রীয় বিশ্বাসের গভীর প্রভাব রয়ে গেছে; তেমনি চিকিৎসক মহলে রয়ে গেছে কার্তেসিও দেহমন বিভাজনের দুর্মোচ্য প্রভাব।

রোগের নিদানে জৈববিবর্তন তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিটি কি?

রোগের নিদান সম্পর্কিত বর্তমান মডেলটি (জৈব-মনো-সামাজিক মডেল) উত্তর দেয়, একটি রোগ কিভাবে হয়; অর্থাৎ এটি একটি রোগ হওয়ার সাক্ষাৎ প্রক্রিয়াটিকে বর্ণনা করে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, এ রোগটি আদৌ হয় কেন? কিংবা কেনইবা আমাদের শরীর এভাবে তৈরি যে তা 'ব্যাধির মন্দির'? নিদানতত্ত্বের সাক্ষাৎ ব্যাখ্যাটি এ প্রশ্নে নীরব। ধর্মতন্ত্রের মারফতিরা চট করেই উত্তরটি দিয়ে দিতে পারেন, 'এ ঈশ্বরের লীলা, তিনিই সর্প হয়ে দংশন করেন, ওঝা হয়ে ঝাড়েন।' মারফতিদের এ ধরনের বিশ্বাস প্রকৃত পক্ষে কোন উত্তর নয়; একটি রহস্যকে আরেকটি রহস্য দ্বারা আবৃত করে প্রশ্নশীল মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা মাত্র। এ ধরনের উত্তর রোগের নিদানে আমাদের জ্ঞানের এতটুকু বৃদ্ধি ঘটায় না। এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র জৈববিবর্তন তত্ত্বের আলোতেই।

জৈববিবর্তন তত্ত্ব বলে, জীবের বৈশিষ্ট্যগুলোর উদ্ভব ঘটে উদ্দেশ্যহীনভাবে। এর কারণ, জীবের বৈশিষ্ট্যাবলীর ভিত্তি বংশাণু কাঠামোর অনবরত উদ্দেশ্যহীন পরিবর্তন। এর পেছনে রয়েছে মূলত জেনেটিক মিউটেশন (বংশাণুর পরিব্যক্তি) এবং যৌনজনন প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত জেনেটিক রিকম্বিনেশন (বংশাণুর পুনর্যোজন)। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে যেসব বৈশিষ্ট্য বেশি উপযোগী, সেসব বৈশিষ্ট্যধারী জীবেরাই টিকে থাকে এবং বংশ বৃদ্ধি করে। পরিবেশ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। কাজেই বর্তমান পরিবেশ যে বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পন্ন জীবের উপযোগী তা পরিবর্তিত হলে, এ পরিবেশে খাপ খাওয়া জীবেরাই পরিবর্তিত পরিবেশের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। যদি বিদ্যমান জীবদের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যাবলীর উদ্ভব ঘটে যা পরিবর্তিত পরিবেশের উপযোগী, তবে তারা টিকে থাকে নতুবা লোপ পায়। নতুন নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্দেশ্যহীন উদ্ভব এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া—এভাবেই জীব জগৎ বিবর্তিত হয়ে চলেছে। এ কোন পরিকল্পিত প্রক্রিয়া নয়; অন্ধ প্রক্রিয়া। এ বিবর্তনে কোন জীবই তার অতীতের বৈশিষ্ট্যাবলী পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারে না; কাজ চালানোর মত পরিবর্তিত করে নিতে পারে মাত্র। কারণ এ ধরনের পরিবর্তনে অতীতের বৈশিষ্ট্যের কিছু লুপ্ত হয় এবং কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়। তাই কোন জীবই নিখুঁত নয়, স্থিতিশীল নয়। আমাদের রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটি এখানেই নিহিত। এবার কিছু বিশিষ্ট উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা যাক।

দু'পেয়ে হওয়ার খেসারত

নরবানর থেকে মানুষের বিবর্তনে মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধির দিকেই যখন জীববিজ্ঞানীরা তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন, তখন অপেশাদার কিন্তু একনিষ্ঠ বিজ্ঞান অধ্যয়নকারী ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫), মানব বিবর্তনে দুই পায়ে চলতে শিখে হাত দুটোকে দেহ বহনের দায় থেকে মুক্ত করে দেওয়াটাকে মস্তিষ্ক বিকাশের চেয়ে অগ্রগামী বলে বিবেচনা করেছিলেন, '*বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা*' নামক প্রবন্ধে। মার্কসবাদীদের কাছে প্রবন্ধটি গুরুত্ব পেলেও, একজন অপেশাদার ব্যক্তির এ লেখাটি জীববিজ্ঞানী মহলে হয় অজানা নয় উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। পরবর্তীতে আবিষ্কৃত জীবাশ্মগুলো (বিশেষত লুসি ও আর্ডি) এঙ্গেলসের প্রকল্পটিকে সত্য প্রমাণিত করেছে।

বিবর্তনের ধারায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রথম দুই পায়ে হাঁটতে শিখেছেন, মস্কিষ্কের বিকাশ হয়েছে পরে। আমাদের এ ঋজু দেহভঙ্গি যেমন কতক বিবর্তনগত সুবিধা দিয়েছে, তেমনি কতক বিবর্তনগত সমস্যারও কারণ হয়েছে। চার পায়ে চলার শরীর যখন দুই পায়ে চলার উপযোগী হলো তখন শরীরের সব অংশই এর উপযোগী রূপে বিবর্তিত হয় নি। তাই মানুষের মধ্যে দেখা দিল হার্নিয়া ও পাইলস রোগ। খাড়া অবস্থায় উদরস্থ অঙ্গসমূহের মাধ্যাকর্ষণজনিত ওজন সারা পেটে সমভাবে পড়ে না; পড়ে তলপেটের উপর। তাই তলপেটের দুর্বল অংশ দিয়ে অন্ত্রের কিছু অংশ পুটুলির মত বেড় হয়ে আসে–এটিই হার্নিয়া। খাড়া দেহভঙ্গির জন্যই পায়ু পথের শিরাগুলোয় রক্তের মাধ্যাকর্ষণজনিত ওজন বেশি পড়ে। এ জন্য এসব শিরা ফুলে গিয়ে সৃষ্টি করে পাইলসের। রোগ নিদানের জৈবমনোসামাজিক মডেল হার্নিয়া বা পাইলসের সাক্ষাৎ প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু মানুষদেরই কেন এসব রোগ হয়, তার ব্যাখ্যা দিতে পারে জৈববিবর্তনতত্ত্বই।

সভ্য হওয়ার খেসারত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ একদিকে সংক্রামক ব্যাধির মহামারিকে বাগে আনছে, অন্যদিকে বেড়ে যাচ্ছে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এসব নতুন ধরনের মহামারি। বিজ্ঞানীরা বলছেন এসব হচ্ছে মানুষের লাইফস্টাইল (জীবন শৈলী) পাল্টে যাওয়ার জন্য। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন, যান্ত্রিকীকরণ এবং অনুসঙ্গী বিচ্ছিন্নতায় মানুষের শারীরিক শ্রম যাচ্ছে কমে, বাড়ছে মানসিক শ্রম ও উদ্বেগ। খাদ্যাভাসে পরিবর্তনে ক্রমেই মানুষ অভ্যস্ হচ্ছে নুন-চিনি-তেল সমৃদ্ধ সহজপাচ্য মুখরোচক খাদ্যে। বেড়েছে ধূমপান, মদ্যপান এবং মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশগত দূষণ। উপরিউক্ত রোগগুলোর জন্য এসব পরিবর্তনই মূলত দায়ী। তাই বিজ্ঞানীরা এসবের নাম দিয়েছেন 'সভ্যতার রোগ'। এ নামটি বিবর্তনতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গিজাত। কারণ, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানুষের দেহ বিবর্তিত হয়েছে, উন্মুক্ত প্রান্তরে শিকারের পিছে ধাওয়া করে, মাটি খুঁড়ে মূল-কন্দ খুঁজে, গাছে চড়ে ফল খুঁজে। কঠোর শারীরিক শ্রম, গোষ্ঠীগত জোটবদ্ধতা, আকাঁড়া খাদ্য ভক্ষণ—এসবেই তার শরীর-মন অভিযোজিত। সভ্যতার দু'তিনশ বছর এর পরিবর্তীত পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তাই ডাক্তাররা পরামর্শ দিচ্ছেন, শারীরিক শ্রম করুন, টেনশন মুক্ত থাকুন, আকাঁড়া খাবার খান, নেশাদ্রব্য ছাড়ন। এসব দাওয়াই বিবর্তনতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গির ফসল নয় কি ?

দেব দানবের যুদ্ধ

পরজীবীদের বিরুদ্ধে এককোষী বা বহুকোষীদের সংগ্রাম, পরজীবীদের ও তাদের বাহকদের অস্তিত্বের সমসাময়িক এবং বিরতিহীন। এক্ষেত্রে পরজীবীরা এবং তাদের আশ্রয়রা কিভাবে অনবরত বিবর্তিত হয়েছে, জৈববিবর্তন গবেষণার এ এক চমৎকার বিষয়। আমরা মানুষ নামক বহুকোষীরাও এ দেব-দানব যুদ্ধের উত্তরসূরী। মানুষের উদ্ভবের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তার মধ্যে বংশানবীয় যেসব পরিবর্তন হয়েছে, এর অনেকগুলোই এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে। এসব যুদ্ধের প্রকৃতি, ভৌগলিক অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে, তাই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতার পার্থক্য রয়েছে।

রোগ-জীবাণুদের বিরুদ্ধে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংগ্রামও চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমবয়সী এবং অনিঃশেষ। তবে জীবাণুঘটিত রোগের কারণ জীবাণুর আবিষ্কার, ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা। সুতরাং জীবাণুদের বিরুদ্ধে মানুষের সচেতন সংগ্রাম মাত্র শতাব্দী কালের বিষয়। মানুষেরা যেমন এখন শুধুমাত্র বিবর্তনগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভর না করে জীবাণু বিরোধী বিভিন্ন ঔষধ আবিষ্কার করে চলেছে, জীবাণুরাও বসে নেই, তারাও ক্রমেই এসবের প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে।

এভাবে যুদ্ধ করে কি চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব? জৈববিবর্তন তত্ত্ব বলে, 'না'; কারণ জীবাণুরা আমাদের চেয়ে ঢের দ্রুত মরে, ফলে তাদের মধ্যে বিবর্তনের গতিও আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। কবিগুরু যেমন বলেন 'মরণ বলে আমি তোমার জীবন তরী বাই'। বিবর্তনবিদের ভাষাতেও 'মৃত্যুই অভিব্যক্তির পূর্বশর্ত'।

তাই বিবর্তনতত্ত্ব জীবাণুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যান্য পদ্ধতির নির্দেশনা দেয়। দুটি পদ্ধতি আগে থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে, যথা : টীকা দিয়ে বিশেষ জীবাণুদের বিরুদ্ধে আমাদের দৈহিক প্রতিরোধ শক্তিকে চাঙ্গা করে তোলা এবং সংক্রমণ কমিয়ে আনার বিভিন্ন উপায় খোঁজা। প্রকৃতপক্ষে, মহামারী রোধে এসব পদ্ধতি যে এন্টিবায়োটিকের চেয়েও বেশি ফলপ্রসূ, তা প্রমাণিত।

রোগজীবাণুদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ, আমাদের মধ্যে যে কোন জীবাণু সম্বন্ধেই একটি নেতিবাচক মনোভাব গড়ে তুলেছে। সাধারণ্যে এ ধারণাটি একেবারেই অপরিচিত যে এককোষী অণুজীবেরাই পৃথিবীতে আমাদের মতো বহুকোষী জীবের উদ্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে এবং আমাদের টিকে থাকার ভিত্তি যোগাচ্ছে। উপকারী অণুজীবদের তুলনায় অপকারী রোগজীবাণুদের সংখ্যা নগণ্য মাত্র। আমাদের দেহে যতসংখ্যক কোষ রয়েছে, এর দশগুণ অণুজীবের বাসস্থল আমাদের দেহ। এদের অনেকগুলো আমাদের উপকারী, অনেকগুলো নিরপেক্ষ, মাত্র কিছুসংখ্যক ক্ষতিকর। (কেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায় দেখ না !)

বিবর্তনতত্ত্বীয় দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে উপকারী পোকামাকড় দিয়ে অপকারী পোকামাকড় দমন করে কীটনাশকের ক্ষতিকর ব্যবহার কমিয়ে আনা যাচ্ছে। রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধেও বিজ্ঞানীরা এ পদ্ধতিটি কাজে লাগাতে চাচ্ছেন। আমাদের দেহে অপকারীদের চেয়ে উপকারী জীবণুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এন্টিবায়োটিক উপকারী-অপকারী নির্বিশেষে সব জীবাণুকেই ধ্বংস করে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় এন্টিবায়োটিকের প্রভাবে উপকারী জীবাণুদের সংখ্যা হ্রাস পেলে অপকারী জীবাণুদের পোয়াবারো হয়। তাই এখন বিজ্ঞানীরা অপকারীদের বিপরীতে

উপকারী জীবাণুদের বাড়িয়ে তোলার পদ্ধতি আবিষ্কার করছেন;। এন্টিবায়োটিকের স্থলে ‘প্রোবায়োটিক’ (Probiotic) ব্যবহারের চেষ্টা চলছে।

কোনটি রোগ, কোনটিই বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাড়াবাড়ি?

আধুনিক বহুতল ভবনে স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা কার্যকর থাকে। এ ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ভবনের বিভিন্ন স্থানে ধোঁয়া শনাক্তকারী যন্ত্র বসানো থাকে। এসবে ধোঁয়ার অস্তিত্ব ধরা পড়া মাত্রই অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাটি কার্যকর হয়, যাতে অগ্নিকাণ্ডের ক্ষয়ক্ষতি যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা যায়। যদিও এ ব্যবস্থায় খরচ অনেক, তবু তা এর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি থেকে আমাদের সুরক্ষা দেয়। কিন্তু এ ধোঁয়া শনাক্তকারী, আগুনের ধোঁয়া ও সিগারেটের ধোঁয়াকে আলাদা করতে পারে না। তাই কেউ যদি এর কাছে অসাবধানতাবশত সিগারেট ফুঁকে, তখন অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা কার্যকর হয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দেয়। এতে আগুন নেভানোর কাজে যে অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক খরচ হত, তাই হয়। এ ধরনের প্রতিক্রিয়াকে তাই বাড়াবাড়ি প্রতিক্রিয়া বলে চিহ্নিত করা যায়।

রোগ প্রতিরোধে আমাদের শারীরিক প্রতিক্রিয়াকেও অনেক সময় এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সাধারণ্যে যা ‘রোগ’ বলে পরিচিত, যথা ব্যথা, জ্বর, সর্দি-কাশি, বমি, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি, ডাক্তারের কাছে ‘রোগ’ নয়; ‘রোগের লক্ষণ’ মাত্র। তারা এসবের অন্তর্নিহিত কারণটিকে খুঁজে বের করে তার চিকিৎসা করতে চান। এ রোগ লক্ষণগুলোর কার্যপদ্ধতি (mechanism) চিকিৎসকদের জানা। কিন্তু সাধারণভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দেয় না, ‘কেন রোগলক্ষণগুলো মানব সমাজে সর্বব্যাপ্ত’। প্রকৃতপক্ষে শুধু মানবসমাজেই নয়, সব স্ন্যপায়ীদের মধ্যেই সর্বব্যাপ্ত। এর উত্তর দেয় জৈববিবর্তন তত্ত্ব। বিবর্তন তত্ত্ব মতে, ‘প্রাণীর কোনো বৈশিষ্ট্য, প্রাকৃতিক বা যৌন নির্বাচনে তার সহায়ক হলেই তা নির্বাচিত হয়।’ যে বৈশিষ্ট্যগুলো একটি শ্রেণীর সমস্ প্রাণীদের মধ্যে বিদ্যমান, সেগুলোর নিশ্চয়ই ইতিবাচক বিবর্তনগত ভূমিকা রয়েছে। এখন দেখা যাক, উপরিউক্ত রোগলক্ষণ সমূহের বিবর্তনগত ইতিবাচক ভূমিকাটি কি।

প্রথমেই আসা যাক ব্যথা প্রসঙ্গে। ব্যথাকে আমরা সবসময়ই নেতিবাচক ভাবতে অভ্যস্। কারণ ব্যথা সবসময় নেতিবাচক আবেগকে উদ্‌বুদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের জন্য ব্যথার ইতিবাচক ভূমিকা অপরিসীম। ব্যথাই আমাদেরকে শরীরের কোন অংশটি অসুবিধা বা ক্ষতির সম্মুখীন, সে সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। এতে আমরা সে অংশটিতে মনোযোগ দিতে পারি এবং ব্যথার কারণ দূর করতে সচেষ্ট হতে পারি। ব্যাপারটি যে সবসময় সচেতনভাবে ঘটে তা নয়, যেমন কারো পা মচকালে ব্যথা হয়, এই জন্য সে হাঁটতে পারে না। এভাবে ব্যথা প্রযুক্ত বাধ্যতামূলক বিশ্রাম, মচকানো পাটিকে সেরে উঠতে সাহায্য করে। রোগের কারণে কোনো অঙ্গে ব্যথার অনুভূতি লোপ পেলে, সহজেই সে অঙ্গ বিভিন্ন রকম (তাপ, চাপ, ঘষা, খোঁচা ইত্যাদি) ক্ষতির মুখে পড়ে।

জ্বরের কারণ বিবিধ, তবে বেশিরভাগ সময় জীবাণু সংক্রমণে জ্বর হয়ে থাকে। জ্বরের কারণে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে, সে উচ্চতাপমাত্রায় জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয়। এভাবে জ্বর সংক্রমণের বিরুদ্ধে শরীরকে কিছুটা প্রতিরক্ষা দেয়। সর্দি-কাশি শ্বাসতন্ত্র এবং বমি ও পাতলা পায়খানা পরিপাকতন্ত্র থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ বের করে দেয়। এভাবে এসবেরও একটি প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা রয়েছে। তবে, রোগলক্ষণের আলোচনার শুরুতেই যেমন আমরা ধোঁয়া শনাক্তকারীর অতি সংবেদনশিলতার কথাটি বলেছিলাম, যা কখনো উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে; উপরিউক্ত রোগলক্ষণগুলোর প্রসঙ্গেও এ কথা সত্য। মানুষের বেলায় এটি আরো বেশি সত্য, এ কারণে যে আমরা বুদ্ধিবলে রোগনিরাময়ের অনেক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি। তাই অনেক সময় রোগের চেয়ে রোগলক্ষণগুলো বেশি ক্ষতিকারক হলে, রোগলক্ষণের চিকিৎসাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। এভাবে জৈববিবর্তন তত্ত্ব আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে, কোনটি রোগ আর কোনটিই বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাড়াবাড়ি।

কোনটি মানসিক রোগ, কোনটিই বা মানসিক প্রতিক্রিয়া ?

উদ্বেগে, বিষণ্নতায় কে না ভোগে ? এসব মনের আবহাওয়া পরিবর্তনের মতই ব্যাপার। আবার উদ্বেগ-রোগ, বিষণ্নতা-রোগ বলে মানসিক রোগও রয়েছে। তবে উদ্বেগ-রোগ, বিষণ্নতা-রোগ এবং মনের এসব প্রতিক্রিয়া, এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যরেখা কোনটি ? আর রোগাক্রান্ত না হলেও আমরা উদ্বেগে, বিষণ্নতায় ভুগি কেন ?

শারীরিক রোগের মতো মানসিক রোগের ক্ষেত্রেও জৈব-মনো-সামাজিক নিদানতত্ত্ব রোগের নিদানের একটি সাক্ষাৎ ব্যাখ্যা আমাদেরকে দেয়। কিন্তু এসবের দূরবর্তী ব্যাখ্যার জন্য, কিংবা স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে রোগের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য, আমাদেরকে জৈববিবর্তন তত্ত্বের টর্চটিই ব্যবহার করতে হবে। উদ্বেগ ও বিষণ্নতা মানবসমাজে সর্বব্যাপ্ত। বিজ্ঞানীদের কাছে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে, মানুষের মতো অন্য স্ন্যপায়ীরাও উদ্বেগ ও বিষন্নতায় ভোগে। শারীরবিজ্ঞানী ইভান পেত্রভিচ পাভলভ (১৮৪৯-১৯৩৬) তার গবেষণাগারে কুকুরদের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে ‘উদ্বেগ রোগ’ সৃষ্টি করে, চিকিৎসার মাধ্যমে তা আবার সারিয়েও তোলেন। জৈববিবর্তন তত্ত্বের দৃষ্টিতে এ হেন সর্বব্যাপ্ত কোন প্রাণীজ বৈশিষ্ট্যের অবশ্যই কোন বিবর্তনগত উপযোগিতা রয়েছে। তাই উদ্বেগ ও বিষণ্নতাকে প্রথমে উপযোগিতার আলোকেই দেখা যাক, পরে এসবের অস্বাভাবিকতাকে বিবেচনা করা যাবে।

ব্যথা যেমন কোন শারীরিক ক্ষতি জানান দেয়, তেমনি উদ্বেগ কোনো ভবিষ্যৎ সমস্যা সম্বন্ধে আমাদেরকে সজাগ করে এবং এর মোকাবেলায় প্রস্তুত করে। স্বাভাবিকভাবে কোনো ধারাবাহিক কিংবা কষ্টকর কাজের জন্য কিছু উদ্বেগের প্রয়োজন। যে ছাত্রের পরীক্ষা সম্বন্ধে কোনো উদ্বেগ নেই, সে ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষার নিরস পড়া চালিয়ে যাবে কিভাবে ? তাই একটি সংকট মাত্রা পর্যন্ত উদ্বেগের মাত্রা বৃদ্ধি, সক্রিয়তার মাত্রাকেও বাড়ায়। কিন্তু এই সংকট মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেলে, উদ্বেগের লক্ষণগুলোই সক্রিয়তার বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

বিষণ্নতা কোনো ক্ষতি বা ব্যর্থতার মানসিক প্রতিক্রিয়া। এতে মনের সক্রিয়তার মাত্রা কমে যায়, মন নিজেকে গুটিয়ে নেয়। এভাবে মানুষ যে কাজে সাফল্য আসে না, সে কাজ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। সাময়িক নিষ্ক্রিয়তা তাকে অযথা শক্তি ব্যয় থেকে রক্ষা করে। স্ন্যপায়ীদের বিষণ্নতাকে, উভচর বা সরীসৃপদের শীতনিদ্রার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, একটি স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে উদ্বেগ ও বিষণ্নতার একটি অভিযোজনগত উপযোগিতা রয়েছে। জৈববিবর্তন তত্ত্বগত এই প্রত্যয়টি আমাদেরকে স্বাভাবিক উদ্বেগ ও বিষণ্নতা থেকে উদ্বেগ-রোগ ও বিষণ্নতা-রোগকে পৃথক করতে সাহায্য করে। উদ্বেগ ও বিষণ্নতার মাত্রা যখন সংকট মাত্রাকে অতিক্রম করে অনঅভিযোজী হয়, তখনই তা উদ্বেগ-রোগ কিংবা বিষণ্নতা-রোগ।

উদ্বেগ-রোগ ও বিষণ্নতা-রোগের স্নায়ু-শারীরবৃত্তীয়ভিত্তি হচ্ছে যথাক্রমে মস্কিষ্কের উদ্বেগ নিয়ন্ত্রক ও মেজাজ নিয়ন্ত্রক উপতন্ত্রের বিকলতায়। এসব বিকারগুলো ঘটে পরিবেশগত (সামাজিক ও প্রাকৃতিক) বিভিন্ন ঘটনা ঘটনের সঙ্গে মন ও মস্কিষ্কের মিথষ্ক্রিয়ায়।

একান্ মানবিক এক অসুখ

এবার আমি যে মানসিক রোগটির বর্ণনা দেব, কোন প্রাণীর মধ্যে এমন রোগের হদিস মেলে নি। রোগটির নাম যেমন খটমট, এর প্রকৃতিও তেমনি প্রহেলিকাময়। রোগটি সিজোফ্রেনিয়া (Schizophrenia)। বিচিত্র এর প্রকাশ। এর রোগলক্ষণের কিছু উদাহরণ দেয়া যাক।

- অমূল বিশ্বাস (Delusion) : যেমন, কোন কারণ ছাড়াই কারো অনড় বিশ্বাস জন্মালো, কেউ তার ক্ষতি করছে; কিংবা তার সঙ্গী (স্বামী বা স্ত্রী) অন্যের প্রতি আসক্ত; কিংবা কোন স্বল্প পরিচিত ব্যক্তি তার প্রেমে পড়েছে; কিংবা তার পেটে সাপের বাচ্চা হয়েছে ইত্যাদি।

- অমূল প্রত্যক্ষণ (Helucination) : যেমন, বাইরের কোন উদ্দীপনা (stimulus) ছাড়াই কেউ শুনতে পাচ্ছে, অন্যে তার নাম ধরে বা তাকে ইঙ্গিত করে কথা বলছে; কিংবা নিজের চিন্া গুলোই তার কানে বাজছে; কিংবা খাবারে বিষের গন্ধ পাচ্ছে; বা টের পাচ্ছে শরীরের ভিতরে পোকা হাঁটছে।

- চিন্ার বিশৃঙ্খলা : যেমন, ব্যাকরণের নিয়ম ছাড়া বাক্য বলা, যার অর্থ বোধগম্য নয়; কিংবা এমন শব্দ ব্যবহার করা যার অস্তিত্ব ভাষায় নেই। উদাহরণ হিসাবে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একজন সিজোফ্রেনিয়া আক্রান্ রোগীর একটি চিঠির কিয়দংশ হুবহু উদ্ধৃত করলাম :

= ওঁ = রাসেল =
ছোট্ট দা =
আমার-প্রণাম-নিস্=sama-is-সকল-God=An-প্রতি-একটা-মানুষ-শ্রীমত্-ভগবান=on-SMOSN=সোনার-তরী=নিজ-দেহ-মন=এক-নিষ্টা=সরল-সততা-An-ভিতরঙ্গ-বহিরাঙ্গ=নিয়ে=en-SMOSN-তুমি-ও-দাদা=আমার-কাছে-পৃথিবী-উজ্জ্বল, ভবিষ্যত=তাই-না ?

- শারীরিক নড়াচড়ার উদ্দেশ্যহীন পরিবর্তন : যেমন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেহুঁশের মতো শুয়ে থাকা, বা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে বা বসে থাকা, লক্ষ্যহীন দৌড় ঝাঁপ, চিৎকার ও ভাঙ্গচুর করা।

- সমাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়া, আবেগ অনুভূতি শূন্য হওয়া, নিজের শরীরের ন্যূনতম যত্ন না নেয়া।

সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মধ্যে উপরে বর্ণিত লক্ষণসমূহের যে কোন এক বা একাধিক লক্ষণ পাওয়া যায়। এহেন প্রহেলিকাময় মানবিক রোগটির নিদানের নির্দিষ্ট রূপরেখাটি আজও আমাদের অজানা। এটি যে রোগের জৈব-মনো-সামাজিক মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যাবে, তার অনেক প্রমাণ আমাদের রয়েছে। কিন্তু সেসব প্রমাণ সুনির্দিষ্টভাবে এর রূপরেখাটি অংকনের জন্য যথেষ্ট নয়। এবার দেখা যাক জৈববিবর্তন তত্ত্ব নিদান সন্ধানে আমাদের কোন পথ দেখায়।

সিজোফ্রেনিয়া প্রসঙ্গে কতগুলো তথ্য নিদান অনুসন্ধানের পথের ইঙ্গিত দেয়। এবার এ সবের বিস্তারিত করা যাক।

১. লিঙ্গ, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি নির্বিশেষে মানবসমাজে এর অস্তিত্ব রয়েছে, এবং সর্বত্রই এ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা জনসংখ্যার ১% এর মতো। এর মানে, এ রোগের একটি দৃঢ় জৈব ভিত্তি রয়েছে; এবং এটি রয়েছে অটোসোমে; অর্থাৎ লিঙ্গ নির্ধারক ক্রমোজোম জোড়া ছাড়া অন্য ক্রমোজমে।
২. এ রোগে আক্রান্ রোগীদের প্রায়শই বিয়ে হয় না বা বিয়ে টিকে না; টিকলেও সন্তান জন্মের হার কম। অর্থাৎ এ রোগের জন্য দায়ী বংশাণু একটি নয় একাধিক এবং এসব বংশাণু রোগাক্রান্তদের বাইরে অন্যরাও বহন করে। নতুবা এ রোগটির প্রকোপ ক্রমেই কমে আসতো কিংবা মানবসমাজ এ রোগ থেকে মুক্তি পেত। এমন হওয়াও সম্ভব, এর বংশাণুসমূহের বিশেষ ধরনের সমাবেশ এবং/বা প্রকাশই (expression) এ রোগের কারণ। নতুবা এসব বংশাণুর ভূমিকা সদর্থক।
৩. রোগটি যে একান্ই মানবিক তা শুরুতেই উল্লেখ করেছি। এ থেকে মনে হয়, মানুষের মস্কিষ্কের যেসব বৈশিষ্ট্য অন্য প্রাণী থেকে তাকে পৃথক করেছে, এসবের মধ্যেই হয়তো রোগটির নিদানের সন্ধান মিলবে। মানুষের মস্কিষ্কের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে অন্য প্রাণীদের

> মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর মৌলিক পার্থক্যটি প্রথম শনাক্ত করেন বিজ্ঞানী পাভলভ। তিনি দেখান, অন্য প্রাণীদের মস্তিষ্ক যেখানে শুধু প্রথম সংকেততন্ত্রের (First Signal System) অধিকারী, সেখানে মানুষের রয়েছে এর অতিরিক্ত একটি দ্বিতীয় সংকেততন্ত্র (Second Signal System)। প্রথম সংকেততন্ত্র বিভিন্ন প্রাকৃতিক উদ্দীপনাসমূহ প্রক্রিয়াজাত করে।। দ্বিতীয় সংকেত এসব প্রথম সংকেতের সংকেত। এটিই আমাদের ভাষা। পরবর্তীতে গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, আমাদের মস্তিষ্কে ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন উদ্দীপনাসমূহ প্রক্রিয়াজাত করার জন্য রয়েছে আলাদা দুটি তন্ত্র। অবশ্য তন্ত্র দুটি পরস্পর ক্রিয়াশীল। মানুষের মস্তিষ্কে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রটিই প্রাধান্যশীল।

নরবানর থেকে মানুষের বিবর্তনের প্রথম ধাপটি ছিল দুই পায়ে সোজা দাঁড়ানো। দ্বিতীয় ধাপটি মস্তিষ্কের বিকাশ এবং এতে দ্বিতীয় সংকেততন্ত্রের বিশেষায়ণ। তাই যে সমস্ত বংশাণু মস্তিষ্কের এসব পরিবর্তনের জন্য দায়ী, এসবের মধ্যেই সিজোফ্রেনিয়ার জন্য দায়ী বংশাণুসমূহ পাওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এভাবেই জৈববিবর্তন তত্ত্বের আলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের চলার পথকে আলোকিত করে।

উপসংহার

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে গবেষণা ও প্রয়োগের বিভিন্ন বিশেষায়িত শাখা গড়ে উঠছে, তৈরী হচ্ছেন এসব শাখার বিশেষজ্ঞগণ। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় মানুষ, তার জৈব-মনো-সামাজিক সত্তাসমেত অবিভাজ্যই রয়ে যাচ্ছে। তাই বিশেষজ্ঞের বিশেষ জ্ঞানকে সমগ্রের সাধারণ জ্ঞান দ্বারা পরিপূরিত করাটা জরুরি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানুষের উপর হস্তক্ষেপ (মন শরীর থেকে বংশাণবীয় গড়ন পর্যন্ত) করার ক্ষমতা যত বাড়ছে, এর প্রয়োজনও তত বাড়ছে। আমরা যেন চিকিৎসার কষ্টকে রোগে ভোগার কষ্টের চেয়ে বেশি না করে তুলি। আমরা অপারেশন সফল করতে গিয়ে যেন রোগীকেই মেরে না ফেলি। জৈববিবর্তন তত্ত্ব চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রে যেমন আলো দিচ্ছে, তেমনই চিকিৎসাবিজ্ঞানকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিগত কাঠামো যোগাচ্ছে; যাতে চিকিৎসাবিজ্ঞানী কিংবা চিকিৎসক হিসাবে আমরা দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি বিজ্ঞও হয়ে উঠি।

ফ্রেডরিক হয়েলের বোয়িং ৭৪৭

অভিজিৎ রায়*

ফ্রেড্রিক হয়েল (১৯১৫-২০০১) বিগত শতকের নামকরা এক জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী। আজকে যে আমরা মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে মহাবিস্ফোরণ বা বিগব্যাং-এর কথা শুনি, সেই 'বিগ ব্যাং' শব্দটি তার কাছ থেকেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিলো ১৯৪৯ সালে একটা রেডিও প্রোগ্রামে। যদিও বিগ ব্যাং শব্দটি তিনি তখন উচ্চারণ করেছিলেন অনেকটা সমালোচনা আর শ্লেষের সুরে। শ্লেষ থাকার কারণ সে সময় বিগ ব্যাং-এর সাথে সমানে পাল্লা দিচ্ছিলো হয়েলের 'স্থিতিশীল অবস্থা' (steady state) নামক নিজস্ব অনুকল্প। ১৯৬৪ সালে আর্নো পেনজিয়াস এবং রবার্ট উইলসন মহাজাগতিক পশ্চাদপট' বিকিরণ খুঁজে পাবার আগ পর্যন্ত

পৃথিবীর বহু পদার্থবিজ্ঞানী মহাবিশ্বের উৎপত্তি নিয়ে 'স্থিতিশীল অবস্থা' অনুকল্পের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। (বলাবাহুল্য বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তি সংক্রান্ত 'স্থিতিশীল অবস্থা' অনুকল্পটি পরিত্যক্ত হয়ে গেছে)। ফ্রেডরিক হয়েল যদিও স্থিতিশীল অবস্থা অনুকল্পের মূল প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত, তবে তার এই অনুকল্পের সাথে জড়িত ছিলেন আরো কয়েকজন নামকরা পদার্থবিদ, হারমান বন্দি, থমাস গোল্ড এবং পরবর্তীকালে এক ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী, নাম জয়ন্ত নারলিকর। স্থিতিশীল অবস্থা অনুকল্প ছাড়াও স্টেলার নিউক্লিওসিন্থেসিসসহ জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক কিছুতেই ফ্রেডরিক হয়েলের অবদান ছিলো। জীবনের শেষ বয়সে তিনি তার ছেলের সাথে মিলে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখায়ও হাত দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানে তার সামগ্রিক অবদানের জন্য তিনি 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন, পুরস্কার পেয়েছিলেন রয়েল এস্ট্রোনমিকাল সোসাইটি থেকে। এছাড়া অন্যান্য ছোটোখাট পুরস্কার তো আছেই। কাজেই ফ্রেডরিক হয়েলের সুনাম কম ছিলো না তার সময়ে।

কিন্তু বড় বিজ্ঞানী হলে কি হবে তিনি বিভিন্ন জায়গায় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে নিজের মতামত দিতে পছন্দ করতেন। এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিলো যখন বিজ্ঞানীরা বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে বেশ কটি থেরাপড ডায়নোসর এবং পাখির মধ্যবর্তী জীবাশ্ম আর্কিওপটেরিক্সের ফসিল খুঁজে পেয়েছিলেন। হয়েল হঠাৎ করেই বলে বসলেন আর্কিওপটেরিক্সের ফসিলগুলো নাকি সব জালিয়াতি। অথচ, আর্কিওপটেরিক্স ফসিল কিন্তু বিজ্ঞানীদের জন্য নতুন কিছু ছিলো না সেই সময়। আর্কিওপটেরিক্সের প্রথম পালকের ফসিল

---

* অভিজিৎ রায় : গবেষক ও বিজ্ঞান লেখক। মুক্তমনা ওয়েব সাইটের (www.mukto-mona.com) প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশিত গ্রন্থ : *আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী* (অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬), *মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে* (অবসর প্রকাশনী, ২০০৭), *সমকামিতা* (শুদ্ধস্বর, ২০১০)। সম্পাদনা : *স্বতন্ত্র ভাবনা* (চারিদিক প্রকাশনী, ২০০৮)।

খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো বহু আগেই, সেই ১৮৬০ সালে জার্মানির ব্যাভারিয়ার সলেনহোফেন অঞ্চলের চুনাপাথরের খনিতে। ডারউইন তার অরিজিন অব স্পিসিজ বইয়ের চতুর্থ সংস্করণে আর্কিওপটেরিক্সের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ডারউইনের অত্যন্ত কাছের বন্ধু, বিখ্যাত শারীরসংস্থানবিদ টিএইচ হাক্সলি তখন আর্কিওপটেরিক্সের ফসিল গবেষণা করে বলেছিলেন, মনে হচ্ছে আধুনিক পাখিগুলো সব থেরাপড ডায়নোসর থেকেই এসেছে আর আর্কিওপটেরিক্সের মত ফসিলগুলো এই যুক্তির পেছনে জোরালো প্রমাণ হিসেবে হাজির হয়েছে।[২] তারপর ১৮৬১ সালের দিকে জার্মানির ল্যাংগেনালথিমে পাওয়া গেল আর্কিওপটেরিক্সের পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল। একই পরিক্রমায় ১৮৭৭ সালে ব্লুমেনবার্গে, ১৮৫৫ সালে রিডিনবার্গে, ১৯৫৮ সালে ল্যাংগেনালথিমে, ১৯৫১ সালে ওয়ার্কারসজেলে, ১৯৬০ সালে জার্মানির ইৎসচাটে, ১৯৯১ সালে ল্যাংগেনালথিমে, ২০০৫ এবং ২০০৬ সালেও জার্মানি থেকে আর্কিওপটেরিক্সের বিভিন্ন ফসিল উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু ফসিলবিজ্ঞানী আর শারীরসংস্থানবিদ, জীববিজ্ঞানীরা অত্যন্ত কষ্ট করে ফসিল সংগ্রহ আর গবেষণা কাজ চালালে কি হবে বিজ্ঞানী হয়েল এবং তার সহকর্মী গণিতবিদ চন্দ্রবিক্রম সিংহ একসাথে মিলে ১৯৮৫ সালে তুমুল সোরগোল শুরু করলেন এই বলে যে, 'আর্কিওপটেরিক্সের ফসিলগুলো সব বানোয়াট'! তারা বললেন, ফসিলগুলো নাকি এত চমৎকারভাবে সংরক্ষিত থাকার কথা না, মধ্যবর্তী স্তরে নিশ্চয় আধুনিক পাখির পালক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, ইত্যাদি। ব্রিটিশ ন্যাচারাল হিস্ট্রি জাদুঘরের বিজ্ঞানীরা হয়েলের প্রতিটি সন্দেহ পরীক্ষা করে দেখলেন। তাদের পরীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত আর্কিওপটেরিক্সের ফসিলগুলোতে কোনো ভেজাল ছিল না। ওগুলো আসল ফসিল। এমনি একটি পরীক্ষায় অ্যালেন চ্যারিগসহ অন্যান্য জীববিজ্ঞানীরা যে জায়গা ফসিল উদ্ধার হয়েছিল, সেই জায়গার স্ল্যাবের কিনারাগুলোর মাপ নিয়ে দেখালেন আর্কিওপটেরিক্সের দুটি পাললিক শিলাস্তরের স্ল্যাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একে অপরের স্তরে খাপ খেয়ে যায়। ফলে মধ্যবর্তী স্তরে আধুনিক পাখির পালক থাকার ব্যাপার এখানে নেই। তাদের সম্পূর্ণ পরীক্ষার ফলাফল *সায়েন্স* জার্নালের ১৯৮৬ সালের ২৩২ সংখ্যায় 'আর্কিওপটেরিক্স কোনো জোচ্চুরি নয়' শিরোনামে প্রকাশিত হয়।[৩] হয়েল যখন আর্কিওপটেরিক্সের ফসিলের সত্যতা নিয়ে সোরগোল করছিলেন, ঠিক সেসময়ই জার্মানির সোলনহফেনে ১৯৮৭ সালে আরেকটি আর্কিওপটেরিক্সের ফসিল পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা সবাই মিলে পুরো প্রক্রিয়াটিকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পুনর্বার অবলোকন করার সুযোগ পান। কিভাবে পাখির পালকের ছাপ পাললিক শিলায় পড়ে, কিভাবে শিলাস্তরে চির ধরে সবকিছুই বিজ্ঞানীরা আরো একবার ভালমতো যাচাই করার সুযোগ পেয়ে যান। দেখা গেল আর্কিওপটেরিক্সের এই সোলনহফেন নমুনাটিও অন্যগুলোর মতই একই ফলাফল নিয়ে আসলো। এই আবিস্কারের ব্যাপারটিও সায়েন্স জার্নালে আর্কিওপটেরিক্সের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে আবির্ভূত হল[৪] আর আর্কিওপটেরিক্স নিয়ে হয়েলের যাবতীয় 'ষড়যন্ত্র তত্ত্বে'র সমাধি রচনা করলো।

আসলে অধ্যাপক হয়েল পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে সুপরিচিত হলেও জীববিজ্ঞান কিংবা প্রত্নজীববিজ্ঞানের খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন না। সত্যি বলতে জৈববিবর্তন কিংবা পাললিক শিলায় কিভাবে জীবাশ্মায়ন ঘটে, কিভাবে পালকের ছাপ স্ল্যাবে পড়ে এগুলো নিয়ে পরিস্কার জ্ঞান হয়েলের ছিলো না। কিন্তু এই অপরিচ্ছন্ন জ্ঞান নিয়েই বিশেষজ্ঞীয় এলাকায় সেঁদিয়ে গিয়েছিলেন, তর্ক করে ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন পোড় খাওয়া জীববিজ্ঞানীদের খুঁজে পাওয়া কষ্টার্জিত সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোকে। অল্পবিদ্যা কিভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত, নিজেকে খেলো করে তুলে হয়েলের দৃষ্টান্তই বড় প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে টিম বেড়া তার *ইভলুশন এন্ড দ্য মিথ অব ক্রিয়েশনিজম* বইয়ে চাঁছাছোলাভাবেই বলেছেন[৫] :

> একটি বিষয় পরিস্কার করে বলা দরকার যে, হয়েল এবং বিক্রমসিংহ, এদের কারোই জীববিজ্ঞান এবং জীবাশ্মবিদ্যা বিষয়ে কোনো প্রথাগত জ্ঞান ছিলো না, এবং তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের খুঁটিনাটি নিয়েও সম্যকভাবে অবগত ছিলেনা না। ফলে তারা জৈববিবর্তন-বিরোধী নানা চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এ সমস্ত অভিযোগ, তা যতই সারশূন্য আর মেধাশূন্য হোক না কেন, একটা সময় ক্রিয়েশনিস্টদের এক ধরনের স্বস্তি দিয়েছিল। ...হয়েলের উদ্দেশ্য ঠিক স্পষ্ট ছিলো না, কিন্তু তিনি একটি মুহূর্তের জন্যও নিজের বিশেষজ্ঞীয় ক্ষেত্রের মতো কোন প্রভাবশালী চ্যালেঞ্জ এখানে আনয়ণ করতে অসমর্থ হয়েছিলেন। এ ধরনের দাবি প্রমাণ করে, একজন বিজ্ঞানী কেমন খেলো হয়ে যেতে পারেন যখন তিনি এমন বিষয়ে অভিমত জানাতে শুরু করেন যেখানে তিনি কোনো বিশেষজ্ঞ নন।

অধ্যাপক টিম বেড়ার কথায় অত্যুক্তি নেই। হয়েলের অভিযোগ কিংবা বিশ্লেষণগুলোতে কোনো সারবত্তা না থাকলেও ক্রিয়েশনিস্টদের জন্য সেগুলো তখন ভাল রসদ যুগিয়েছিল। রক্ষণশীল ধর্মবাদীগোষ্ঠী বুঝে না-বুঝে হয়েলের ভুল অভিযোগগুলোই পুনরাবৃত্তি করে চললো। এখনো কিছু ক্ষেত্রে করে চলছে। তারা খোঁজ করে দেখারও চেষ্টা করেন নি হয়েলের ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো ন্যাচারাল হিস্ট্রি জাদুঘরের বিজ্ঞানীরা (যারা এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান রাখেন) ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সেই সময়েই।

হয়েল শুধু আর্কিওপটেরিক্স নিয়েই জল ঘোলা করেন নি, করেছিলেন আরো একটা বড় ব্যাপারে। যা নিয়ে রক্ষণশীল ধর্মীয়গোষ্ঠী এখনো যার পর নাই উচ্ছ্বসিত। হয়েল তার 'নিজস্ব গণনা' থেকে এক সময় সিদ্ধান্তে চলে এসেছিলেন, সরল অবস্থা থেকে উচ্চতর জটিল জীবের সৃষ্টি অনেকটা টর্নেডোর ঝড়ে জাঙ্ক ইয়ার্ডে পড়ে থাকা লোহার জঞ্জালের স্তুপ থেকে এক লহমায় বোয়িং ৭৪৭ বিমান তৈরি হয়ে যাওয়ার মত অবাস্তব! এই 'জঞ্জাল থেকে বোয়িং ৭৪৭ বিমান' তৈরি হবার উপমা হয়েল কোনো বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে লেখেননি। তবে শোনা যায় তিনি ১৯৮২ সালের একটি সেমিনারে প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্ত্বের বিপরীতে তার প্যান্সপারমিয়া অনুকল্পের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে একথা বলেছিলেন। ইস্টের সাথে বোয়িং ৭৪৭ এর তুলনা করার কারণ হিসেবে বলেছিলেন দুটোরই সমান সংখ্যক প্রত্যঙ্গ, এবং জটিলতার স্তরে বেশ মিল আছে।[৬] যাহোক ফ্রেড হয়েলের এই

যুক্তিমালা পরবর্তীতে *দ্যা ইন্টেলিজেন্ট ইউনিভার্স* নামের তার একটি বইয়ে সন্নিবেশিত হয়েছিল এভাবে[৭] :

> "ধরা যাক একটি জাঙ্ক ইয়ার্ডে বোয়িং ৭৪৭ বিমানের সকল অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হঠাৎ একটি ঘূর্ণিঝড় (whirlwind) এসে জাঙ্ক ইয়ার্ডের উপর দিয়ে বয়ে চলে গেলো। সেই ঘূর্ণিঝড়ে পুরো বোয়িং ৭৪৭ তৈরি হয়ে উড়ার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় চলে আসার সম্ভাবনা বা চান্স কতটুকু?"

ছবি : অধ্যাপক ধারণা করেছিলেন, সরল অবস্থা থেকে উচ্চতর জটিল জীবের উদ্ভব না-কী টর্নেডোর ঝড়ে জাঙ্কইয়ার্ডের (আবর্জনা) স্তুপ থেকে বোয়িং ৭৪৭ বিমান তৈরি হয়ে যাওয়ার মত অসম্ভব কিছু!

তারপর থেকেই ক্রিয়েশনিস্টরা বিভিন্ন সময় হয়েলের উপমাকে '*প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তনের বিরুদ্ধেএক মোক্ষম অস্ত্র*' হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন। শোনা যায় 'হয়েল ব্যক্তিগত জীবনে নাস্কি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সরল অবস্থা থেকে উচ্চতর জীবের উৎপত্তির সম্ভাবনা গণনা করতে গিয়ে দেখেন সেটার চান্স এতোই কম ($১০^{৪০০০০}$ ভাগের ১ ভাগ মাত্র) যে তাতে হয়েলের 'নাস্কিতা' টলে গিয়েছিল এবং হয়েল ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন! সে সময় তিনি ঘূর্ণিঝড়ে বোয়িং ৭৪৭ তৈরি হবার উপমা এনে দেখানোর চেষ্টা করেন, সরল অবস্থা থেকে জটিল জীবের উদ্ভব প্রায় অসম্ভব একটি বিষয়, এতে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ লাগবেই।' এই গুজবের পিছনে কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া না গেলেও সম্প্রতি বইপত্র ঘাঁটার ফলে একটা মজার বিষয় জানা গেছে। হয়েল সৃষ্টিবাদী বা ক্রিয়েশনিস্ট ছিলেন না। বরং তার অনেক প্রবন্ধ এবং বইপত্রে তিনি জৈববিবর্তন তত্ত্বের উপর প্রগাঢ় আস্থা ব্যক্ত করেছেন। যেমন তার *অরিজিন অব লাইফ ইন দ্য ইউনিভার্স* বইয়ে খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন[৮] :

> We are inescapably the result of a long heritage of learning, adaptation, mutation and evolution, the product of a history which predates our birth as a biological species and stretches back over many thousand millennia.... **Darwin's theory, which is now accepted without dissent, is the cornerstone of modern biology**. Our own links with the simplest forms of microbial life are well-nigh proven.

এমন কী তার জীবনের একেবারে শেষদিককার বইগুলোতেও তিনি (ঈশ্বর কর্তৃক মহাবিশ্ব সৃষ্টি প্রসঙ্গে) লিখেছিলেন, কোন প্রকৃত বিজ্ঞানী 'সৃষ্টিবাদে' বিশ্বাস করতে পারেন না।[৯] তারপরেও রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠী আর ক্রিয়েশনিস্টরা ফ্রেডরিক হয়েলের বোয়িং ৭৪৭ উপমা ব্যবহারে একেবারে সিদ্ধহস্ত। খ্রিস্টান ক্রিয়েশনিস্ট ছাড়াও তুরস্কের মুসলিম ক্রিয়েশনিস্ট হারুন ইয়াহিয়া, ভারতের জাকির নায়েক, হিন্দু মৌলবাদী গোষ্ঠী ইসকন তাদের মুখপত্র, বই, পত্রপত্রিকায় 'জৈববিবর্তন মিথ্যে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ' হিসেবে হয়েলের বক্তব্য প্রচার করছে। বোঝা যায়, আজকের বিজ্ঞানের যুগে কেবল ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টির বাণী প্রচার করেও কাজ হচ্ছে না রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাত পাততে হচ্ছে জৈববিবর্তনে আস্থাশীল এবং (সম্ভবত) 'নাস্কি' হয়েলের উপমার কাছে।

এই প্রবন্ধটি অবশ্য মোটেও হয়েলের আস্কিতা-নাস্কিতা, কিংবা সৃষ্টিবাদী নিয়ে লেখা নয়। বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়েলের আর্গুমেন্টগুলো যাচাই করে দেখা, সত্যই হয়েলের বোয়িং ৭৪৭ জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে কিনা। তবে আলোচনায় যাবার আগে, এইটুকু তথ্য জেনে নেয়া ভাল, বর্তমান কালের প্রায় সকল জীববিজ্ঞানীই জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে হয়েলের বোয়িং উপমা প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১০] তারা মনে করেন এই বোয়িং ৭৪৭ উপমা জৈববিবর্তনের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। কারণ :

১. জৈববিবর্তন টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়ের মত কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এটা কোনো দৈবাৎ প্রক্রিয়াও নয় যে কেবল 'চান্স' দিয়ে একে পরিমাপ এবং ব্যাখ্যা করতে হবে।

২. টর্নেডো দিয়ে চূড়ান্ত কোনো কিছু তৈরি করার চেষ্টা আসলে এক ধাপে ঘটা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো কিছু বানানোর চেষ্টা। আর অন্য দিকে জৈববিবর্তন ঘটে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বহু ধাপে। পরিমিত ভিন্নতার মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (Cumulative Selection)-এর মাধ্যমে।

৩. প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সরঞ্জাম (যেমন জাঙ্ক ইয়ার্ডে রাখা বিমানের বিভিন্ন অংশ) জোড়া লেগে লেগে কিন্তু বিবর্তন ঘটে না। বিবর্তন ঘটে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হওয়ার মাধ্যমে।

৪. বোয়িং বিমানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দ্রব্য থাকে স্থির। বোয়িং বিমান বানানোর পেছনে থাকে নক্সাকারীর একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। অপরদিকে বিবর্তন কিন্তু কোনো

ভবিষ্যতের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য রেখে কাজ করে না। চূড়ান্ত লক্ষ্যের ব্যাপারে থাকে একেবারেই উদাসীন।

প্রথম দুটি পয়েন্ট নিয়ে আরেকটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাক। অনেকেই ভেবে থাকেন প্রাথমিকভাবে মিউটেশনের ফলে জীবে ভ্যারিয়শনের উদ্ভব ঘটে আর মিউটেশন যেহেতু ইতস্ততঃ এবং বিক্ষিপ্তভাবে (randomly) ঘটে থাকে, জীবের বিবর্তন বোধহয় তাহলে কেবল চান্স বা সম্ভাবনার খেলা। আসলে কিন্তু তা নয় মোটেও। জীবের বিবর্তনের পেছনে মূল প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাপারটা কিন্তু কোনো চান্স নয়। প্রাথমিক মিউটেশনগুলো র‍্যান্ডম হতে পারে। কিন্তু তারপর ভ্যারিয়েশনগুলো ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটি মোটেও র‍্যান্ডম নয়, বরং ডিটারমিনিস্টিক। তা নির্ভর করে বিদ্যমান উপযুক্ত পরিবেশের উপর। সেজন্যই জীবের বিবর্তন কেবল চান্সের খেলা নয়।[১১] মিউটেশনগুলো র‍্যান্ডম হবার পরেও কিভাবে বিবর্তন প্রক্রিয়াকে একটি নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তা জানতে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েব সাইটে রাখা 'If Mutation is Random, Why Does Evolution Occur at All' প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে। (দ্রষ্টব্য : http://www.indiana.edu/~oso/evolution/selection.htm)। প্রবন্ধটিতে দুটি চমৎকার উদাহরণ উপস্থাপন করে দেখানো হয়েছে Mutation is random, but selection provided a direction to the evolution।

প্রসঙ্গক্রমে আমাদের চোখের উদ্ভব এবং বিকাশের বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে। আজকে আমরা চোখের যে গঠন দেখে বিস্মিত হই, তা কিন্তু একদিনে তা উদ্ভূত হয় নি। বরং বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা ছোট ছোট পরিবর্তনের ফলে বিকাশ লাভ করেছে। জীববিজ্ঞানীদের ধারণা আলোর প্রতি সংবেদনশীল এক ধরনের স্নায়বিক কোষ থেকে প্রথম চোখের উৎপত্তি শুরু হয়। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আজকে চোখ এই রূপ গ্রহণ করেছে। কতগুলো সংবেদনশীল কোষকে কাপের মত অবতলে যদি ঠিকমতভাবে সাজানো যায় তাহলে যে নতুন একটি আদি-চোখের উদ্ভব হয় তার পক্ষে আলোর দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে উঠে। এখন যদি কাপটির ধারগুলো কোনোভাবে বন্ধ করা যায়, তাহলে আধুনিক পিনহোল ক্যামেরার মতো চোখের উৎপত্তি ঘটবে। তারপরে এক সময় গতি নির্ধারণ করতে পারে এমন একটি অক্ষিপট বা রঙ বুঝতে পারে এমন কোণের মতো অংশ বিকাশ লাভ করে, তাহলে উন্নত একটি চোখের উদ্ভব হবে। এরপর যদি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইরিস ডায়াফ্রামের উৎপত্তি ঘটে তাহলে চোখের ভেতরে কতখানি আলো ঢুকবে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। এরপর আস্তে আস্তে যদি লেন্সের উদ্ভব ঘটে তা তাকে আলোর সমন্বয় এবং ফোকাস করতে সহায়তা করবে, আর এর ফলে চোখের উপযোগিতা আরো বাড়বে। এভাবেই সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উপযোগিতা নির্ধারণ করে চোখের ক্রমান্বয়িক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা এখনও আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাই, অনেক আদিম প্রাণীর মধ্যে এখনও বিভিন্ন রকমের এবং স্তরের আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়।

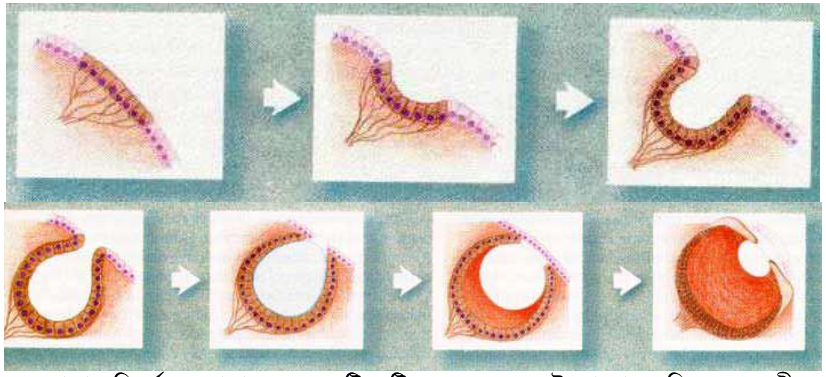

চিত্র : চোখের বিবর্তন। চোখের মত একটি জটিল প্রত্যঙ্গ সহজেই আলোর প্রতি সংবেদনশীল খুব সরল স্নায়বিক কোষ বিশিষ্ট 'আই স্পট' থেকে বিভিন্ন ধাপে ধাপে পরিমিত ভিন্নতার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে পারে। যখনই এ ধরনের কোনো পরিবর্তন, যা কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা প্রদান করে তা ধীরে ধীরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জনপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।

কিছু এককোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা করতে পারে। আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলি একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরা সদৃশ চোখ কিংবা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে (অন্ধ গুহা মাছ মেক্সিকান টেট্রা থেকে শুরু করে সালামানদরে, নটিলাস, প্লানারিয়াম, অ্যান্টার্কটিক ক্রিল, মৌমাছি, মানুষের চোখ ইত্যাদি) এবং তা দিয়ে চোখের বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিবর্তন প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে না ঘটলে আমরা প্রকৃতিতে এত বিভিন্ন ধরনের চোখের অস্তিত্ব পেতাম না। সম্প্রতি সুইডিশ অধ্যাপক ড্যান এরিক নিলসন এবং পেলগার তাদের গবেষণার ফলাফল জানিয়েছেন[১২], আদি সমতল পিগমেন্টেড আলোক সংবেদনশীল কোষ থেকে শুরু করে প্রায় ২০০০ ধাপের মধ্যে পরবর্তীতে মানুষের চোখের মতো জটিল যন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে। তাদের করা সিমুলেশনের সচিত্র ফলাফল নীচে দেয়া হল :

ছবি : অধ্যাপক ড্যান এরিক নিলসন এবং পেলগারের সিমুলেশনের ফলাফল। তারা দেখিয়েছেন আদি সমতল আলোক সংবেদনশীল কোষ থেকে শুরু করে ৪০০ ধাপ পরে তা রেটিনাল পিটের আকার ধারণ করে। ১০০০ ধাপ পরে আকার নেয় পিন হোল ক্যামেরার মত আকৃতির, আর ২০০০ ধাপ পরে অক্টোপাসের মত জটিল চোখের উদ্ভব ঘটে। জীববিজ্ঞানী মার্ক রিডলির ওয়েব সাইটে ব্যাপারটি এনিমেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে : http://www.blackwellpublishing.com/ridley/a-z/Evolution_of_the_eye_b.asp ।

এবার হয়েলের 'সরল অবস্থা থেকে উচ্চতর জীবের উৎপত্তির সম্ভাবনার' মারপ্যাঁচ নিয়ে একটু গভীরে যাওয়া যাক। হয়েলের 'জঞ্জাল থেকে বোয়িং ৭৪৭' উপমা খুব মৌলিক কিছু নয়। অসীম বানর তত্ত্ব[১৩] (Infinite monkey theorem) নামে একটা ব্যাপার দর্শনের আঙ্গিনায় আগে থেকে প্রচলিত ছিলো। হয়েল সেটাকে বোয়িং বিমানের মোড়কে মুড়ে কোষীয় প্রাণবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় ব্যবহার করতে চেয়েছেন।[১৪] অসীম বানর তত্ত্ব হচ্ছে এমন একটা ধারণা যেখানে মনে করা হয়, অফুরন্ত সময় দেয়া হলে আপাতদৃষ্টিতে প্রায় অসম্ভব সমস্ত ব্যাপারও ঘটে যেতে পারে সম্ভাবনার নিয়মেই। যেমন একটা বানরকে যদি টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দেয়া হয় তবে তার অন্ধভাবে টাইপিং করা থেকে শেক্সপিয়রের হ্যামলেট বেরিয়ে আসলে আসতেও পারে, যদি বানরটিকে অফুরন্ত সময় দেয়া হয় টাইপিং চালিয়ে যাবার জন্য। হয়েল এই বানরের বিক্ষিপ্তভাবে টাইপ করে হ্যামলেট লেখার উপমাকেই প্রাকৃতিক উপায়ে জটিল জীবজগৎ তৈরির ব্যাখ্যায় নিয়ে গেছেন, কেবল পার্থক্য এই, তিনি শেক্সপিয়রের হ্যামলেটের বদলে ব্যবহার করেছেন বোয়িং ৭৪৭।

হয়েলের ধারণা সত্য হলে সরল অবস্থা হতে প্রাকৃতিকভাবে জটিল জীবজগতের উদ্ভব অনেকটা হঠাৎ লটারি জিতে কোটিপতি হওয়ার মতই একটা ব্যাপার যেন। কম সম্ভাবনার ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। অহরহই ঘটছে। ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ধ্বসে পড়ার পরও অনেক সময় দেখা যায় প্রায় 'অলৌকিকভাবে' ভগ্নস্তুপের নীচে কেউ বেঁচে আছেন। হাইতিতে বিশাল ভূমিকম্প হল কিছুদিন আগে, প্রায় পনেরো দিন, এমনকি ২৭ দিন পরেও জীবন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে।[১৫] নিউইয়র্ক টাইমস-এ একবার এক মহিলাকে নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল যিনি দুইবার নিউজার্সি লটারির টিকেট জিতেছিলেন। তারা এই লটারির জেতার সম্ভাবনা হিসেব করে দেখেছিলো ১৭ ট্রিলিয়নে ১ বার মাত্র। এত কম সম্ভাবনার ব্যাপারও ঘটছে। কাজেই সম্ভাবনার নিরিখেই প্রাণের উৎপত্তি এবং সর্বোপরি জটিল জীবজগতের উদ্ভব যত কম সম্ভাবনার ঘটনাই হোক না কেন, ঘটতে পারে।

কিন্তু জীববিজ্ঞানীদের কাছে স্রেফ সম্ভাবনার মারপ্যাঁচ থেকেও ভাল উত্তর আছে, প্রাণের উৎপত্তি এবং জীবের বিবর্তনের পেছনে। সেই উত্তরটি হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া মোটেই কোনো চান্সের খেলা নয়। এটি নন-র‍্যান্ডম ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া। *ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার* গ্রন্থে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স পরিস্কার করেই বলেন[১৬] :

> "প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা ডারউইনিয় জৈববিবর্তনকে এলোমেলো (random) মনে করা শুধু ভুলই নয়, চূড়ান্ত বিচারে অসত্য। এটা সত্যের পুরোপুরি বিপরীত। চান্স বিষয়টি ডারউইনিয় রেসিপিতে খুব ছোট একটা উপাদান, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বড় উপাদানটির নাম ক্রমবর্ধমান নির্বাচন, যা একেবারেই নন-র‍্যান্ডম।"

একটা উদাহরণ দেয়া যাক। আমাদের গ্যালাক্সিতে $১০^{১১}$ টি তারা আর $১০^{৬০}$ টি ইলেকট্রন আছে। দৈবাৎ এ ইলেকট্রনগুলো একত্রিত হয়ে আমাদের গ্যালাক্সি, কোটি কোটি তারা, আমাদের পৃথিবী এবং শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবী নামক গ্রহে উপযুক্ত পরিবেশে প্রথম জীবকোষটি গঠনের সম্ভাবনা কত? আমাদের গ্যালাক্সি এবং পৃথিবীর যে বয়স, তা কি ওই সম্ভাবনা সফল করার জন্য যথেষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুব কঠিন। কারণ এই সম্ভাবনা মাপতে গেলে যে হাজারটি চলক নিয়ে কাজ করতে হয়, তার অনেকগুলো সম্বন্ধে আমরা এখনও অনেক কিছু ঠিকমত জানি না। তারপরেও এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, হয়েলের মত শুধু চান্স দিয়ে পরিমাপ করে একধাপী সমাধান হাজির করলে সেটার সম্ভাবনা এতোই কম বেরুবে যে 'জঞ্জাল থেকে বোয়িং তৈরি' হবার মতোই শোনাবে; কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনকে গণনায় ধরলে সেটা আর হবে না। বিজ্ঞানী কেয়রেন্স-স্মিথ এমনি একটি কৃত্রিম উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি উপস্থাপন করেছিলেন ১৯৭০ সালেই। তিনি বলেছেন, ধরা যাক একটা বানরকে জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে এসে টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দেয়া হল। তারপর তার সামনে ডারউইনের '*প্রজাতির উৎপত্তি*' বইটি খুলে এর প্রথম বাক্যটি টাইপ করতে দেয়া হল। প্রথম বাক্যটি এরকম :

> When on board HMS Beagle, as a naturalist, I was much struck with certain facts in the distribution of the inhabitants of South America, and in the geological relations of the present to the past inhabitants of that continent.

এই লাইনটিতে ১৮২টি অক্ষর আছে। বানরটিকে বলা হল এই লাইনটি সঠিকভাবে কাগজে ফুটিয়ে তুলতে। বানর যেহেতু অক্ষর চিনে না, সেহেতু সে টাইপরাইটারের চাবিগুলো অন্ধভাবে টিপে যাবে। টিপতে টিপতে আকস্মিক একটি শব্দ সঠিকভাবে টাইপ হতেও পারে। কিন্তু একটা শব্দ টাইপ হলে চলবে না, পুরো বাক্যটি সঠিকভাবে যেমনি লেখা আছে, ঠিক তেমনি টাইপ হতে হবে। মানে শুধু সবগুলো শব্দ সঠিকভাবে টাইপ নয়, এর ধারাবাহিকতাও রাখতে হবে। এখন এই বানরটির এই বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করার সম্ভাবনা কত? কত বছরের মধ্যে অন্ত একবার হলেও বানরটি সঠিকভাবে বাক্যটি টাইপ করতে পারবে? সম্ভাবনার নিরিখে একটু বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক।

মনে করা যাক, টাইপরাইটারটিতে ৩০টি অক্ষর আছে এবং বানরটি প্রতি মিনিটে ৬০টি অক্ষর টাইপ করতে পারে। শব্দের মধ্যে ফাঁক-ফোকরগুলো আর বড় হাত-ছোট হাতের অক্ষরের পার্থক্য এই গণনায় না আনলেও, দেখা গেছে পুরো বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করতে সময় লাগবে $১০^{৮০}$ বছর, মানে প্রায় অনন্তকাল! কিন্তু যদি এমন হয়, একটি সঠিক শব্দ লেখা হবার সাথে সাথে সেটিকে আলাদা করে রাখা হয়, আর বাকি অক্ষরগুলো থেকে আবার নির্বাচন করা হয় বানরের সেই অন্ধ টাইপিং-এর মাধ্যমে, তবে কিন্তু সময় অনেক কম লাগবে, তারপরও ১৭০ বছরের কম নয়। কিন্তু যদি এই নির্বাচন শব্দের উপর না হয়ে অক্ষরের উপর হয়ে থাকে (অর্থাৎ সঠিক অক্ষরটি টাইপ হওয়ার সাথে সাথে এটিকে আলাদা করে রেখে দেয়া হয়); তবে সময় লাগবে মাত্র ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৩০ সেকেন্ড।

উপরের উদাহরণ থেকে বুঝা যায়, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে গণনায় ধরলে ব্যাপারগুলো আর 'অসম্ভব' থাকে না, বরং অনেক সহজ হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে পরীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ তারপরেও উপরের উদাহরণটির কিছু ত্রুটি রয়েছে। একে তো এ ধরনের প্রোগ্রাম খুব সরল, তার উপর সঠিক বাক্য বা অক্ষর নির্বাচিত হবার সাথে সাথে সেটিকে আলাদা করে করে রাখা কিন্তু সেইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে প্রকাশ করে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন বিষয়টি কি? সহজ ভাষায় 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' টার্মকে ব্যাখ্যা করার জন্য নীচের তিনটি ধাপে প্রকাশ করা যায়[১৭] :

১. জনপুঞ্জের অধিবাসীরা নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করে (জীববিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'রেপ্লিকেশন')।
২. প্রতিলিপি করতে গিয়ে প্রতিলিপিগুলো হুবহু নিখুঁত হয় না, অনেক সময় পরিবর্তন হয়ে যায়। (জীববিজ্ঞানীরা একে বলেন মিউটেশন)।
৩. এই পরিবর্তনের কারণে প্রজন্মে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটে। (জীববিজ্ঞানীরা একে বলেন 'ভ্যারিয়েশন')।

এই রেপ্লিকেশন, মিউটেশন এবং ভ্যারিয়েশনের সমন্বয়ে যে নির্বাচন প্রক্রিয়া জীবজগতের জনপুঞ্জে যে পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাকে প্রাকতিক নির্বাচন নামে অভিহিত করা হয়। এই

ধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচনকে গণনায় ধরলে আমাদের উপরের সমস্যাটা কিভাবে সমাধান করতে হবে? করতে হবে মিউটেশন এবং রেপ্লিকেশনের বিষয়টি মাথায় রেখে, এবং সেখান থেকে শুরু করে।

বিক্ষিপ্ত মিউটেশন (random mutation) এবং প্রতিলিপির (replication) বিষয়টি মাথায় রেখে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স নিজে আশির দশকে একটি প্রোগ্রাম লেখেন প্রথমে জি ডাব্লিউ বেসিক ভাষায়, পরে প্যাস্কেলে, যাকে এখন অভিহিত করা হয় Weasel program নামে।[১৮] পরবর্তীতে তিনি প্রকাশ করেন তার বিখ্যাত 'ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার' বইয়ে। বানর দিয়ে পুরো হ্যামলেট না লিখে তিনি হ্যামলেট এবং পলোনিয়াসের মধ্যকার কথোপকথনের একটি উদ্ধৃতি 'METHINKS IT IS LIKE A WEASEL' সিমুলেশনের জন্য তার প্রোগ্রামে ব্যবহার করেন। তবে তিনি অন্ধভাবে টাইপরাইটার বা কিবোর্ড টেপা কোনো বানর ব্যবহার করেন নি। তার বদলে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তার এগারো মাস বয়সী কন্যাকে, কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে দিয়ে। তার কন্যাটি কম্পিউটারের কিবোর্ডে হাত রেখে টাইপ করেছিলো অর্থহীন কিছু অক্ষরমালা WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P। এই অক্ষরমালাকে প্রতি জেনারেশন বা প্রজন্মে প্রতিলিপি করতে দেন ডকিন্স। যেহেতু জীবজগতে প্রতিলিপিগুলো নিখুঁত হয় না, অনেক পরিবর্তন বা ভুল হয়ে যায় (অর্থাৎ মিউটেশন ঘটে) ডকিন্সও প্রতিলিপিতে কিছু মিউটেশন হবার সুযোগ করে দেন তার সিমুলেশনে। ফলে প্রতি প্রজন্মে একটি বা দুটি অক্ষর পরিবর্তিত হয়ে যাবার সুযোগ থাকতো। তিনি এভাবে সিমুলেশন করে এগিয়ে গিয়ে অনেকটা এ ধরনের ফলাফল পেলেন :

প্রজন্ম ০১ : WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P
প্রজন্ম ০২ : WDLTMNLT DTJBSWIRZREZLMQCO P
...
প্রজন্ম ১০ : MDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P
...
প্রজন্ম ২০ : MELDINLS IT ISWPRKE Z WECSEL
...
প্রজন্ম ৩০ : METHINGS IT ISWLIKE B WECSEL
...
প্রজন্ম ৪০ : METHINKS IT IS LIKE I WEASEL
...
প্রজন্ম ৪৩ : METHINKS IT IS LIKE A WEASEL

অর্থাৎ একেবারেই অর্থহীন কিছু অক্ষরমালা থেকে ৪৩ প্রজন্ম পরে তিনি METHINKS IT IS LIKE A WEASEL-এর মতো অর্থপূর্ণ বাক্যাংশ গঠিত হতে দেখলেন। ডকিন্স তার *ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার* বইয়ে বলেছেন, তিনি যখন প্রথমে বেসিক ভাষায় প্রোগ্রামটি লিখে

লাঞ্চের জন্য আধা ঘণ্টার বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখেন এর মধ্যেই METHINKS IT IS LIKE A WEASEL বেরিয়ে গিয়েছিলো। পরে তিনি একই প্রোগ্রাম প্যাস্কাল ব্যবহার করে লিখেছিলেন এবং তাতে সময় লেগেছিল মাত্র ১১ সেকেন্ড। ইন্টারনেটে ভিডিও দেখার ওয়েব সাইট ইউটিউবে ডকিন্সের সিমুলেশন সংক্রান্ত কিছু ভিডিও রাখা আছে। নীচের ওয়েব লিংকগুলো থেকে দুটি ভিডিও দেখতে পারেন : httpv://www.youtube.com/watch?v=OvEl1lOc0Iw এবং httpv://www.youtube.com/watch?v=AXxCsHGIxww। এখান থেকে ডকিন্সের সিমুলেশন সম্বন্ধে পাঠকেরা কিছুটা ধারণা পাবেন। এছাড়া ১৯৮৪ সালের দিকে গ্লেনডেল কলেজের রিচার্ড হার্ডিসন একই ধরনের স্বতন্ত্র একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে দেখান, এভাবে র‍্যান্ডমলি মিউটেশন ঘটতে দিয়ে শেক্সপিয়রের গোটা হ্যামলেট নাটকটি সাড়ে চার দিনে একেবারে অগোছালো অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা সম্ভব[১৯]।

তারপরেও রিচার্ড ডকিন্সের সিমুলেশনেরও কিছু সমালোচনা আছে। তার প্রোগ্রামও সরলতার দোষে দুষ্ট। এছাড়া তার প্রোগ্রাম একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য (long term goal) সামনে রেখে চালিত। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্যটি ডকিন্সই নির্বাচন করেছিলেন : METHINKS IT IS LIKE A WEASEL। জৈববিবর্তন কিন্তু এ ধরনের কোনো সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগোয় না। ডকিন্স নিজেই ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার বইয়ে তার প্রোগ্রামের এই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছিলেন এভাবে :

> Although the monkey/Shakespeare model is useful for explaining the distinction between single-step selection and cumulative selection, it is misleading in important ways. One of these is that, in each generation of selective 'breeding', the mutant 'progeny' phrases were judged according to the criterion of resemblance to a distant ideal target, the phrase METHINKS IT IS LIKE A WEASEL. Life isn't like that. Evolution has no long-term goal. There is no long-distance target, no final perfection to serve as a criterion for selection, although human vanity cherishes the absurd notion that our species is the final goal of evolution. In real life, the criterion for selection is always short-term, either simple survival or, more generally, reproductive success.

এরপরও ডকিন্সের এই উইসেল প্রোগ্রাম এই অর্থে গুরুত্বপূর্ণ, মিউটেশন এবং রেপ্লিকেশনের প্রভাবে প্রভাবে ঘটা ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে আপাতঃ অসম্ভব বলে মনে হওয়া ঘটনাও স্বাভাবিক নিয়মে ঘটতে পারে। সেজন্য তিনি তার বইয়ে বলেন :

> ক্রমবর্ধমান নির্বাচন জীবনের অস্তিত্বের সমস্ত আধুনিক ব্যাখ্যার চাবিকাঠি। এটা এক বিনি সুতার মালায় খুব সৌভাগ্যপ্রসূত ঘটনা 'বিক্ষিপ্ত মিউটেশনগুলো'কে গ্রন্থিত করে চলে অবিক্ষিপ্ত এক অনুক্রমে; ফলে অনুক্রমের শেষে এসে আমরা যখন চূড়ান্ত কাঠামোর দিকে তাকাই তখন আমাদের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রম তৈরি হয়। আমরা ভাবি এ ধরনের কাঠামো তৈরি হবার সম্ভাবনা এতোই কম যে, চান্সের মাধ্যমে এমনি একটি কাঠামো তৈরিতে যে সময় লাগবে তার তুলনায় সমগ্র মহাবিশ্বের বয়সও অতীব নগণ্য।

ডকিন্স পরবর্তিতে তার প্রোগ্রামটিকে আরো উন্নত করেন এবং METHINKS IT IS LIKE A WEASEL বাদ দিয়ে কোনো সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছাড়াই সিমুলেশন ঘটান। গাছ থেকে যেমন শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে, ঠিক সেভাবেই 'জিন নির্বাচনের' মাধ্যমে জৈববিবর্তনকে কম্পিউটারে চালিত করে সরল অবস্থা থেকে মাকড়শা কিংবা অক্টোপাসসদৃশ জটিল জীবজগতের কাঠামো তৈরি করে দেখান। তার সেই প্রোগ্রামের নাম দেন 'বায়োমর্ফ'। ইউটিউবে ডকিন্সের নিজস্ব প্রোগ্রাম 'বায়োমর্ফে'র ভিডিও রয়েছে : httpv://www.youtube.com/watch?v=4ThaHhIkYAc।

ডকিন্স তার পরবর্তী বই 'ক্লাইম্বিং মাউন্টেন্ট ইম্প্রোবেবল'-এ অন্য প্রোগ্রামারদের লেখা আরো কিছু জটিল প্রোগ্রামের কথা উল্লেখ করেন জীবের বিবর্তনের বাস্তবসম্মত মডেল তুলে ধরতে। এ ধরনের বহু মডেল ইন্টারনেটে বিজ্ঞানের উপর গবেষণালব্ধ বিভিন্ন ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।[২০] সম্প্রতি স্কেপ্টিকাল এনকুইরার পত্রিকায় গবেষক ডেভ থমাস তার 'War of Weasels: An Evolutionary Algorithm Beats Intelligent Design' প্রবন্ধে একটি আকর্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করেন।[২১] তিনি জানান ইন্টারনেটে কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল যেখানে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের এলগোরিদমের সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল জৈববিবর্তনের এলগোরিদমের। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের সমর্থক সালভেদর কর্দোভাসহ অনেকেই জৈববিবর্তনকে পরাজিত করতে শক্তিশালী এলগোরিদম হাজির করেছিলেন। কিন্তু এরপরও বিবর্তনীয় জিনেটিক এলগোরিদমের কাছে শোচনীয় পরাজয় ঘটে। এ প্রসঙ্গে ডেভ থমাস তার প্রবন্ধে বলেছেন : The results were stunning: The official representative of intelligent design community was outperformed by evolutionary algorithm, thus learning Orgel's Second Law - "Evolution is smarter than you are" - the hard way.

এ গাণিতিক সিমুলেশনের সবগুলোই আমাদের খুব পরিস্কারভাবে দেখিয়েছে নন-র‍্যান্ডম প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে জটিল জীবজগতের উদ্ভব ঘটতে পারে, কোনো ধরনের ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই। মূলত অধ্যাপক হয়েল 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রক্রিয়াটি ঠিকমত বোঝেন নি বলেই তিনি জটিল জীবজগতের উদ্ভবকে কেবল চান্স দিয়ে পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন এবং একে বোয়িং ৭৪৭ উপমার সাথে তুলনা করেছিলেন। এমনকি হয়েলের চান্সের গণনাও প্রশ্নবিদ্ধ। টক অরিজিন ওয়েব সাইটে ড. ইয়ান মাসগ্রেভ 'Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis Calculations' প্রবন্ধে হয়েলের অজৈবজনি

(Abiogenesis) সংক্রান্ত গণনার নানা ভুলভ্রান্তির প্রতি নির্দেশ করেছেন।[২২] একটি ভ্রান্তি হচ্ছে হয়েল সম্ভাবনা পরিমাপের সময় প্রতিটি ঘটনাকে একটির পরে একটি, এভাবে সিরিজ বা অনুক্রম আকারে সাজিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির সিমুলেশনগুলো এভাবে সিরিজ আকারে ঘটে নি, অনেকগুলোই ঘটেছে সমান্তরালভাবে। ফলে সময় লেগেছে অনেক কম। আপনার চারজন বন্ধুক চারটি মুদ্রা হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঝোঁকমুক্তভাবে নিক্ষেপের সুযোগ দিলে, চারটি HHHH পেতে যে সময় লাগবে, সেই একই ফলাফল (অর্থাৎ চারটি HHHH) পেতে আপনার ষোলজন বন্ধুকে দিলে অনেক তাড়াতাড়িই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বেরিয়ে আসবে। ঠিক একইভাবে একটি বানর দিয়ে পুরো হ্যামলেট পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম মনে হলেও যদি এক লক্ষ বানরকে একই কাজে লাগিয়ে দেয়া যায় তবে আর সেরকম অসম্ভব কিছু মনে হবে না। সেজন্য ইয়ান মাসগ্রেভ তার প্রবন্ধে যথার্থ বলেছেন, 'যদি এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনার কোন কিছু ঘটিয়ে দেখাতে চান, তাহলে চীনের জনসংখ্যার মত চলক নিযুক্ত করে দিন।' ডকিন্সের মত ইয়ান মাসগ্রেভও মনে করেন, ক্রিয়েশনিস্টদের বোয়িং উপমার সাথে জৈববিবর্তন প্রক্রিয়ার পার্থক্য মূলত এই জায়গাতেই।

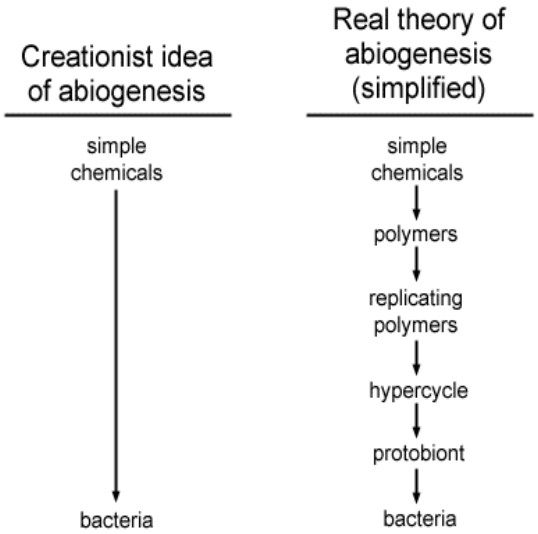

ছবি : অধ্যাপক হয়েল ভেবেছিলেন কতগুলো রাসায়নিক পদার্থ মিলেমিশে হঠাৎ করেই ব্যাকটেরিয়ার মত জটিল জীবের উদ্ভব হওয়াটাই অজৈবজনি (Abiogenesis)। কিন্তু সত্যিকারভাবে অজৈবজনি কখনোই এক ধাপে ঘটে না, বরং এটি বিভিন্ন ছোট ছোট ধাপের সম্মিলিত প্রক্রিয়ার ফসল।

প্রথম জীবকোষ স্রেফ দৈব-প্রক্রিয়ায় বা চান্সের মাধ্যমে তৈরি হয় নি। প্রথম জীবকোষ তৈরি হয়েছে ধাপে ধাপে। বিজ্ঞানী ওপারিন[২৩] আর হালডেন[২৪] তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন, সাড়ে চারশ কোটি বছর আগেকার পৃথিবী কোনো দিক দিয়েই আজকের পৃথিবীর মত ছিল না। তাদের মতে, আদিম বিজারকীয় পরিবেশে একটা সময় এসব গ্যাসের উপর উচ্চশক্তির বিকিরণের প্রভাবে নানা ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হয়। এগুলো পরবর্তীতে নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে আরো জটিল জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে। এগুলো থেকেই পরবর্তীতে ঝিল্লি তৈরী হয়। ঝিল্লিবদ্ধ এসব জৈব পদার্থ বা প্রোটিনয়েড ক্রমে ক্রমে এনজাইম ধারণ করতে থাকে আর বিপাক ক্রিয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এটি এক সময় এর মধ্যকার বংশগতির সংকেত দিয়ে নিজের প্রতিলিপি তৈরি করতে ও মিটেশন ঘটাতে সক্ষম হয়। এভাবেই একটা সময় তৈরি হয় প্রথম আদি ও সরল জীবন। ওপারিন এবং হালডেন তত্ত্বের বহু স্রই পরবর্তী গবেষকদের পরীক্ষালব্ধ গবেষণায় (Urey–Miller 1953,[25] 1959,[26] Fox 1960,[27] Fox and Dose 1977,[28] Cairn-Smith 1985,[29] de Duve 1995,[30] Russell and Hall 1997,[31] Wächtershäuser 2000,[32] Smith et al. 1999,[33] Huber et al. 2003,[34] ইত্যাদি) সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আদি জীবকোষ তৈরির পেছনে যে ধাপগুলোকে ইতোমধ্যে সনাক্ত করেছেন সেগুলো হল :

ধাপ-১ : জৈব যৌগের উৎপত্তি

- হাইড্রোকার্বন উৎপাদন (মুক্ত পরমাণুগুচ্ছ CH এবং CH_2-এর বিক্রিয়া, বাস্পের সাথে মেটালিক কার্বাইডের বিক্রিয়া)
- হাইড্রোকার্বনের অক্সি ও হাইড্রক্সি-উপজাতের উৎপাদন (বাষ্প ও হাইড্রোকার্বনের বিক্রিয়ায় এলডিহাইড, কিটোন উৎপাদন)
- কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন (গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ আর ঘণীভবনের ফলে চিনি, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন) ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের উৎপত্তি (ফ্যাট বা চর্বির ঘণীভবন)
- অ্যামিনো এসিড গঠন (হাইড্রোকার্বন, অ্যামোনিয়া আর পানির বিক্রিয়া)

ধাপ-২ : জটিল জৈব অণুর উৎপত্তি (পলিমার গঠন)

- প্রোটিনয়েড মাইক্রোস্ফিয়ার
- কো-এসারভেট

ধাপ-৩ : পলিনিউক্লিয়োটাইড বা নিউক্লিক এসিড গঠন

ধাপ-৪ : নিউক্লিয়োপ্রোটিন গঠন

ধাপ-৫ : আদি কোষ বা ইউবায়োন্ট গঠন (কো-এসারভেটের ভিতরে নিউক্লিয়োপ্রোটিন আর অন্যান্য অণু একত্রিত হয়ে লিপোপ্রোটিন ঝিল্লি দিয়ে আবদ্ধ প্রথম কোষ; প্রথম জীবন)

ধাপ-৬ : শক্তির উৎস ও সরবরাহ (শক্তির সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেয়ায় প্রকৃতিতে টিকে রইল তারাই যারা প্রোটিনকে এনজাইমে রূপান্তরিত করে সরল উপাদান থেকে জটিল বস্তু তৈরী করতে পারত, আর সেসব দ্রব্য থেকে শক্তি নির্গত করতে পারত)

ধাপ-৭ : অক্সিজেন বিপ্লব (অক্সিজেনহীন বিজারকীয় আবহাওয়া অক্সিজেনময় জারকীয় আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হল। আজ থেকে দু'শ কোটি বছর আগে)

ধাপ-৮ : প্রকৃতকোষী জীবের উৎপত্তি (প্রোক্যারিওট থেকে ইউক্যারিওট)

ধাপ-৯ : জৈববিবর্তন বা বায়োজেনেসিস (জীব থেকে জীবে বিবর্তন)

এরপরেও সত্য বলতে দ্বিধা নেই, বিজ্ঞানীরা এখনো এমন কোনো জীবকোষ গবেষণাগারে তৈরি করতে পারেন নি যা ফ্লাস্কের শরীর বেয়ে নেমে এসে আমাদের চমকে দেবে। এর একটি প্রধান কারণ 'সময়'। জীবকোষ উদ্ভবের পেছনে পৃথিবীতে বিবর্তন প্রক্রিয়া চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে। আর এই কোটি কোটি বছরে পৃথিবীর আবহাওয়াও বদলেছে বিস্তর, যেমন আদিম পরিবেশে মুক্ত-অক্সিজেন ছিল না। অক্সিজেনহীন বিজারকীয় আবহাওয়া অক্সিজেনময় জারকীয় আবহমণ্ডলে রূপান্তরিত হয় আজ থেকে দুই বিলিয়ন বছর আগে। আবার বর্তমান বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে আদিম পরিবেশের মত মিথেন ও এ্যামোনিয়া নেই। তার জায়গায় আছে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাইঅক্সাইড, আণবিক নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও প্রচুর আণবিক অক্সিজেন। এই কোটি বছরের সময়-প্রসার আবহমণ্ডলের পরিবর্তনকে গবেষণাগারের ফ্লাস্কে বেঁধে রাখা যায় না। কিন্তু ফ্লাস্কে বিবর্তনের সিমুলেশন না করলেও কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ তৈরিতে ঠিকই সফল হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ক্রেগ ভেন্টর তার সিন্থেটিক লাইফের গবেষণা থেকে প্রথম কৃত্রিম জীবকোষ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন।[৩৫] তিনি প্রাথমিকভাবে ইস্ট থেকে ক্রোমোসোমের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেন। কিন্তু ক্রোমোসোমের পূর্ণাঙ্গ রূপটি কম্পিউটারে সিমুলেশন করে বানানো *Mycoplasma mycoides* নামের একটি ব্যাকটেরিয়ার জিনোমের অনুকরণে। তাঁরা এটি বানানোর জন্য তৈরি করেন এক বিশেষ ধরনের সফটওয়ার। এই সফটওয়ারের সাহায্যেই তৈরি করা হয় কৃত্রিম ক্রোমোসোম এবং তাতে সংযুক্ত করা হয় কিছু জলছাপ (এটি আসলে ইমেইল আইডি, ভেন্টরদের দলের সদস্যদের নাম এবং কিছু বাড়তি তথ্য)। এভাবে বানানো ক্রোমোসোমটি পরে পুনঃস্থাপিত হয় *Mycoplasma capricolum* নামের একটি সরল ব্যাকটেরিয়ার কোষে। যার মধ্যেকার ক্রোমোসোম আগেই সরিয়ে ফেলা হয়। এভাবেই তৈরি হয় প্রথম কৃত্রিম ব্যাকটেরিয়া। নামে কৃত্রিম হলেও আচরণে এটি অবিকল মূল ব্যাকটেরিয়ার (*Mycoplasma mycoides*) মতোই। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীদের তৈরি এই কৃত্রিম ব্যাকটেরিয়াটি 'স্বাভাবিকভাবে' বংশবিস্তারও করছে। সংক্ষেপে এই পদ্ধতিকেই বলা হচ্ছে সিন্থেটিক প্রক্রিয়ায় জীবনের বিকাশ ঘটানো সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া। এভাবে উপাদান সাজিয়ে সরল জীবনের ভিত্তি গড়ে ফেলেছেন ক্রেগ ভেন্টর। তৈরি করে ফেলেছেন প্রথম কৃত্রিম জীবনের। ক্রেগ ভেন্টর নিজেই বলেছেন এই পদ্ধতিতে এমন একটি ব্যাকটেরিয়া তিনি বানিয়েছেন যার অভিভাবক প্রকৃতিতে পাওয়া যাবে না। কারণ অভিভাবক রয়েছে কম্পিউটারে।[৩৬] প্রাণের উদ্ভব যদি এতোই অসম্ভাব্য একটি ব্যাপার হতো, তবে বিজ্ঞানীদের এই ধরনের গবেষণাগুলো কখনোই সফলতার মুখ দেখতো না।

সব মিলিয়ে হয়েলের জঞ্জাল থেকে বোয়িং উপমা জীববিজ্ঞানে বহু আগে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী জন মায়নার্ড স্মিথ স্পষ্ট করে বলেন, 'কোন জীববিজ্ঞানীই হয়েলের মত চিন্তা করেন না, যে জটিল কাঠামো জঞ্জাল থেকে বোয়িং-এর মতো এক ধাপে হুট করে তৈরি হয়।'[৩৭] হয়েলের এই বোয়িং উপমার সমালোচনা সময় সময় করেছেন স্ট্রাহেলার, ম্যাক্লিভার, কাউফম্যান, দ্য দ্যুভে, পিটার স্কেলটন, রুডলগ রাফ, পেনক, ম্যাট ইয়ং, ডেনিয়েল ডেনেটসহ বহু বিজ্ঞানী এবং দার্শনিক। মূলত হয়েলের এই অপরিণামদর্শী উপমাকে এখন অবহিত করা হয় হয়েলের হেত্বাভাস (Hoyel's fallacy) বলে।[৩৮]

রিচার্ড ডকিন্স তার '*The God Delusion*' বইয়ে রসিকতা করে বলেছেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা জটিল জীবজগতের উদ্ভবের তাও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাই। কিন্তু 'ঈশ্বর' নামের সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান এক জটিল সত্ত্বা হুট করে কোথা থেকে উদ্ভূত হল, তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই আমরা কোথাও পাই না, কখনো পাবোও না। তাই ঈশ্বরই হচ্ছেন হয়েলের 'আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭'।[৩৯]

তথ্যসূত্র

১. অভিজিৎ রায়, *আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী*, ২০০৬, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

২. Huxley T.H. the animals which are most nearly intermediate between birds and reptiles. Geol. Mag. 5, 357–65; Annals & Magazine of Nat Hist 2, 66–75; Scientific Memoirs 3, 3–13, 1968

৩. Charig, A.J., Greenaway, F., Milner, A.N., Walker, C.A. and Whybrow, P.J., "Archaeopteryx is not a forgery" *Science* 232 (4750): 622–626, 1986.

৪. Wellnhofer P. , A New Speciment of Archaeopteryx, *Science* 240, 1790, 1988.

৫. Tim Berra, *Evolution and the Myth of Creationism: A Basic Guide to the Facts in the Evolution Debate*, Stanford University Press, 1990, p 41

৬. Elliot Meyerowitz of Caltech quoted by Gail Vines, *New Scientist* 2 Dec 2000 p 36-39

৭. Hoyle Fred, *The Intelligent Universe*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1983, pp. 18-19

৮. Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, *Lifecloud: The Origin of Life in the Universe*, 1978, p 15-16

৯. Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, *Our Place in the Cosmos*, 1993, p 14

১০. Derek Gatherer, *The Open Biology Journal*, 2008, 1, 9–20, Finite Universe of Discourse: The Systems Biology of Walter Elsasser (1904–1991)

১১. Why Evolution Isn't Chance, http://www.ebonmusings.org/evolution/evonotchance.html

১২. Nilsson, D. E., and S. Pelger, 1994, A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve. Proc. Roy. Soc. Lond. B 256:53-58

১৩. http://en.wikipedia.org/wiki/Infinite_monkey_theorem

১৪. অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ, *মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে*, ২০০৭, অবসর প্রকাশনী, ঢাকা।

১৫. Haiti earthquake survivor Evan Muncie trapped under rubble for 27 days, Times Online, February 10, 2010, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article7021168.ece

১৬. Richard Dawkins, *The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design*, W. W. Norton & Company, 1996, page 49

১৭. অভিজিৎ রায়, বিবর্তনের সহজ পাঠ, *যুক্তি*, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি ২০১০, সিলেট, পৃষ্ঠা ৩৭

১৮. http://en.wikipedia.org/wiki/Weasel_program

১৯. John Rennie, *Scientific American*, July 2002, "15 Answers to Creationist Nonsense", p. 81

২০. উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে : http://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_genetics_culture/gc_w05/somm_mign_webarchive/lifespaciesII/LifeAnim.gif ।
২১. War of Weasels: An Evolutionary Algorithm Beats Intelligent Design, *Skeptical Inquirer*, Vol 34, No. 3
২২. Ian Musgrave, Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis Calculations, TalkOrigins Archive, http://www.talkorigins.org/faqs/abioprob/abioprob.html
২৩. Oparin, A. I., Origin of Life. New York: Dover, 1952
২৪. Haldane JBS, The Origins of Life, New Biology, 16, 12–27 (1954)
২৫. Miller, Stanley L., "Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions" Science 117 (3046): 528, 1953
২৬. Miller, Stanley L.; Harold C. Urey, "Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth". Science 130 (3370): 245, 1959
২৭. Fox, S. W. How did life begin? Science 132: 200-208, 1960
২৮. Fox, S. W. and K. Dose. Molecular Evolution and the Origin of Life, Revised ed. New York: Marcel Dekker, 1977.
২৯. Cairn-Smith, A. G. *Seven Clues to the Origin of Life*, Cambridge University Press, 1985.
৩০. de Duve, Christian, The beginnings of life on earth. *American Scientist* 83: 428-437, 1995
৩১. Russell, M. J. and A. J. Hall, The emergence of life from iron monosulphide bubbles at a submarine hydrothermal redox and pH front. *Journal of the Geological Society of London* 154: 377-402, 1997
৩২. Wächtershäuser, Günter, Life as we don't know it. *Science* 289: 1307-1308, . 2000.
৩৩. Smith, J. V., F. P. Arnold Jr., I. Parsons, and M. R. Lee. 1999. Biochemical evolution III: Polymerization on organophilic silica-rich surfaces, crystal-chemical modeling, formation of first cells, and geological clues. *Proceedings of the National Academy of Science USA* 96(7): 3479-3485.
৩৪. Huber, Claudia, Wolfgang Eisenreich, Stefan Hecht and Günter Wächtershäuser. 2003. A possible primordial peptide cycle. *Science* 301: 938-940
৩৫. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome". Science magazine., Published Online May 20, 2010, Science DOI: 10.1126/science.1190719
৩৬. অভিজিৎ রায়, তৈরি হলো প্রথম কৃত্রিম প্রাণ, *দৈনিক সমকাল*, ১২ জুন, ২০১০
৩৭. John Maynard Smith, The Problems of Biology, p.49. (1986), "What is wrong with it? Essentially, it is that no biologist imagines that complex structures arise in a single step."
৩৮. George Johnson, Bright Scientists, Dim Notions NY Times, October 28, 2007
৩৯. Richard Dawkins, *The God Delusion*, Houghton Mifflin Harcourt; 2006, page 114

জৈববিবর্তনের বোধ ব্যতীত জীববিজ্ঞানে কোনো কিছু অর্থবোধক নয়
থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি

জীববিজ্ঞানে জৈববিবর্তন তত্ত্বের অন্যতম ব্যাখ্যাদাতা চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের পর জৈববিবর্তন নিয়ে গবেষণায় খুব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে আমরা যাদের নাম বলতে পারি তারা হলেন টমাস হাক্সলি, তাঁর নাতি জুলিয়ান হাক্সলি, জে. বি. এস. হ্যালডেন, থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি, জর্জ সিম্পসন, স্যার রোনাল্ড ফিশার, আর্নেস্ট মায়ার, স্টিফেন জে. গোল্ড। জীবিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিচার্ড ডকিন্স, ডগলাস জে. ফুটুইমা, ফ্রান্সিসকো জে. আয়ালা, জেরি এ. কোয়েন, সন বি. ক্যারল, কেন্‌থ মিলার, ডোনাল্ড আর. প্রোথেরো প্রমুখ। এ তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করা সম্ভব। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এ জ্ঞানীগুণী বিজ্ঞানীরা নিরলস পরিশ্রম, কঠোর অধ্যাবসায়, গবেষণার মাধ্যমে জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নানা কুজ্‌ঝটিকা আর রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছেন। তাঁদের অবিশ্রান্ত মেধা আর শ্রমের বিনিময়ে গড়ে উঠেছে জৈববিবর্তন তত্ত্বের মজবুত ভিত।

বিশ্বের প্রথিতযশা বংশগতিবিদ এবং জৈববিবর্তন বিজ্ঞানী থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি (Theodosius Dobzhansky)-এর জন্ম (২৪ নভেম্বর) ১৯০০ সালে ইউক্রেনে (তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনাধীন)। সেখানে তিনি কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণীবিজ্ঞানের উপর লেখাপড়া করেন। প্রথম জীবনের পেশায় তিনি ঐ কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পরে রাশিয়ার বিখ্যাত সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। রকফেলার ফাউন্ডেশন থেকে বৃত্তি পেয়ে ১৯২৭ সালের দিকে তিনি আমেরিকাতে যান। সেখানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টমাস হান্ট মর্গানের গবেষণাগারে যোগ দেন। টমাস হান্ট মর্গান বংশগতিবিদ্যার জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার গবেষণায় দেখিয়েছেন ক্রোমোসোমের মাধ্যমেই বংশগতি প্রবাহিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এবং ড্রসোফিলা নামক ফলের মাছি নিয়ে গবেষণায় মেন্ডেলের বংশগতি সঞ্চরণ তত্ত্বের নিভুলতা প্রমাণে তিনি বিখ্যাত। ১৯২৮ সালের দিকে টমাস মর্গান ক্যালফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে যোগ দেন। ডবঝানস্কিও সেখানে যান। তার গবেষণার কাজও ড্রসোফিলা নামক ফলের মাছি নিয়ে। ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন' প্রস্তাবনায় যে সীমাবদ্ধতা ছিল মেন্ডেলের বংশগতি সঞ্চরণ সূত্রের সাথে এর মিল ঘটিয়ে থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি'র গবেষণা কার্যক্রম সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রচুর ভূমিকা রাখে। বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব (Modern Synthesis Theory of Evolution) প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

১৯৩৭ সালে থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কির বিখ্যাত গ্রন্থ '*Genetics and the Origin of Species*' প্রকাশের পর থেকে জীববিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে জৈববিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে সকল সংশয় ধীরে ধীরে দূর হতে লাগল। এছাড়া তাঁর *The Biological Basis of Humn Freedom* (১৯৫৬) এবং *Mankind Evolving* (১৯৬৩) গন্থ দুটিও প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছে বৌদ্ধিক মহলে। দেশে-বিদেশের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন এবং বিজ্ঞান জগতে তাঁর বিশাল

কীর্তির জন্য প্রচুর পদক পেয়েছেন। যেমন ১৯৬৪ সালে ন্যাশনাল মেডেল অব সায়েন্স পদক, ১৯৬৯ সালে স্বর্ণপদক লাভ। ১৯৬৮ সালের পূর্বে তিনি ক্রনিক লিউকেমিয়া রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৭১ সালের দিকে তিনি গবেষণা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পেশা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিশ্বখ্যাত এ জৈববিবর্তন বিজ্ঞানী হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু ঘটে। তার সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ *'জৈববিবর্তনের বোধ ব্যতীত জীববিজ্ঞানে কোনো কিছু অর্থবোধক নয়'* (Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution) প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে 'আমেরিকান বায়োলজি টিচার' পত্রিকার মার্চ মাসে (ভলিউম ৩৫, পৃষ্ঠা ১২৫-১২৯)। যদিও ডবঝানস্কি ১৯৬৪ সালের দিকে কিছুটা ছোট আকারে ভিন্নভাবে এবং ভিন্ন শিরোনামে *American Zoologist* পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ করেন এটি। তখন এই প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'Biology, Molecular and Organismic'। পরবর্তীতে আমেরিকার জীববিজ্ঞানের শিক্ষকদের জাতীয় সংগঠন 'National Association of Biology Teachers (NABT)'-এর ১৯৭২ সালের কনভেনশনে বর্তমান প্রবন্ধটি মূল শিরোনামে (Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution) পঠিত হয় এবং পরের বছর মার্চ মাসে তা প্রকাশিত হয়। থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কির এই প্রবন্ধের শিরোনাম তৎক্ষণাৎ জীববিজ্ঞানের মহলসহ সাধারণ মানুষের জনচেতনায় প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। একাডেমিক বা নন-একাডেমিক পরিসরে জীববিজ্ঞান কিংবা জৈববিবর্তন নিয়ে যে কোনো আলোচনায় বক্তব্যটি ঘুরে ফিরে আসে। জৈববিবর্তন/জীববিজ্ঞানের উপর লেখা হাজারও বই, রচনা, পত্রিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদিতে উদ্ধৃতি/বাণী হিসেবে এ বক্তব্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। চার্লস ডারউইনের জন্মদ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষের আমাদের এ গ্রন্থে থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কির বিশ্বখ্যাত প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন বিষ্ণু পদ সেন (শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট)।—সম্পাদক।

১৯৬৬ সালে সৌদি আরবের শেখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ সৌদি বাদশা বরাবর 'ধর্মবিরোধিতা' দমনের আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন :

> "পবিত্র কোরান, মহানবী (সাঃ) এর শিক্ষা, সংখ্যাগুরু মুসলিম বিজ্ঞানীদের ধারণা এবং প্রকৃত তথ্যসমূহ এটাই প্রমান করে, সূর্য তার কক্ষপথে ঘুরছে এবং পৃথিবী স্থির-নিশ্চল... যা আল্লাহ তার বাণীতে বলেছেন সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য এই পৃথিবী গড়েছেন। ...যদি কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে তাহলে সে আল্লাহ, কোরান এবং মহানবী (সাঃ)-এর বিচারে কাফের হিসাবে অভিযুক্ত হবেন।"

শেখ স্পষ্টরূপে কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে 'ফ্যাক্ট' (বাস্ব) মনে না করে এটিকে 'নিছক একটি তত্ত্ব' হিসেবেই ধরে নিয়েছেন। যান্ত্রিকভাবে দেখলে তিনি হয়তো ভুল বলেননি। একটি তত্ত্ব তখনই প্রমাণিত হয় যখন তা অনেকগুলো ঘটনা বা বাস্বতার মাধ্যমে যাচাই করা হয়ে থাকে; এবং এর দ্বারা তত্ত্বটি প্রমাণিত হয়। বাদশাকে 'কোপার্নিকাসের ধর্মবিরুদ্ধ মত' দমন করার আবেদন জানানোর অনেক আগেই যে পৃথিবীতে মহাকাশ যুগ শুরু হয়েছে এ বিষয়ে মনে হয় সৌদি শেখ আব্দুল আজিজ ওয়াকিবহাল নন। পৃথিবীর আকার যে গোল তা অনেক মহাকাশযাত্রীই দেখে এসেছেন এবং পৃথিবীর অনেক মানুষও টেলিভিশনে প্রচুর দেখেছেন। শেখ আজিজ হয়তো এরপরও বলবেন, যারা পৃথিবীর সীমা ছেড়ে যাবার মত সাহসী কাজ করতে চায় তাদের মতিভ্রম হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী হচ্ছে সমতল।

কোপার্নিকাসের বিশ্ব মডেলের একটি অংশ হচ্ছে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এবং সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে না। কিন্তু কোপার্নিকাসের সময় প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব ছিল না (পরবর্তীতে ১৭২৮ সালের দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেমস ব্রাডলির 'আলোর অপেরণ' (aberration) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনশীল—অনুবাদক)। বিজ্ঞানীরা কোপার্নিকাসের এই তত্ত্বকে বাস্তার সাথে সম্পর্কিত একটি নিখুঁত বর্ণনা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। কেন? কারণ কোপার্নিকাসের এ মডেল আমাদের বিশ্বজগৎ সম্পর্কে বেশ কিছু ধারণা দেয় যা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু অন্যক্ষেত্রে এ তথ্যগুলো অর্থহীন অথবা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। অবিশেষজ্ঞদের কাছে এই সব তথ্য অপরিচিত মনে হতে পারে। পৃথিবীর গোলকারত্ব এবং গোলাকার সূর্যের চারদিকে ঘূর্ণনশীল এমন নিছক তত্ত্বকে মেনে নিচ্ছি কেন? এক্ষেত্রে আমরা কি অন্য কোনো কর্তৃত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করছি? না, মোটেই তা নয়। আমরা জানি, পৃথিবীর গোলকারত্ব এবং ঘূর্ণনশীলতা নিয়ে যারা দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন, তারা গবেষণা দ্বারা নিশ্চিত হয়েই এমন কথা বলেছিলেন।

শেখ আব্দুল আজিজ খুব সম্ভবত এই সকল প্রমাণ সম্পর্কে খুব একটা জানেন না।। কিংবা এমনও হতে পারে, তিনি এতো বেশি অন্ধবিশ্বাসী, কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। যা হোক, তাকে নতুনভাবে বৈজ্ঞানিক ধারণায় বিশ্বাস করানো সময়ের অপচয় মাত্র। কোরান ও বাইবেল না কোপার্নিকাসের বিরোধী কিংবা না কোপারর্নিকাস কোরান-বাইবেলের বিরোধী। বাইবেল ও কোরানকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 'প্রথম পাঠ' মনে করা বোকামো। বাইবেল, কোরানে অন্য জরুরি বিষয় রয়েছে, যেমন মানুষ কী, ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক কী। এগুলো কাব্যিক পদ্য ছন্দে লিখিত যাতে সেই যুগের মানুষের বোধগম্য হয় এবং অন্য যুগের মানুষও যেন তা বুঝতে পারে। সৌদি বাদশা শেখ আজিজের সঙ্গে একমত পোষণ করেননি। সৌদি বাদশাহ জানেন কিছু লোক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার আলোকে ভয় পায়, কারণ এর দ্বারা তাদের কায়েমী স্বার্থ আদায়ের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষা প্রদান করে কোনো লাভ নেই।

জ্যামিতির মত পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে নয়, যদিও এটা (কিছু মানুষের) আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হতে পারে। পৃথিবী মহাজাগতিক শূন্যে ধূলি কণায় ভর্তি বস্তু মাত্র। বিশপ উসার বলেছিলেন পৃথিবীর সৃষ্টি খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালে। কিন্তু এ হিসেবটি সঠিক নয়। বর্তমানকালে মহাবিশ্বের বয়স বের করার যে পদ্ধতি বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেন তাতে যদিও কিছু অনুমান-নির্ভরতা আছে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এগুলোকে সংশোধন-পরিমার্জন করে বিজ্ঞানীরা নির্ভুলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বয়স দশ মিলিয়ন বছর।

তবে কেউ কেউ মনে করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব বলতে কিছু নেই, এটি আগেও ছিল এবং অনন্তকাল ধরে থাকবে। পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব প্রায় তিন থেকে পাঁচ বিলিয়ন বছর পূর্বে। মানুষ-সদৃশ প্রাণীর উদ্ভব সেই তুলনায় খুব অতীতকালের নয়। দুই থেকে চার মিলিয়ন বছরের মধ্যে। ভূস্তরে থাকা কিছু তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের (যেমন ইউরেনিয়াম) আইসোটোপের রেডিওমেট্রিক ডেটিং থেকে পৃথিবীর বয়স পরিমাপ করা যায়। ভূতাত্ত্বিক বর্ষ, জীবাশ্মের বয়স, মানুষের পূর্বপ্রজাতির বয়সও এর দ্বারা বের করা যায়।

সৌদি শেখ আব্দুল বিন বাজ এবং তার মত যারা রয়েছেন তারা এই রেডিওমেট্রিক পরীক্ষণকে গ্রহণ করতে রাজি নন। কারণ তাদের কাছে এটি এক 'অবাস্তব তত্ত্ব'। তাহলে বিকল্পটা কি? কেউ হয়তো বলতে পারেন 'স্রষ্টা ভূতাত্ত্বিক-জীববিজ্ঞানীদের সাথে মশকারা করেছেন। স্রষ্টা নিজের খেয়াল খুশি মত ভূত্বকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ যত্ন করে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছেন। ফলে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে কিছু পাথরে বয়স বের করছি দুই বিলিয়ন বছর আবার কিছু পাথরের বয়স বের করছি দুই মিলিয়ন বছর। আসলে এই পাথরগুলোর বয়স মাত্র ছয় হাজার বছর।' এ ধরনের কল্পিত অপব্যাখ্যা নতুন নয়। প্রথম দিককার একজন জৈববিবর্তন বিরোধী পি. এইচ. গস্ 'Omphalos' নামের একটি বই লিখেন। এই বইয়ের মূল বক্তব্য হচ্ছে 'আদমকে কেউ গর্ভে ধারণ করেননি। আদমের মা ছিলেন না। তিনি স্বয়ম্ভু। স্রষ্টা নিজে ইচ্ছেকৃতভাবে ফসিলকে এরকম অবস্থায় ভূত্বকে রেখে দিয়েছেন। স্রষ্টাই চেয়েছিলেন ফসিলগুলোকে এরকম প্রাচীন করে তুলতে এবং আমরা এখন সেগুলো সেরকম পাচ্ছি।' লেখকের অভিযোগ 'যারা এসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দেহ করে তারা ঈশ্বরদোহী।' এটি যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমনি ন্যাক্কারজনক বিষয়।

বৈচিত্র্যময় জীবজগৎ

জীবনের বৈচিত্র্য এবং একতা (মিল) দুটিই উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয় এবং অর্থপূর্ণ আমাদের এ জীবজগতে। এখন পর্যন্ত দেড় থেকে দুই মিলিয়ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব হয়েছে। অনাবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। আবিষ্কৃত প্রজাতির আকার, গঠন, বৈচিত্র্যময় জীবনধারা মনোমুগ্ধকর। কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেয়া হল। এক ধরনের ভাইরাস রয়েছে, যার দ্বারা আমাদের পা ও মুখ আক্রান্ত হয়। এ ভাইরাসের ব্যাস আট থেকে বারো মিলি মাইক্রন। আবার নীল তিমি দৈর্ঘ্যে ত্রিশ মিটার, ওজন একশো পয়ত্রিশ টন পর্যন্ত হতে পারে। বিভিন্ন প্রাণী দেহে পরজীবী হিসেবে ক্ষুদ্রাকৃতির ভাইরাস অবস্থান করে যারা অতি সামান্য পরিমাণ ডিএনএ বা আরএনএ ব্যবহার করে পোষক জীবদেহের কোষের জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ফলে ভাইরাসের বৃদ্ধি দ্রুত গতিতে হতে থাকে কিন্তু পোষক জীবের কোষের বিভাজন স্লথ হয়ে যেতে পারে।

ভাইরাসকে জীবন্ত প্রাণী বলা হবে নাকি অদ্ভুত ধরনের রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয় বলা হবে, তা নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে। এই যে ভিন্নমত রয়েছে, এটি খুব উল্লেখযোগ্য। কারণ জীব ও জড়ের সীমারেখা খুব একটা স্পষ্ট নয়। সরল দৈহিক গঠনসম্পন্ন জীব থেকে জটিল জীবদেহের অধিকারী মেরুদণ্ডী প্রাণীসহ মানুষের উদ্ভব হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কে বারো বিলিয়ন নিউরন রয়েছে। এই নিউরনের মধ্যেকার সাইন্যাপ্সের সংখ্যা নিউরন থেকে হাজার গুণ বেশি।

কিছু জীব বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বাস করতে পারে। এই দিক দিয়ে মানুষের অবস্থান শীর্ষে। মানুষ শুধু এখন বিশ্বনাগরিকই নয়, প্রযুক্তির উৎকর্ষ মানুষকে সীমিত সময়ের জন্য হলেও চাঁদে কিংবা মহাশূন্যে বেঁচে থাকার সামর্থ দিয়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীতে এমন কিছু জীব রয়েছে যারা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে। উদাহরণ হিসেবে এ ক্ষেত্রে ল্যাবালবেনিয়েসি (Laboulbeniaceae) গোত্রের ছত্রাকের কথা বলা যায়। *Aphenops cronei* প্রজাতির গুবরে পোকার সামনের পাখার পিছন দিকে এই ছত্রাককে পাওয়া যায়। গুবরে পোকাগুলোকে অবশ্য পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। একমাত্র দক্ষিণ ফ্রান্সের চুনাপাথরের গুহায় পোকাগুলোকে দেখা গেছে। এক প্রজাতির মাছির নাম *Psilopa petrolei*। যতদূর জানি, শুধু ক্যালফোর্নিয়ার খনিজ তেলের খনিতে এ মাছির লার্ভাকে পাওয়া যায়। অন্য কোথাও নয়। এরাই একমাত্র পতঙ্গ, যারা তেলের মধ্যে থাকে, তেল খেয়ে বাঁচে। এ প্রজাতির প্রাপ্তবয়স্ক মাছিরা তেলের উপর দিয়ে স্বাচ্ছন্দে চলাচল করতে পারে, দেহের কোথাও তেল না লাগিয়ে। আবার ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপে পাওয়া যায় *Geocarcinus ruricola* প্রজাতির কাঁকড়া। এ কাঁকড়ার তিন নম্বর চোয়ালের নীচে *Drosophila carcinophila* প্রজাতির মাছির লার্ভা পাওয়া যায়।

জীবসমূহে এই যে বিশাল বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা তার কি কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে? কবে, কোথা থেকে ল্যাবালবেনিয়েসি (Laboulbeniaceae) এর মত ছত্রাক, *Aphenops cronei* গুবরে পোকা, *Psilopa petrolei* এবং *Drosophila carcinophila* মাছি ইত্যাদি অসাধারণ সব অদ্ভুত দর্শনের প্রাণীরা পৃথিবীতে আসলো? একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে পৃথিবীতে বৈচিত্র্যময় পরিবেশ থেকে জীবজগতের বৈচিত্র্য বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। কোনো একক প্রজাতি, তা সে যতই নিখুঁত হোক না কেন, তার মধ্যে বহুধর্মীতা থাকুক না কেন, বেঁচে থাকার জন্য সব পরিবেশেই উপযুক্ত নয়। মিলিয়ন মিলিয়ন প্রজাতির নিজস্ব জীবন ধারণের পন্থা রয়েছে। পরিবেশ থেকে নিজের মত প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে। এ কথা হয়তো নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রতিটি প্রজাতির জীবন ধারণের জন্য অনেক সম্ভাব্য পন্থা রয়েছে, যা হয়তো ঐ প্রজাতি কখনো পরখ করে দেখেনি। একটি বিষয় পরিষ্কার, প্রজাতিতে জৈবিক বৈচিত্র্য কম থাকলে বেঁচে থাকার কিছু পন্থা অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে। জৈববিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তিযোগ্য বাস্তসংস্থানের সম্ভাব্য ফাঁকগুলো পূরণ হয়। এটি খুব সচেতন এবং সুচিন্তিত উপায়ে হয় না। জৈববিবর্তন এবং পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্ক খুব সূক্ষ্ম এবং আকর্ষণীয়। যে পরিবেশে একটি প্রজাতি বসবাস করে, সেই পরিবেশ নিবাসীদের উপর বিবর্তন প্রক্রিয়া কার্যকর করে না। যদিও এক সময়ে এমন কথাই প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানে বর্জিত নব্য-ল্যামার্কবাদ তাই বলতো। পরিবেশকে ভালোভাবে বুঝতে হলে স্মরণযোগ্য হচ্ছে পরিবর্তিত পরিবেশে প্রজাতি টিকে থাকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ

হয়। আর প্রজাতির সদস্যরা জিনগত পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়।

বসবাসের জন্য অনাবিস্কৃত সুযোগ সন্ধান, একটি সম্ভাব্য শূন্য বাস্তুতান্ত্রিক প্রতিবেশকে আমরা চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচনা করব। পরিবেশের পরিবর্তন ঘটছে। ধরা যাক, বরফযুগের আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে উষ্ণ আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি জীবিত প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে জিনগত পরিবর্তন ঘটে। ফলে এদের পক্ষে পরিবির্তত পরিবেশের প্রতিকূলতাকে সামাল দেয়া যেতে পারে। প্রজাতির এ রূপান্তরের ফলে পূর্বে খালি একটি প্রতিবেশ বা বাস্তুসংস্থানে বসবাসের সুযোগ লাভ করে, অথবা সম্ভব হলে পরিবেশের প্রতিকূলতাকে বাধা দিতে পারে। প্রজাতির এই প্রতিক্রিয়া সফল বা অসফল দুটোই হতে পারে। কী হতে পারে তার পিছনে কারণ রয়েছে। সবচেয়ে বড় কারণটি হচ্ছে, যখন কোনো প্রজাতি পরিবেশের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয় তখন ঐ প্রজাতির জিনগত গঠন কেমন ছিল তা বিবেচনায় নিতে হবে। যদি কোনো প্রজাতি পরিবর্তিত পরিবেশে সফলভাবে সাড়া না দিতে পারে, তবে এর সদস্যদের বিলুপ্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। জীবাশ্ম পরীক্ষা করে স্পষ্টভাবে জানা গেছে জীবের বিবর্তন সারণির চূড়ান্ত পরিণতি বিলুপ্তির মধ্যে দিয়ে ঘটে। বর্তমানে আমাদের চারপাশে যত ধরনের জীব দেখতে পাই, তারা সকলেই অতীতের জীবিত খুব কম সংখ্যক প্রজাতির বিবর্তনের ফসল। যত অতীতের দিকে খেয়াল করা যাবে, প্রজাতির সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকে। অবশ্য এরপরও জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস পায়নি। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। জৈববিবর্তনের আলোকেই এ বিষয়টি বোধগম্য হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের পক্ষে এটি সত্যিই নির্বুদ্ধিতা হত, যদি তিনি একগুচ্ছ প্রজাতি সৃষ্টি করতেন এবং এদের বেশিরভাগই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সচেতন বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কিছু ঘটে না। কোনো জৈবিক প্রজাতিই কখনো বলে না 'আমাকে আগামীকাল (অথবা এখন থেকে এক মিলিয়ন বছর পরে) নতুন মাটিতে জন্মাতে দাও, নতুন ধরনের খাবার খেতে দাও, অথবা ভিন্ন ধরনের ধরনের কাঁকড়া হয়ে ভিন্ন ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে বাস করি।' মানুষই একমাত্র এমন সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এ জন্যই *Homo sapiens* বিবর্তন বৃক্ষের শীর্ষে অবস্থান করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন একই সাথে অসচেতন-অন্ধ এবং সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া। অসচেতন-অন্ধ এবং সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া থেকেই একদিকে যেমন বিস্ময়কর জৈবিক উন্নতি মানব প্রজাতির মধ্যে দেখা যায় তেমনি অন্যদিকে সীমিত প্রক্রিয়া হিসাবে অতিবিশেষিত ছত্রাক, গুবরেপোকা ও মাছির অভিযোজন ঘটে।

জৈববিবর্তন বিরোধীরা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কেমন করে ক্রিয়াশীল তা বুঝতে পারেন না। তাদের মত হচ্ছে সকল জীবিত প্রজাতিই কয়েক হাজার বছর আগে এক অলৌকিক শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে আমরা যে প্রজাতিকে যেমন দেখি, পূর্বেও তারা এমন ছিল। কিন্তু পৃথিবীতে দুই থেকে তিন মিলিয়ন প্রজাতি বসবাসের অর্থ কি? প্রাকৃতিক নির্বাচনকে এ ক্ষেত্রে মূল ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচনা করলে সেখানে যে কোনো সংখ্যায় প্রজাতির উদ্ভবের বিষয়টি বোঝা যায়। প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনো পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হয় না। কোনো প্রজাতিই কোনো উদ্দেশ্যর কারণে জন্ম নিচ্ছে না। প্রজাতির জিনগত রূপান্তর ঘটেছে এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে। স্রষ্টা কি খোশমেজাজে ছিলেন বলে ক্যালফোর্নিয়ার তেলখনিতে *Psilopa petrolei* প্রজাতির মাছিকে সৃষ্টি করেছিলেন? ক্যারাবিয়ান দ্বীপের কাঁকড়ার শরীরে শুধু বিশেষ ধরনের ড্রসোফিলা থাকবে এমনটা স্রষ্টা ঠিক করেছিলেন? জীবের বৈচিত্র্য তখনই যুক্তিসঙ্গত এবং বোধগম্য হয় যদি বলা হয় স্রষ্টা জীবজগতকে খেয়াল খুশিমত তৈরি করেননি বরং স্রষ্টা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পরিচালিত বিবর্তনের মাধ্যমে জীবজগতকে তৈরি করেছেন। সৃষ্টি এবং বিবর্তন পরস্পরের বিপরীত এমন ধারণা ভুল। আমি এ দুয়ের পক্ষে। বিবর্তন হচ্ছে ঈশ্বর বা প্রকৃতির 'সৃষ্টির পদ্ধতি'। কিন্তু এ সৃষ্টি চার হাজার চারশো খ্রিষ্টপূর্বে হয়নি। দশ বিলিয়ন বছর আগে তা ঘটেছে এবং আজও তা অব্যাহত আছে।

জীবনের ঐক্য

জীবনের ঐক্য বৈচিত্র্যের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিভিন্ন আঙ্গিকে জীবনের গঠনে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। জৈব-রাসায়নিক দৃষ্টিতে জীবনের এই সর্বজনীন সাদৃশ্য বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। ভাইরাস থেকে মানুষ–বংশগতির বার্তা দুটি রাসায়নিক উপাদানে আবদ্ধ রয়েছে–ডিএনএ এবং আরএনএ। জিনেটিক কোড যেমন সাধারণ তেমনি এটি সার্বজনীনও। ডিএনএতে মাত্র চারটি জিনেটিক বর্ণ রয়েছে : অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন, সাইটোসিন। আরএনএ'তে থাইমিনের বদলে শুধু ইউরাসিল রয়েছে। জীবজগতে বিবর্তনের ধারা জীবের জিনেটিক বর্ণমালায় নতুন নতুন বর্ণ সংযুক্তের মাধ্যমে অগ্রসর হয়নি, বরং এই চারটি মাত্র জিনেটিক বর্ণের নতুন নতুন বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ঘটেছে।

ডিএনএ কিংবা আরএনএ'র জিনেটিক কোড শুধু সার্বজনীন নয়, জিনেটিক চারটি বর্ণের যে সিকুয়েন্স বা অনুক্রম থাকে, প্রোটিন গঠনের সময় অ্যামিনো অ্যাসিডেও সেই অনুক্রম দেখা যায়। মাত্র ২০ ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড মিলে জীবজগতে অগণিত প্রোটিন তৈরি করেছে। ডিএনএ বা আরএনএ'র কমপক্ষে একটি নিউক্লিওটাইড ট্রিপলেট বা ছয়টি নিউক্লিওটাইড ট্রিপলেট মিলে অ্যামিনো অ্যাসিড গঠিত। জীবের এই জৈবরাসায়নিক সর্বজনীনতা জিনেটিক কোডের মাধ্যমে প্রোটিন গঠন করে। আপাতদৃষ্টিতে জীবদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই, কিন্তু এদের কোষের বিপাকক্রিয়ায় অনেক মিল রয়েছে। সকল কোষের বিপাকক্রিয়া অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট, বায়োটিন, রাইবোফ্লেভিন, হিম্‌স, পাইরিডক্সিন, ভিটামিন-K, ভিটামিন-$B_{১২}$ এবং ফলিক অ্যাসিডের মাধ্যমে ঘটে।

জৈবিক বা জৈব-রাসায়নিক সর্বজনীনতা বলতে কি বোঝায়? জৈবরাসায়নিক বিজ্ঞানীরা বলেন, জড় পদার্থ থেকে জীবনের উদ্ভব হয়েছে এবং এরপর সকল জীব যতই বৈচিত্র্যমণ্ডিতভাবে বিবর্তিত হোক না কেন অতি আদিম জীবনের কিছু বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে অক্ষুণ্ন রয়েছে। (হতে পারে জীবনের উদ্ভবের অনেকগুলি উৎস রয়েছে কিন্তু এর মধ্যে

একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব ঘটেছে এবং জীবের বিবর্তন ঘটেছে)। কিন্তু পৃথিবীতে যদি বিবর্তন প্রক্রিয়া না থাকতো? যদি লক্ষ লক্ষ প্রজাতির আলাদা আলাদা জীবনের উৎস থাকতো? এমন প্রশ্ন ধর্মীয় অনুভূতির পক্ষে অপ্রীতিকর লাগতে পারে, তখন বিবর্তন-বিরোধীরা বলবেন স্রষ্টা ইচ্ছে করেই প্রতারণা করেছেন আমাদের সাথে। তারা জেদ ধরে বলতেই থাকেন স্রষ্টা সত্যসন্ধানীদের ভুল পথে পরিচালনার জন্য এমনভাবে সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তার সৃষ্টির পদ্ধতিকেই 'জীবের বিবর্তন' বলে মনে করি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মলিকুলার বায়োলজির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ফলে আমাদের বুঝতে সহজ হয়েছে সমজাতীয় জৈবরাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে কেমন করে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগতের উদ্ভব ঘটেছে। মাত্র বিশ ধরনের অ্যামিনো এসিড দিয়ে জীবদেহের জন্য অত্যন্ প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি হয়েছে। DNA এবং RNA এই প্রোটিন তৈরি করে। এরা চার ধরনের নিওক্লিওটাইড দ্বারা গঠিত। এই প্রক্রিয়াটি বিস্ময়করভাবে অতি সাধারণ। ইংরেজি বর্ণমালায় ২৬টি বর্ণ রয়েছে। এই ২৬টি বর্ণের নানা রকম বিন্যাসে সকল ইংরেজি শব্দ, বাক্য, অধ্যায়, বইপত্র তৈরি হয়েছে। (মোর্স সংকেতের মত শুধু তিনটি চিহ্ন দেয়া যেতে পারে : . (dot), - (dash), এবং ... (gap))। একটি শব্দ বা বাক্যের অর্থ তার ভিতর কী কী বর্ণ রয়েছে এর উপর নির্ভর করে না, বরং এসব বর্ণের ক্রমসজ্জা বা বিন্যাসের উপর নির্ভর করে। বংশগতির ক্ষেত্রেও বিষয়টি ঠিক তাই। নিউক্লিওটাইড–জিনেটিক বর্ণমালার ক্রমসজ্জা বা বিন্যাসের মাধ্যমে DNA তৈরি। এদের বিন্যাসের উপর নির্ভর করে কোন ধরনের অ্যামিনো এসিড তৈরি হবে এবং অ্যামিনো এসিডের বিন্যাসের উপর নির্ভর করে কোন ধরনের প্রোটিন তৈরি হবে।

আণবিক নান গবেষণা থেকে আমরা বিভিন্ন জীবের জৈবরাসায়নিক মিল এবং পার্থক্যের পরিমাণ পরিমাপ করতে পারি। কিছু এনজাইম এবং প্রোটিন প্রায় সর্বজনীন এবং সব প্রাণীদেহে তাদের পাওয়া যায়। বিভিন্ন জীবন্ প্রাণীদেহে এদের কার্যক্রম একই রকম। বিভিন্ন প্রাণীদেহে একই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একই রকম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। কিছু প্রোটিনকে জীবদেহ থেকে আলাদা করে তাদের রাসায়নিক গঠন দেখা যায় পৃথক প্রজাতির প্রাণীতে এদের অ্যামিনো এসিডের বিন্যাস ভিন্ন। যেমন মানুষ ও শিম্পাঞ্জিতে হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিনের আলফা চেইনে অ্যামনো এসিডের বিন্যাস/ক্রমসজ্জা একই রকম। গরিলার ক্ষেত্রে ১৪১ নম্বর অ্যামিনো অ্যাসিড ভিন্ন। মানবদেহের হিমোগ্লোবিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের যে বিন্যাস রয়েছে তা গরুর ক্ষেত্রে ১৭টি অ্যামিনো অ্যাসিডে পার্থক্য, ঘোড়ার সাথে ১৮টি, গাধার সাথে ২০টি, খরগোশের সাথে ২৫টি, এবং কার্প মাছের সাথে ৭১টি অ্যামিনো অ্যাসিডে পার্থক্য রয়েছে।

যে সব কোষে সবাত শ্বসন ঘটে তাদের মধ্যে সাইট্রোক্রোম-সি নামক এনজাইম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষ থেকে শুরু করে রুটি, পনির ইত্যাদিতে যে ছত্রাক (mould) হয় তাতে এই সাইটোক্রোম-সি এনজাইমের কাজ একই। ই. মার্গোলিশ (E. Margoliash), ডব্লিও. এম. ফিট্চ (W. M. Fitch)-সহ অন্যরা জীবজগতের বিভিন্ন শাখার প্রাণীদের মধ্যে সাইটোক্রোম-সি'র অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাস পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাদের এই পরীক্ষণ দ্বারা উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন মিল এবং পার্থক্য ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন বর্গের স্ন্যপায়ী প্রাণী এবং পাখির মধ্যে সাইটোক্রোম-সি'র অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাসে পার্থক্য রয়েছে দুই থেকে সতেরোটি। মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিভিন্ন শ্রেণীতে এ পার্থক্য সাত থেকে আটত্রিশটি, মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং কীটপতঙ্গের মধ্যে এ ভিন্নতা তেইশ থেকে একচল্লিশটি অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাসে। প্রাণীদের সঙ্গে ইস্ট এবং ছত্রাক জাতীয় জীবের ছাপান্ন থেকে বাহাত্তরটি অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাসে পার্থক্য রয়েছে। ই. মার্গোলিশ এবং ফিট্চ তাদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলকে এভাবে প্রকাশ করেছেন 'সর্বনিম্ন পরিব্যক্তিক দূরত্ব' (minimal mutational distances)। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথক পৃথক অ্যামিনো অ্যাসিডের গঠনে ডিএনএ'র নিউক্লিওটাইড ত্রয়ীর পৃথক বিন্যাস এখন বিজ্ঞানীদের জানা। বেশিরভাগ মিউটেশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডিএনএ'র চেইনে কোথাও একটি মাত্র নিউক্লিওটাইডের পরিবর্তন ঘটেছে এবং এর ফলে প্রোটিনের সংকেতে বদল হয়েছে। কাজেই কেউ চাইলে এক জীব থেকে অন্য জীবে সাইটোক্রোম-সি তৈরির জন্য সর্বনিম্ন কয়টি একক মিউটেশনের প্রয়োজন তা বের করা সম্ভব। মানুষের সাইটোক্রোম-সি ও অন্যান্য জীবের সাইটোক্রোম-সি'র মধ্যে 'সর্বনিম্ন পরিব্যক্তিক দূরত্ব' তা নীচে উল্লেখ করা হল :

বানর	১	মুরগি	১৮
কুকুর	১৩	পেঙ্গুইন	১৮
ঘোড়া	১৭	কচ্ছপ	১৯
গাধা	১৬	র‍্যাটল স্নেক	২০
শূকর	১৩	টুনা মাছ	৩১
খরগোশ	১২	মাছি	৩৩
ক্যাঙ্গারু	১২	মথ	৩৬
হাঁস	১৭	ছত্রাক জাতীয় অণুজীব	৬৩
কবুতর	১৬	ইস্ট	৫৬

এটা মনে মনে রাখা দরকার বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মত একই প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যেও অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাসে পার্থক্য রয়েছে। বিন্যাসের এই পার্থক্য প্রজাতি, গণ, বর্গ, শ্রেণী, পর্বের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। একই প্রজাতির দুটি প্রাণীর মধ্যেকার পার্থক্য এবং বিভিন্ন গ্রুপের একাধিক পাণীর মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র পরিমাণগত। গুণগত নয়। বিজ্ঞানীদের কাছে এ ধরনের প্রমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে মানুষের রক্তের হিমোগ্লোবিনে একজনের সাথে অন্যজনের অ্যামিনো অ্যাসিডের বিন্যাসের ভিন্নতা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। প্রায় শতাধিক ভিন্নতা খুঁজে পাওয়া গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে পার্থক্য। জিনেটিক মিউটেশনের কারণে ঐ ব্যক্তির বা তার পূর্বসূরিদের রক্তে ভিন্নতা তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই কিছু মিউটেশন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য

ক্ষতিকর। আবার কিছু মিউটেশন নিরপেক্ষ বা নির্দিষ্ট পরিবেশের সাপেক্ষে উপকারীই বলা যায়। এমন কিছু মিউটেন্ট হিমোগ্লোবিন পাওয়া গেছে যা শুধু একজন ব্যক্তি বা এক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দেখা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের রক্তে এসব দেখতে পাওয়া যায়। এর দ্বারা আমি শুধু এ কথাই বলতে চাইছি বিবর্তনের আলোকেই এসব পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব, অন্যকিছু দ্বারা নয়।

তুলনামূলক শারীরসংস্থান ও ভ্রূণবিদ্যা

সাম্প্রতিক সময়ে আবিস্কৃত জৈব-রাসায়নিক সর্বজনীনতা খুব উল্লেখযোগ্য হলেও জৈববিবর্তনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখা রয়েছে। তুলনামূলক শারীরসংস্থান ও ভ্রূণবিদ্যা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে মানুষ ও পাখির কঙ্কালে কোনো মিল নেই। ১৫৫৫ সালে পিয়ের বেলন মানুষ ও পাখির কঙ্কালের মধ্যে সমগোত্রীয় হাড়ের অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে শারীরসংস্থানবিদরা দেহকঙ্কাল ছাড়াও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মিল আবিষ্কার করেছেন। বাহ্যিকভাবে লক্ষ্য করলে সন্ধিপদ শ্রেণীর প্রাণী কাঁকড়া, মাছি, প্রজাপতির মধ্যে মিল পাওয়া যায় না। কিন্তু এদের বহিঃকঙ্কালে মিল পাওয়া যায়। এমন উদাহরণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর ভ্রূণে আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শতাব্দীকাল আগে এমন মিল দেখে কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী (বিশেষত জার্মান প্রাণীবিজ্ঞানী আর্নেস্ট হেকেলের নাম উল্লেখ করা যায়) জীবের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তনের পথে মাঝে মাঝে পূর্ব ভ্রূণের গড়ন দেখা যাবে। নতুন প্রজাতির ভ্রূণের গঠনের সাথে অনেক আগের পূর্বসূরির ভ্রূণের গঠনে মিল দেখা গিয়েছিল। সেই সময়কার জীববিজ্ঞানীদের কেউ কেউ মনে করতেন ভ্রূণের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জীবের বিবর্তন বুঝতে পারা সম্ভব। আজকের যুগে এটি হুবহু স্বীকার না করা হলেও বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যেকার ভ্রূণের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্যভাবে চিত্তাকর্ষক এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

সকলেই হয়তো জানেন গুগলি শামুকের সঙ্গে সাঁতার কেটে বেড়ানো চিংড়ির তেমন সাদৃশ্য নেই। কিন্তু এই শামুকের জীবনচক্রে সাঁতার কেটে বেড়ানোর একটা পর্যায় রয়েছে। এই পর্যায়ে গুগলি শামুকের সঙ্গে সাইক্লপ্‌স্‌ের আমাদের সামনে এমন কিছু মিল ফুটে ওঠে ফলে মাঝে মাঝে আমরা চিনতে ভুল করে ফেলি। নিশ্চয়ই এদের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের ভ্রূণে অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণের মত এক সময় ফুলকাসদৃশ শ্বাসযন্ত্র দেখা যায়। মানুষের ভ্রূণে যে ফুলকার মত শ্বাসযন্ত্র দেখা যায় তা মাছের ফুলকার মত কাজ করে না। মানুষের বহু পূর্বের পূর্বসূরীরা ফুলকা ব্যবহার করতো। কিন্তু মানুষের কখনো প্রয়োজন পড়েনি ফুলকার। তবে মানুষের ক্ষেত্রে সেটি রইলো কেন? স্রষ্টা কি আমাদের সঙ্গে সত্যি সত্যি মশকারা করছেন?

অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন : হাওয়াইয়ের মাছি

সারা পৃথিবীতে প্রায় ২০০০ প্রজাতির প্রজাতির ফলের মাছি (ড্রসোফিলা) দেখা যায়। এদের এক চতুর্থাংশ হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে রয়েছে। যদিও এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন আমেরিকার নিউজার্সির রাজ্যের চেয়ে বড় নয়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ১৭ প্রজাতির ড্রসোফিলা মাছি পাওয়া গেছে যা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায়নি। একটি মাত্র দ্বীপে এই সতেরটি প্রজাতির মাছি রয়েছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিভিন্ন দ্বীপে নয়। এই ছোট্ট দ্বীপপুঞ্জে এত বেশি প্রজাতির ড্রসোফিলা মাছি রয়েছে, তার রহস্যটা কী? সম্প্রতি এইচ. এল. কার্সন, এইচ. টি. স্পেইথ, ডি. ই. হার্ভি ও অন্যান্যরা ড্রসোফিলা মাছির উপর গবেষণা করে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

আগ্নেয়গিরিও অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ গড়ে উঠেছে; দ্বীপগুলি কোনো মহাদেশের অংশ নয়। এদের বয়স ৫.৬ এবং ৫.৭ মিলিয়ন বছরের মধ্যে। মানুষের বসতি এই দ্বীপপুঞ্জে গড়ে ওঠার আগে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঝড় জলোচ্ছ্বাসের কারণে দুই-চারজন এই দ্বীপপুঞ্জে এসেছিল। প্রথম যখন কোনো একটি ডসোফিলা মাছির প্রজাতির পপুলেশন এখানে এসেছে, তারা মোটামুটি ফাঁকা বাস্তুসংস্থান এখানে পেয়েছে। কারণ পূর্বে অন্য অঞ্চলে এই ড্রসোফিলা মাছির পপুলেশনে প্রতিযোগীর সংখ্যা বেশি ছিল। এখানে প্রতিযোগিতা কম। ওই ড্রসোফিলা মাছির বংশধররা অনুকূল পরিবেশে বিবর্তনের ধারায় নতুন নতুন প্রজাতি-গঠন (adaptive radiation) করেছে। আমাদের মনে রাখা দরকার, হাওয়াই দ্বীপে যেসব প্রজাতির ড্রসোফিলা মাছি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে এমন কিছু মিল নেই যাতে দুই প্রজাতির ড্রসোফিলাকে এক প্রজাতির মনে হবে। বরং অন্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে পার্থক্য অনেক বেশি। সবচেয়ে বড় সাইজের ড্রসোফিলা এবং সবচেয়ে ছোট সাইজের ড্রসোফিলা মাছি এই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। এদের আচার-আচরণে প্রচুর পার্থক্য। কোনো কোনো প্রজাতির ড্রসোফিলা মাছির পরিবেশের সাথে এমনভাবে অভিযোজন ঘটেছে চিন্া করা যায় না। যেমন এক প্রজাতির ড্রসোফিলা মাছি মাকড়সার ডিমে পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের চারিদিকে ছড়ানো যে দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে এর বাইরে অন্য কোথাও এত বেশি প্রজাতির ড্রসোফিলা মাছি দেখা যায় না। এর সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে এই হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যখন ড্রসোফিলা মাছি এসেছে তখন ড্রসোফিলার জন্য এই অঞ্চলের মত ফাঁকা বাস্তুসংস্থান ছিল না। আগেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যদিও এটি একটি হাইপোথিসিস (অনুকল্প)। কিন্তু এই হাইপোথিসিসকে মেনে নেবার যৌক্তিক কারণ রয়েছে। জৈববিবর্তন-বিরোধীরা হয়তো একটি বিকল্প প্রস্াবনা দিতে পারেন। স্রষ্টা অন্যমনস্ক হয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে একের পর এক ড্রসোফিলার প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন। প্রজাতির আধিক্যে তার খেয়াল হয়েছে। পাঠকের হাতেই ছেড়ে দেয়া হল, কোন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যায়।

তত্ত্বের শক্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা

বিবর্তনের আলোয় তাকালে জীববিজ্ঞানকে সম্ভবত বৌদ্ধিক বিচারে সবচেয়ে সন্তোষজনক এবং অনুপ্রেরণাদানকারী বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কিন্তু বিবর্তনবোধ ব্যতীত বিজ্ঞানের এই শাখাটি রৌদ্রশুষ্ক তথ্যের সমারোহতে পরিণত হয়–এর মধ্যে কিছু তথ্য হয়তো আকর্ষণীয় মনে হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে এ থেকে অর্থপূর্ণ কোন চিত্র তৈরি করে না।

এ কথা বলার মনে এই নয় যে জীববিজ্ঞান ও বিবর্তন সম্পর্কে আমরা সবকিছুই ইতিমধ্যে জেনে গেছি। যে সমস্যার সমাধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, যে প্রশ্নের উত্তর এখনও জানা যায়নি জীববিজ্ঞানীরা এ সম্পর্কে সচেতন রয়েছেন। জীববিজ্ঞানের গবেষণায় শেষ সীমা বলে কিছু নেই। বরং বিপরীতটাই সত্যি। মতের ভিন্নতা এবং অমিল জীববিজ্ঞানীদের স্বাভাবিক বিষয়। বিকাশমান বিজ্ঞানের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এটি। বিবর্তন-বিরোধীরা ভুল করে বলেন অথবা ইচ্ছে করেই এমন করে ভুল করেন—'যেখানে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যেই বিবর্তন নিয়ে এত দ্বিমত তাহলে বিবর্তন তত্ত্বের মূল্য আর কি থাকে?' বিবর্তন-বিরোধীদের প্রিয় খেলা হচ্ছে সতর্কতা এবং দক্ষতার সাথে উদ্ধৃতি নির্মাণ করা। এটা দেখানো জৈববিবর্তন বিজ্ঞানীরা কোনো কিছুতেই একমত নয়, কোনো বিষয়েই ফয়সলা হয়নি। আমি এবং আমার কিছু সহকর্মী বিবর্তন-বিরোধীদের এই লেখা পড়ে খুব মজা পেয়েছি। বিস্মিত হয়েছি যখন দেখলাম আমাদের সম্পর্কে তাদের মত হচ্ছে আমরা নাকি সকলেই আসলে বিবর্তন তত্ত্বের বিরোধী!

আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই কোন কোন বিষয়ে বিবর্তন সম্পর্কে আমরা সন্দেহের ঊর্ধ্বে, কোন কোন বিষয়ে আমাদের আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। কোনো প্রমাণে যাদের আস্থা নেই, মনের দিক থেকে অন্ধত্ব, গোঁড়ামি কাটেনি তারাই ঐতিহাসিককাল থেকে পৃথিবীতে জৈববিবর্তনের বিরোধিতা করে আসছে। অন্যদিকে বিবর্তন প্রক্রিয়া পুরোপুরি বোঝার জন্য, জানার জন্য এ বিষয়ে আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। বিবর্তনের কোনো বিকল্প নেই আমাদের কাছে। এখনও আমরা বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে নতুন নতুন এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সব ফ্যাক্ট জানতে পারছি।

এটা সত্যি চমৎকার যে আজ থেকে প্রায় শতাব্দীরও অধিক সময় আগে ডারউইন কেমন করে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তনের কথা বলতে পারলেন! যেখানে তার হাতে তেমন কোনো আবিস্কৃত তথ্য ছিল না। ১৯০০ সালের পরে 'বংশগতিবিদ্যা' আণবিক বংশগতিবিদ্যার রূপ নিয়েছে। এবং গত দুই দশকে জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বোঝার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিস্কৃত হয়েছে। কিন্তু এরপরও জানার অনেক কিছু বাকি আছে আমাদের। বিজ্ঞানীদের জন্য এমন কথা উৎসাহব্যঞ্জক এবং তারা এমন কথা শুনলে খুশি হন। কল্পনা করে দেখুন তো, বিজ্ঞান সবকিছু জেনে ফেলেছে, আর কিছুর আবিষ্কারের দরকার নেই বিজ্ঞানের, রোজগার বন্ধ বিজ্ঞানীদের। কী দুস্বঃপ্ন!

বিবর্তন তত্ত্বের সঙ্গে কী ধর্মীয় বিশ্বাস সাংঘর্ষিক? না। জ্যোর্তিবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্ক রচনায় ধর্মগ্রন্থগুলোর কোনো ভূমিকা নেই। বিরোধ তখনই বাধে যখন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সংকেতগুলির কাল্পনিক ভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি তখন স্রষ্টাকেই প্রবঞ্চণার অভিযোগে অভিযুক্ত করতে হয়।

আমাদের সময়ের একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ পিয়ের টেইলহার্ড দ্য শার্ডিন (Pierre Teilhard de Chardin) একদা লিখেছিলেন : "বিবর্তনকে আমরা কী বলব? তত্ত্ব? প্রক্রিয়া? অনুকল্প? এরচেয়েও অনেক বেশি। সকল তত্ত্ব, সকল অনুকল্প এবং সকল প্রক্রিয়ার সাধারণ সূত্র এই জৈববিবর্তন তত্ত্ব। সবাইকে এর অধীনে থেকে নিজের বিশিষ্টতা প্রকাশ করবে। বিবর্তন এমন এক আলো যা সকল ফ্যাক্টকে আলোকিত করে, বিবর্তন এমন এক রেখা যার উপর সকল রেখার আপতন ঘটে। এর নাম বিবর্তন তত্ত্ব।" অবশ্যই বিজ্ঞানীদের একাংশ, দার্শনিক এবং ধর্মবিদদের একাংশ টেইলহার্ডের বক্তব্যের সাথে সম্মত হবেন না। তার বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্য সর্বজনীনতার ধারণা ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই টেইলহার্ড একজন প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তার এই বিশ্ববীক্ষা নির্মাণে খ্রিস্ট ধর্মীয়ভাবনা একটি মাইল ফলক। এমন কী তার বিশ্ববীক্ষায় কখনও বিজ্ঞান ও বিশ্বাস বিভাজিত হয়নি। আরো অনেক মানুষের মত টেইলহার্ডের মধ্যেও এই দুইয়ের সহাবস্থান ছিল। টেইলহার্ড ছিল একজন ক্রিয়েশনিস্ট। কিন্ত তিনি বিবর্তনের আলোকেই স্রষ্টার সৃষ্টিকে হৃদয়ঙ্গম করতে চেয়েছেন।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি ও লক্ষ্য : একটি অবস্থানপত্র

বারবারা ফরেস্ট

অধ্যাপক বারবারা ফরেস্ট

আমেরিকার লুসিয়ানা অঙ্গরাজ্যের সাউথইস্টার্ন লুসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক বারবারা ফরেস্ট। তিনি আমেরিকার National Center for Science Education (NCSE)–এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য এবং Americans United for Separation of Church and State–এর বোর্ড অব ট্রাস্টি।

আমেরিকায় জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে 'বিজ্ঞানের মোড়কে' ঢাকা ধর্মীয় আন্দোলন, চলতি ভাষায় যাকে বলে 'পরিকল্পিত/বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা' বা 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনে'র তীব্র সমালোচক অধ্যাপক বারবারা। ২০০৫ সালে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের বিরুদ্ধে কিট্সমিলার বনাম ডোভার এরিয়া ডিসট্রিক্ট মামলায় জৈববিবর্তনের পক্ষে উপস্থিত ছয়জন বিশেষজ্ঞ সাক্ষীর একজন তিনি। Paul R. Gross-এর সাথে যৌথভাবে রচিত ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের আদি-অন্ মূল উৎপাটন করে লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : *Creationism's Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design*, Oxford University Press, 2004। উক্ত বইয়ে ড. বারবারা এবং ড. পল আর গ্রস বিজ্ঞান-বিরোধী রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীর নতুন রূপের আন্দোলন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা ইত্যাদি পুঙ্খাপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কীভাবে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থায় ইহজাগতিক বিজ্ঞান শিক্ষাপাঠ্যক্রমকে বাতিল করে, পরিবর্তন করে, প্রায় ধ্বংস করে খ্রিস্টান ধর্মীয় মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদের এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার প্রথম কৌশলী (ধর্মীয় স্বাধীনতার ধুয়ো তুলে) আঘাত এসেছে জীববিজ্ঞানে, জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে। পরবর্তী টার্গেট গোটা বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যবস্থা। আইডিবাদীদের দীর্ঘদিনের এই চক্রান্ত বাস্তবায়নে আর্থিক, প্রশাসনিক, নৈতিকভাবে সহযোগিতা-সহায়তা করে যাচ্ছে আমেরিকার বিভিন্ন রক্ষণশীল খ্রিস্টান ধর্মীয়গোষ্ঠী, কিছু গণমাধ্যম, রাজনৈতিক দল, বেসরকারি সংস্থা, আর্থিক সংস্থা। তাদের এ পরিকল্পনার গালভরা মুখরোচক নাম দিয়েছে Wedge strategy, মানে 'গোঁজ/কীলক কৌশল'। এর দ্বারা তারা আদতে বোঝাতে চায় : 'আমাদের জ্ঞানের জগতে অনেক ঘাটতি আছে। অনেক কিছু জানার বাকি আছে। প্রাণের উৎপত্তি এবং জীববৈচিত্র্যের জটিলতা নিয়ে বর্তমানের বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছে না। জৈববিবর্তনের মত সেক্যুলার বিজ্ঞান শিক্ষা বা গবেষণা দ্বারা এ অপূর্ণতা দূর করা কখনও সম্ভব নয়। তাই এখানে (জ্ঞানের ঘাটতি পূরণে) গোঁজ বা কীলক হিসেবে বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পক স্বত্তাকে (ঈশ্বর) মেনে নিতে হবে; এবং ইহজাগতিক বিজ্ঞানশিক্ষা বাদ দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন ধরনের (ধর্মাশ্রয়ী) বিজ্ঞান চালু করতে হবে।' আইডি'র এ ধরনের প্রচেষ্টা বা উদ্দেশ্য উন্নত বিশ্বের বিজ্ঞানশিক্ষার নীতিমালার সঙ্গে মোটেও খাপ খায় না, তেমনি আমেরিকার সংবিধানের মূলচেতনা 'a wall of separation of church and state'-এর বিরোধী। আমেরিকার সংবিধানের ১ম সংশোধনীতে বলা হয়েছে : "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof…" এবং সংবিধানের আর্টিকেল-VI-এ স্পষ্টই বলা হয়েছে "...no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States." ধর্মকে রাষ্ট্রীয় সকল কার্যক্রম এবং শিক্ষাক্রম থেকে পৃথক রাখার জন্য আমেরিকার সুপ্রিমকোর্টেরও বিভিন্ন সময়ের নির্দেশনা রয়েছে। যেমন ১৮৭৯ সালের 'র‍্যানোল্ডস বনাম যুক্তরাষ্ট্র' (Reynolds v. United States) এবং ১৯৪৭ সালের 'ইভারসন বনাম শিক্ষাবোর্ড' (Everson v. Board of Education) মামলার রায়।

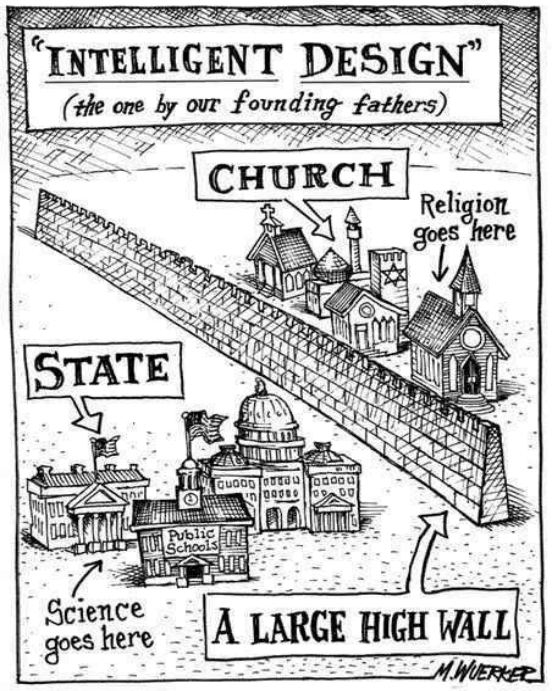

আমেরিকার সকল রাজ্যে একক কোনো শিক্ষাব্যবস্থায় পরিচালিত হয় না। বিভিন্ন রাজ্যের আলাদা আলাদা শিক্ষাবোর্ড তাদের পচ্ছন্দমাফিক পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনতে পারে। গত কয়েক দশকে আমেরিকার ক্রিয়েশনিস্ট বা সৃষ্টিবাদী আন্দোলন 'বিজ্ঞানের মোড়কে' ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আন্দোলন নাম ধারণ করেছে। যদিও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আন্দোলনের প্রবক্তরা মুখে এ বিষয়টি (ধর্মের সাথে সংস্পর্ক) সরাসরি স্বীকার করতে চান না। তারা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে প্রচলিত বিজ্ঞানের বিকল্প হিসেবে 'নতুন ধরনের বিশেষ জ্ঞান' হিসেবে প্রচার করেন। গত কয়েক বছরে আমেরিকার বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের শিক্ষাবোর্ডের কমিটিতে আইডি সমর্থক রক্ষণশীল গোষ্ঠী নির্বাচিত হয়েছেন। সেখানে তারা স্কুলের পাঠ্যসূচিতে জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরোধিতা করে রচিত আইডি মার্কা গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। জীববিজ্ঞানের ক্লাসে জৈববিবর্তন পড়ানোতে বাধ সেধেছেন। আইডিকে 'বিজ্ঞান' দাবি করে স্কুল শিক্ষার্থীদের জীববিজ্ঞানের ক্লাসে একে পড়ানোর জন্য 'সমান সময়' বরাদ্ধের প্রয়াস নিয়েছেন। তবে আশার কথা, বিজ্ঞানের জগতে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ মোটেই সহজভাবে নেননি আমেরিকার উদারপন্থী এবং সেক্যুলার ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বিজ্ঞানী, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ। এমন কী আইডি'র বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন আমেরিকার প্রচুর ধর্মীয় নেতা এবং সংগঠন। জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে চরমপন্থী ধর্মান্ধগোষ্ঠীর আক্রমণ নতুন নয়। ডারউইনের সময় থেকে তা চলে আসছে। বিভিন্ন সময় নতুন বোতলে পুরাতন মদ ঢালা হয়েছে। বিজ্ঞানকে বিকৃত করা, বিজ্ঞানকে ধর্মাশ্রয়ী রূপ প্রদান, জনসাধারণ মধ্যে বিজ্ঞানচেতনা গড়ে তুলতে বাধা ইত্যাদি আমেরিকার এই

মৌলবাদী গোষ্ঠীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। এর জন্য যা যা করা দরকার (কখনও ছদ্মনামে, কখনও নাম পাল্টিয়ে-ভাঙিয়ে) তারা তা করছে।

আমাদের এ চলমান সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সবচেয়ে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত আমেরিকায় বিজ্ঞান শিক্ষার জগতে আইডির সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র, বিজ্ঞান (বিশেষ করে জীববিজ্ঞান এবং জৈববিবর্তন) বিরোধিতায় আইডি'র বিরামহীন মিথ্যাচার এবং বিকৃত-বিভ্রান্তকরণে আইডি'র ধর্মাশ্রয়ী চরিত্র-কলাকৌশল-পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে দক্ষতার সাথে অনবদ্য বয়ান দিয়েছেন অধ্যাপক বারবারা ফরেস্ট। ২০০৭ সালের মে মাসে আমেরিকার খ্যাতনামা বিজ্ঞানভিত্তিক সংগঠন Center for Inquiry এর এক অনুষ্ঠানে প্রবন্ধটি 'Understanding the Intelligent Design Creationist Movement: Its True Nature and Goals' শিরোনামে উপস্থাপিত হয়। লেখাটির পড়তে পারবেন এখান থেকে : http://www.centerforinquiry.net/uploads/attachments/intelligent-design.pdf। চার্লস ডারউইনের জন্মদ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষে *ডারউইন স্মরণিকা*'র জন্য লেখা আহ্বান করলে অধ্যাপক বারবারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথেই তার এ প্রবন্ধটি আমাদেরকে প্রদান করেন। এমন কী প্রচণ্ড ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও তিনি প্রবন্ধটি অনুবাদের বিষয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং প্রবন্ধটিতে সংযোজিত কিছু চিত্রও আমাদের ইমেইলে পাঠিয়েছেন। এ জন্য আমরা তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। অধ্যাপক বারবারার প্রবন্ধটি ঈষৎ সংক্ষিপ্তাকারে যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন সিদ্ধার্থ কুমার ধর ও অভীক দাস (শিক্ষার্থী, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট)। উল্লেখ্য, বাংলায় অনুবাদের সমস্ত দায়ভার অনুবাদকদ্বয় এবং সম্পাদকের। মূল লেখক বারবারা ফরেস্ট কিংবা Center for Inquiry প্রতিষ্ঠানের কোনো সংশ্রব নেই।—সম্পাদক।

১. প্রাককথন : বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা (আইডি) নিয়ে চলমান বিতর্ক যে বিষয়টিকে সংকটাপন্ন করে তুলছে?

এই প্রবন্ধে আমেরিকাতে 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা'র (ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, সংক্ষেপে আইডি) প্রচারণা-আন্দোলন, তৎপরতা ইত্যাদি উপর বিশ্লেষণ করা হবে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে উল্লেখিত কিছু কারণের ভিত্তিতে এখন থেকে 'সৃষ্টিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা' নামে অভিহিত করা হবে। বিশেষত এই প্রবন্ধে ক্রিয়েশনিজম বা সৃষ্টিবাদ প্রচারকারী সংগঠন, এর ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রেক্ষাপট, কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য এবং তাদের জনসম্পৃক্ততার উপর অনুসন্ধান চালানো হবে।

আইডি'র প্রচারণা যে আমেরিকান সৃষ্টিবাদী প্রচারণার আধুনিকতম সংস্করণ, তা এই প্রবন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করা হবে। 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা' মতবাদকে (একজন অলৌকিক সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস—নিশ্চিৎভাবেই এ ধরনের ধর্মীয় মতাদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করে) উদ্দেশ্যমূলকভাবে জৈববিবর্তন তত্ত্বের 'বিকল্প বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' দাবি করে প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে ক্রিয়েশনিস্টরা আমেরিকায় সরকারি স্কুলগুলোতে জৈববিবর্তন তত্ত্ব পাঠদান বাধাগ্রস্থ করা, সীমিত করা অথবা ভিন্নরূপে 'ধর্মীয় সৃষ্টিবাদ' বিজ্ঞানের ক্লাসে পড়ানো জন্য (জৈববিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে) 'সমান সময়' বরাদ্দের দাবিতে কয়েক যুগ

ধরে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই আইডি'র নামে এ ধরনের সৃষ্টিবাদী তৎপরতা স্বাভাবিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শিশু শিক্ষাক্রম (বিশেষ করে শিশুদের বিজ্ঞানশিক্ষা) এবং সাংবিধানিকভাবে 'ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথককৃত অবস্থানে'র যে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে—তার প্রতি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। (Forrest and Gross, 2005)। রাজনৈতিক ও আইনগত প্রতিবন্ধকতা (Kitzmiller et al. v. Dover Area School District, 2005) সত্ত্বেও ক্রিয়েশনিস্টদের চলমান অপতৎপরতায় এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সর্বোপরি এদেশের বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও সরকার ব্যবস্থার ধর্মনিরপেক্ষ-ইহজাগতিক অবস্থানকে নস্যাৎ করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে; এবং এর মাধ্যমে তারা আমেরিকার ঐতিহ্যবাহী ইহজাগতিক-ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ক্রমশ দুর্বল করে তুলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে গৃহীত ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং প্রত্যেক শিশুর সরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষালাভের অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা ও সংহতির অন্যতম উৎস। সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত 'ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক অবস্থানের' বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের বৈচিত্র্যময় বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থায় একদিকে যেমন জনগণকে কোনো বিশেষ ধর্মের নিপীড়ণের হাত থেকে রক্ষা করেছে, তেমনি সরকারকে জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতাও প্রদান করেছে। আইডি আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় সংগঠন ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড কালচার তাদের বিজ্ঞান ও ধর্মনিরপেক্ষ-ইহজাগতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে সরকারি স্কুলগুলোকে ব্যবহার করছে। কারণ তাদের ভাষায় 'বস্তুবাদী বিজ্ঞান ও এর নৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে হবে এবং এর বদলে 'ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট বিশ্বজগৎ'–এরূপ আস্কিক্যবাদী আধ্যাত্মিক চেতনা প্রতিস্থাপন করতে হবে ও আমাদের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বাইবেলীয় সৃষ্টিবাদের সম্প্রসারণ করতে হবে।' (Discovery Institute, 1998)।

আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা এবং ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকী অবস্থান (speration of Church and State) পরস্পর নির্ভরশীল। এদেশের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের সক্ষমতা এই দুটি বিষয়ের সংরক্ষণ এর উপর নির্ভর করে। যদিও সংবিধানে আনীত প্রথম সংশোধনী কর্তৃক প্রদত্ত 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বাস্তবায়ন করা সরকারের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে দুরুহ হয়ে পড়ে। তারপরও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি স্কুলগুলোতে সব ধর্মের ৯০% শিশুকে স্বাধীনভাবে মুক্ত পরিবেশ শিক্ষা প্রদানে সমর্থ হয়েছে। এটি তাদেরকে অর্থনৈতিক ও উন্নত নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও কৌশলসমূহ অর্জনে সহযোগিতা করে। (Americans United for Separation of Church and State, Doc. 623)। আমেরিকার সরকারি স্কুলগুলোতে সৃষ্টিবাদ পড়ানোর সুযোগ দেয়ার ফলে যে প্রভাব তৈরি হয়েছে তা শুধু আমাদের জাতীয় শিক্ষাক্রমের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বের অন্যতম বিজ্ঞান-পত্রিকা 'সায়েন্স'-এ একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধে প্রকাশিত এক জরিপে দেখা যায় বিশ্বের ৩৪টি উন্নত দেশের মাঝে জৈববিবর্তনে আস্থাশীল প্রাপ্তবয়স্কদের সংখ্যার দিক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান নীচের দিক থেকে দ্বিতীয়। যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ জনগণের মাঝে জৈববিবর্তনের গ্রহণযোগ্যতা

জাপান ও ইউরোপের থেকেও কম। অবশ্যই এ অবস্থার প্রধান কারণ হচ্ছে 'সম্প্রসারিত মৌলবাদ এবং বিজ্ঞানের রাজনীতিকরণ।' (Miller et al., 2006)। বিজ্ঞান, বিশেষত জীববিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগতি জীবনের মানোন্নয়নে যেভাবে ভূমিকা রাখছে, তাতে একবিংশ শতাব্দী জৈবপ্রযুক্তির শতাব্দী হিসেবে পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু সৃষ্টিবাদী আন্দোলন মার্কিন জনগণের বর্তমান করুণ বিজ্ঞানসচেতনতাকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যাবে, যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর সমাজব্যবস্থার অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কখনই সমীচিন হবে না।

২. ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রকৃত স্বরূপ

আমাদের এখানে আইডি'র সৃষ্টিবাদী কার্যক্রমের প্রকৃত স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণের মনে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। এগুলো দূর করতে হলে প্রথমে আইডি'র স্বরূপ ও বিষয়সূচি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। গণমাধ্যমে অনেক সময় আইডি'র কার্যক্রমকে 'অ-বাইবেলীয়' (অর্থাৎ ধর্মাশ্রয়ী নয়) এবং (আইডিবাদীদের নিজস্ব সংজ্ঞানুসারে) একে 'বিকল্প বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা' সেই পুরাতন বাইবেলীয় সৃষ্টিবাদেরই এক নব্য সংস্করণ যা কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি স্কুলগুলোতে সংক্রমণ ঘটেছে। আইডি'র প্রস্তাবকদের বেশিরভাগই 'প্রাচীন পৃথিবীর সৃষ্টিবাদে' (Old Earth Creationism) বিশ্বাসী। এ মতবাদটি আশির দশকের তথাকথিত 'প্রগতিশীল' ক্রিয়েশনিজম থেকে প্রত্যক্ষভাবে বেড়ে ওঠা OEC-এর একটি রূপমাত্র। আইডি'র মতবাদটি খুব সংক্ষেপে হচ্ছে 'ক্রমবিকাশময় জটিল প্রাণ সৃষ্টিতে প্রকৃতি যুগপৎভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিশেষ বিশেষ সময়ে ঈশ্বরের সৃজনীক্ষমতার উপর নির্ভর করে।' তবে আইডি-প্রস্তাবকদের মধ্যে সকলে পুরোপুরি একমতের নন। তাদের মধ্যে কিছু মতভিন্নতা রয়েছে। বেশিরভাগ আইডিবাদী '(ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট) পৃথিবীর বয়স ৪৫০ কোটি বছর স্বীকার করেন।' (অর্থাৎ তারা ওল্ড আর্থ ক্রিয়েশনিস্ট)। আবার কেউ কেউ রয়েছেন 'নবীন পৃথিবী'তে বিশ্বাসী; এই ইয়ং আর্থ ক্রিয়েশনিস্টরা (YEC) মনে করেন আমাদের এ পৃথিবীর বয়স মাত্র ছয় থেকে দশ হাজার বছরের মধ্যে। (যেমনটা বাইবেলের জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে। বাইবেলের বর্ণনা থেকে আইরিশ ধর্মযাজক জেম্‌স আসার (১৫৮১-১৬৫৬) পৃথিবীর বয়স ছয় হাজার বের করেছিলেন)। আইডি আন্দোলনের নেতা (লিহাই বিশ্ববিদ্যালয়ের) অধ্যাপক মাইকেল বিহে'র মতো আবার কেউ কেউ আছেন যারা (জৈববিবর্তন তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য) মানুষ ও শিম্পাঞ্জী একই সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তিত হয়েছে তা স্বীকার করেন। কিন্তু আইডিবাদীরা সকলেই 'প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন'কে গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনীয় বিকাশের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। (আধুনিক জীববিজ্ঞান এবং বংশগতিবিদ্যার উত্তরোত্তর সাফল্য আর জৈববিবর্তন সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণার দ্বারা সম্পূর্ণ নিশ্চিৎ তথ্য লাভের ফলে–অনুবাদক) আইডিবাদীরাও তাদের পূর্বের সৃষ্টিবাদীদের মত একটি প্রজাতির সীমারেখার মাঝে সামান্য পরিমাণ বিবর্তনীয় পরিবর্তনকে স্বীকার করে নেন। যেমন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে পাখিদের বড় ঠোঁটের উদ্ভব হওয়া কিংবা পতঙ্গের

কীটনাশকবিরোধী সক্ষমতা অর্জন। অধ্যাপক বিহে অবশ্য প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোষীয় কাঠামো গঠনের সক্ষমতাকে অস্বীকার করেন। তার মতে 'কোষের গঠন এমনই জটিল প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যার উদ্ভব সম্ভব নয় এবং পরিবর্তনও সম্ভব নয়।' আইডিবাদী সকলেই বিশ্বাস করেন বিবর্তনের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা অবশ্যই ঈশ্বরের বিশেষ সৃজনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ। (Scott, 2004)।

১৯৯৬ সালে Center for Science and Culture (CSC) আইডি মতবাদ প্রচারণার হেডকোয়ার্টার হিসেবে স্থাপন করা হয়। এটি সিয়াটলে অবস্থিত আমেরিকার রক্ষণশীলগোষ্ঠীর 'থিংক ট্যাংক' প্রতিষ্ঠান Discovery Institute (DI)-এর একটি অঙ্গসংস্থা। সিএসসি প্রতিবছর জীবজগৎ বা প্রকৃতিতে 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা' আলামত খোঁজার জন্য ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মার্কিন ডলারের লাভজনক বৃত্তি ও সদস্যপদ প্রদান করে থাকে। যদিও এই বৃত্তি নিজস্ব মতাবলম্বী সদস্য ছাড়া সকলের জন্য উন্মুক্ত নয়। (Center for Science and Culture, 2007)। সিএসসি'র এই বিশাল অর্থবিত্তের যোগান আসে হাওয়ার্ড অ্যাহ্‌মেনসন নামের একজন ধনাঢ্য পৃষ্টপোষকের কাছ থেকে। যিনি সিএসসি'র

ধর্মীয় মিশনকে নিষ্ঠার সাথেই সমর্থন করেন। এছাড়া আরও কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন ম্যাকলিলান ফাউন্ডেশন এবং স্টুয়ার্ডশিপ ফাউন্ডেশন থেকেও অর্থের যোগান ঘটে। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 148-50, 266-67)। সিএসসি'র সহায়তাকারী কিছু সংস্থা রয়েছে। যেমন :

- Access Research Network (ARN) : এটি আইডি মতবাদ নিয়ে বিভিন্ন ভিডিওচিত্র, বই ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে।
- Intelligent Design Network (IDnet) : কানসাসভিত্তিক এই সংস্থা তাদের বিভিন্ন প্রদেশীয় সহযোগীর মাধ্যমে আইডি মতবাদ প্রচারে কাজ করে থাকে।
- Center and the Intelligent Design Undergraduate Research Center (IDURC) এবং Intelligent Design Undergraduate Research Center (IDURC) : এ দুটি ছাত্র সংগঠন আইডি সমর্থক স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের রিক্রুট করে। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 167-68)।

কিছু জনমত জরিপ এবং গণমাধ্যমে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' বা 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা' মতবাদটি বাইবেলীয় সৃষ্টিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে প্রচার পেলেও 'আইডি' সর্বক্ষেত্রেই বাইবেলে বর্ণিত 'ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি'র ধারণা উপর ভিত্তি করে রচিত। আইডি'র নেতারা স্পষ্টভাবে আইডিকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। বাইবেলে বর্ণিত 'ঈশ্বর'কে তাদের মতবাদের সেই বহু আলোচিত-বর্ণিত পয়েন্ট 'বুদ্ধিমান পরিকল্পনাকারী' (Intelligent Designer) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এবং নিজেদের সৃষ্টিবাদী (ক্রিয়েশনিস্ট) দাবি করেছেন। যদিও 'নবীন পৃথিবী'তে বিশাসী ইয়ং আর্থ ক্রিয়েশনিস্টদের সাথে বিতর্ক (যেমন পৃথিবীর বয়স বিষয়ক বিতর্ক) এড়াতে তাদেরকে রাজনৈতিক সহযোদ্ধা হিসেবে সঙ্গে রাখার প্রয়োজন থেকে আইডি'র নেতারা বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের অন্তর্গত জেনেসিস অধ্যায়কে সরাসরি তাদের মতবাদের ভিত্তি বলে প্রচার করেন না। তারা কিছুটা ঘুরিয়ে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টে 'রূপক ভাবে' বর্ণিত জনের গসপেল প্রচার করেন : In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. / The same was in the beginning with God. / All things were made by him; and without him was not anything made that was made. / . . . He was in the world, and the world was made by him,… (*সৃষ্টির শুরুতে শুধুমাত্র শব্দ ছিল, শব্দটি ছিল ঈশ্বরের সাথে, এবং শব্দটি ছিল নিজেই ঈশ্বর।/ ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তাই প্রযোজ্য/ সবকিছুই ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট এবং স্রষ্টা ব্যতীত কোনকিছু সৃষ্টি হয়নি।/ ...তিনিই একমাত্র ছিলেন এবং জগৎ তার দ্বারাই সৃষ্ট...*)। (John 1:1-3, 10, কিংস্ জেম্স ভার্সন)। খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তি হিসেবে আইডি মতবাদ প্রচার করাকে তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব বলে মনে করেন। যাতে বিজ্ঞানের জগৎ থেকে ক্রমাগত হুমকি আসছে, তা মোকাবিলা করতে পারেন। [১]

সিএসসি'র প্রাক্তন সদস্য এবং আমেরিকায় আইডি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ওয়াল্টার ব্রাডলি (Walter Bradley) তার 'প্রগতিশীল সৃষ্টিবাদ'-এ ঈশ্বর প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : '*প্রগতিশীল সৃষ্টিবাদীদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর অলৌকিক ও প্রাকৃতিক উভয় প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকেন।*' (Forrest, 2005a, 14)। ফিলিপ ই. জনসন, সিএসসি'র উপদেষ্টা এবং আমেরিকায় আইডি আন্দোলনের প্রথম সারির একজন নেতা। জনসন 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে' আইডিকে তুলে ধরেছেন এভাবে : "*আমি এবং আমার সহকর্মীরা আমাদের আন্দোলনকে সংজ্ঞায়িত করতে 'আস্কিীয় বাস্তবাদ' বা... 'স্রেফ সৃষ্টি' বলে থাকি। অর্থাৎ আমরা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করি ঈশ্বর উদ্দেশ্যগতভাবেই 'স্রষ্টা' এবং বিজ্ঞান, বিশেষ করে জীববিজ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে পরিমাপযোগ্য প্রচুর আলামত রয়েছে।*" (Forrest, 2005a, 31)। আইডি'র বুদ্ধিজীবী এবং সিএসসি'র ফেলো উইলিয়াম ডেম্বস্কি জোর দিয়ে বলেন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন মতবাদের 'ডিজাইনার'কে অবশ্যই 'অলৌকিক' বুদ্ধিমত্তার অধিকারী' হতে হবে। (Forrest, 2005a, 35)। এমন কী, ডেম্বস্কি বলেন নিউ টেস্টামেন্টে জনের গসপেলে বর্ণিত ঈশ্বরই হচ্ছেন আইডি মতবাদের সেই 'ডিজাইনার'। এর দ্বারা ডেম্বস্কি আইডিকে শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসে পরিণত করেছেন : "প্রকৃতপক্ষে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন হল জনের গসপেলের 'Logos theology'–যা 'ইনফরমেশন থিওরি'র বাগ্‌ধারায় পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।" (Forrest, 2005a, 26-27)। (গ্রিক শব্দ 'Logos' বলতে 'যিশু খ্রিস্ট'কে বোঝায়)। ডেম্বস্কি তার বই Intelligent Design: The Bridge Between Science and Theology-তে আইডি মতবাদকে বিশেষভাবে খ্রিস্টান দষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন। (Dembski, 1999)। আইডি মতাবলম্বীদের গুটিকয়েক বিজ্ঞানীদের মধ্যে একজন বায়োকেমিস্ট অধ্যাপক মাইকেল বিহে দাবি করেন, তিনি নাকি শুধুমাত্র বিজ্ঞানসম্মত কারণেই আইডি মত সমর্থন করেন! অথচ বিহে বলেন : "*খ্রিস্টানদের কাছে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্ববহন করে। কারণ এই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ (জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে) খ্রিস্টধর্মকে রক্ষার সুযোগ দেয়। খ্রিস্টানরা সারা পৃথিবী জুড়েই ভিন্নধর্মাবলম্বীদের সাথে বসবাস করে। আমরা সেইসব লোকের কাছে শুভ সংবাদ পৌঁছে দিতে চাই যারা এখনও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সম্পর্কে জানে না। আমরা ধর্মীয় বিশাসকে (জৈববিবর্তনের তরফ হতে) আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই। খ্রিস্টধর্মের বিরোধিতাকারীরা একদিকে যেমন বস্তুবাদকে তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তেমনি কেউ যদি চার্চে যেতে চায়, সেই পথটিতেও তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ...যদিও আমাদের এই পৃথিবীর এমনই অবস্থা, যেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বাস্ব-প্রমাণ পর্যবেক্ষণ করা কষ্টসাধ্য, কিন্তু এরপরও ঈশ্বরের বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা হতে উৎসারিত আমাদের এই পৃথিবীতে বস্তুবাদের জন্য কঠিন সময় অপেক্ষা করছে।*" (Behe, 1998)।

এ রকম অসংখ্য তথ্যপ্রমাণ রয়েছে, যার সাহায্যে দেখানো যায় 'আইডি' মোটেও কোনো বিজ্ঞান নয়, (সম্পূর্ণ ধর্মাশ্রয়ী মতবাদ)। আইডিবাদীরা আমেরিকার সাধারণ জনগণ ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের কাছে আদতে 'বিজ্ঞানের মোড়কে' ধর্মকে উপস্থাপন করছেন। তারা এ মতবাদকে রক্ষণশীল খ্রিস্টিয় মতাদর্শের দৃষ্টিতে দেখেন। প্রচুর বিশেষজ্ঞ-গবেষক আইডিকে আদ্যপান্ত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানের সাথে আইডি'র মোটেও কোনো সম্পর্ক নেই। বিশেষজ্ঞদের এই বিশ্লেষণ/রিপোর্ট বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে।[২]

'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইডি পড়ানো সংবিধানসম্মত কিনা'—কিট্‌সমিলার বনাম ডোভার এরিয়া স্কুল ডিসট্রিক্ট মামলার বাদী এসব রিপোর্টের বেশিরভাগ আদালতে উপস্থাপন করেছিলেন। বিচারক জন. ই. জোন্‌স-III (পেনসিলভেনিয়ার মধ্য ডিসট্রিক্ট) কর্তৃক এই মামলার রায়ে 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইডি পড়ানো' সংবিধান পরিপন্থী হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ, আইডি আইনী মানদণ্ডে অনুত্তীর্ণ হয়েছে।

যেহেতু আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, গবেষণা প্রক্রিয়া, কার্যক্রম ইত্যাদি অস্বীকারের উপরই আইডি'র সৃষ্টিবাদ দাঁড় করানো হয়েছে, তাই আদালতে আইডি'র বৈজ্ঞানিক পরিচয়হীনতার প্রমাণ বিচারক জোন্‌সের কাছে তেমন আশ্চর্যজনক ছিল না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবশ্যই পরীক্ষণযোগ্য হাইপোথিসিস প্রয়োজন। আইডিবাদীদের কথিত 'বুদ্ধিমান পরিকল্পনাকারী' কিংবা অন্য কোনো অপ্রাকৃত-অলৌকিক স্বত্তার কার্যক্রম পরীক্ষণযোগ্য নয়। (অন্ত আজ পর্যন্ কেউ এরকম 'অনুমানমূলক ধারণা'কে পরীক্ষা করার কোনো উপায় আবিষ্কার করতে পারেনি)। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতিকে তাই অনেক সময় 'লৌকিক-প্রাকৃতিক পদ্ধতি' নামে আখ্যায়িত করা হয়। প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাবলীকে শুধুমাত্র লৌকিকভাবে ব্যাখ্যা দানের মধ্যেই বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যার জন্য অলৌকিকতা আরোপ করার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানীদের কাছে 'অকার্যকর' বলে কয়েক শতাব্দী আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তবু পূর্বের সৃষ্টিবাদী মহলের মত বর্তমানের আইডিবাদীরা বলেন, 'আধুনিক বিজ্ঞানে 'অলৌকিকতা'কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ না বিষয়টি বিজ্ঞানের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের পরিচায়ক। '*ডারউইন অন ট্রায়াল*' বইয়ে আইডি'র অন্যতম নেতা ফিলিপ জনসন বলেন '*বিজ্ঞানীরা ন্যাচারালিজমের প্রতি অন্ধভাবেই মোহগ্রস্ত। শুধুমাত্র এ কারণেই বিজ্ঞানী মহলে জৈববিবর্তন তত্ত্ব স্বীকৃত।*' (Johnson, 1991)। ১৯৮৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট 'Edwards বনাম Aguillard' মামলায় যখন আইডি মতবাদ শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করাকে অসাংবিধানিক বলে রায় দিলেন, তখন জনসনের মন্তব্য হচ্ছে : "*ক্রিয়েশনিস্টরা এ মামলায় হেরে গেছেন শুধুমাত্র বিজ্ঞানী মহলে 'বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক-লৌকিক' সংজ্ঞা রয়েছে, তা ক্রিয়েশনিস্ট মতবাদকে অন্যায্যভাবে বিজ্ঞান থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ফলে ক্রিয়েশনিজমকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ক্রিয়েশনিস্টদেরই অলৌকিকতার সাথে মিলিয়ে বিজ্ঞানের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করতে হবে।*" জনসন আরো বলেন, '*বিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেখানে আমরা (ক্রিয়েশনিস্ট) নিজেদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি।*' (Nelson, 2002, 3)। এভাবেই আইবাদীরা তাদের প্রচারিত সৃষ্টিবাদকে নিজেদের পছন্দমত তৈরি করা বিজ্ঞানের অকার্যকর এবং প্রাগৈতিহাসিক সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত করছে; যা আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার 'যৌক্তিক-লৌকিক' ব্যাখ্যার জন্য অযাচিতভাবে অলৌকিকতাকে টেনে আনে।[৩] এমন কী, প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা যেগুলো এখন পর্যন্ পরীক্ষণযোগ্য নয়, বোধগম্য হয়নি আমাদের কাছে পরিষ্কারভাবে, এগুলোর উপর অলৌকিকতার ছাপ মারা হয়েছে নানা সময়ে—এসব বিষয়েও আইডিবাদীরা কোনো 'যথোপযুক্ত' ব্যাখ্যা হাজির করতে পারেননি।

৩. ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের ঐতিহাসিক ও আইনগত পটভূমি

আইডি'র সৃষ্টিবাদা প্রচারণা তৈরিই করা হয়েছে 'বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত জৈববিবর্তন তত্ত্ব'কে অস্বীকারের মাধ্যমে। জৈববিবর্তন-বিরোধী রক্ষণশীল ধর্মীয়গোষ্ঠী মনে করে ডারউইনের এই বিপ্লবী চিন্তাধারা কারণেই বর্তমান বিশ্বে নৈতিকতার স্খলন ঘটেছে। (Forrest, 2005b, 10-13)। ত্রিশোর্ধ বয়সে ফিলিপ ই. জনসন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেন। (Schoch, 1991)। কলেজে পড়ার সময় আইডি'র আরেক নেতা উইলিয়াম ডেম্বস্কি ক্যাথলিক থেকে ইভ্যানজেলিক খ্রিস্টিয় মত গ্রহণ করেন। (প্রটেস্টান্টদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে যিশু খ্রিস্টের ওপর বিশ্বাস রাখলেই আত্মার ত্রাণ হতে পারে–তাদেরকে '*ইভ্যানজেলিক*' বলে–অনুবাদক) তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন, একজন ধর্মবিশ্বাসী খ্রিস্টান হিসেবে জীবনের বাকি সময়টুকু আইডি মতাদর্শ প্রচার করে যেতে চান। ডেম্বস্কি'র ভাষায় : "*একজন নিবিড়ভাবে খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসীর কাজ হল যিশু প্রদত্ত জ্ঞান আহরণে যেসব বাধা-বিপত্তি রয়েছে তা অপসারণ করা... এবং আমাদের এ পৃথিবীতে এরকম যদি কিছু থেকে থাকে যা যিশু এবং তাঁর প্রদত্ত ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান বিশ্বাসী জনগণের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করছে তা হল ডারউইনের এই প্রাকৃতিক নির্বাচন দৃষ্টিভঙ্গি।*' (Benen, 2000, 14 দ্রষ্টব্য)। আমেরিকায় আইডি প্রচারণার ইতিহাস এরকম ব্যক্তিগত জীবনাচরণে, ধ্যান-ধারণায় পূর্ণ।

যাহোক, আইডিবাদী বা অন্য যারা নিজেদের ধর্মীয়বিশ্বাস আর আদর্শগত কারণে জৈববিবর্তনের বিরোধিতা করে থাকেন, আমেরিকার শিক্ষাক্রমে বিজ্ঞানের নাম ভাঙিয়ে নিজেদের বিবর্তন-বিরোধী ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাসের প্রচারণা চালাতে গিয়ে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। বিশেষ করে সরকারি স্কুলগুলোতে। আদালত সুস্পষ্টরূপে রায় দিয়েছে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতা-আর্থিক সহায়তায় সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধরনের সৃষ্টিবাদের পাঠদান অসাংবিধানিক। কারণ তা প্রকান্তরে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রচার করে। ২০০৫ সালের Kitzmiller মামলার রায় ছাড়াও সরকারি স্কুলগুলোতে সৃষ্টিবাদের প্রচার-প্রসার রোধে আমেরিকায় আরো অন্ত নয়টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় রয়েছে। (Matsumura, 2001)। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য তিনটি মামলার রায় নীচে সংক্ষিপ্তাকারে দেয়া হল :

Epperson v. Arkansas, 393 U.S. 97 (1968) : ১৯৬৮ সালের পূর্বপর্যন্ সৃষ্টিবাদীরা বিভিন্ন রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলো থেকে জৈববিবর্তন পাঠ ব্যহত করার জন্য বিভিন্ন সংসদীয় আইন ব্যবহার করতেন। যেমন ১৯২৫ সালের টেনিসি অঙ্গরাজ্যের বাটলার অ্যাক্ট। (Tennessee Evolution Statutes, 1925)। *ইপারসন* মামলায় সুপ্রিমকোর্ট রায় দিলেন, আরকানসাস অঙ্গরাজ্যে (ক্ষমতায় থাকা রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীর করা) জৈববিবর্তন পাঠদানের বিরুদ্ধে যে আইন রয়েছে তা অসাংবিধানিক; এবং প্রাদেশিক সরকারগুলো কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনতে পারবে না। (Epperson, 1968)।

McLean v. Arkansas Board of Education, 529 F. Supp. 1255 (1982) : আদালতের রায়ে যখন জৈববিবর্তন পাঠ বন্ধ করার অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন সৃষ্টিবাদীরা নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। তারা দাবি করতে লাগলেন বিজ্ঞানের ক্লাসে জৈববিবর্তন পড়ানোর পাশাপাশি সৃষ্টিবাদ পড়ানোর জন্য 'সমান সময়' বরাদ্দ করতে হবে। এতে (তাদের বক্তব্য অনুযায়ী) 'ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষাদান' হবে। এজন্য তারা আরকানসাসে ১৯৮১ সালে করা অ্যাক্ট-৫৯০ এর মত কতিপয় আইনের দোহাই দিলেন, (ঐ আইনগুলো ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল ধর্মীয়গোষ্ঠীই করেছিল) যেগুলো ক্লাসে জৈববিবর্তন পড়ানোর সাথে সাথে সৃষ্টিবাদ পড়ানোর কথা বলে। ম্যাকলিয়ান মামলায় বিচারক উইলিয়াম ওভারটন অ্যাক্ট-৫৯০-কে অসাংবিধানিক বলে রায় দিলেন। যেহেতু ম্যাকলিয়ান মামলার রায় একটি জেলা কোর্টের রায় ছিল (U.S. District Court, Eastern District of Arkansas) তাই জেলা শহরের বাইরের সরকারি স্কুলগুলোতে আদালতের এই নির্দেশনা মানার বাধ্যবাধকতা ছিল না। এরপরও এটি পরিষ্কার ডিসট্রিক্ট আদালতের এ রায় পরবর্তী ক্রিয়েশনিজম সংক্রান্ত মামলাগুলোয় প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা তৈরিতে। বিচারক উইলিয়াম ওভারটন স্পষ্ট করে বলেছেন 'সৃষ্টিবাদ হল ধর্ম, এটি কোনো বিজ্ঞান নয়।' (McLean,1982)।

Edwards v. Aguillard, 482 U.S. 578 (1987) : আমেরিকার লুসিয়ানা অঙ্গরাজ্যে 'সরকারি স্কুলগুলোয় ভারসাম্য রক্ষা করে জৈববিবর্তন এবং ক্রিয়েশনিজমের জন্য সমান সময় বরাদ্দের নির্দেশনা' নামের আইনটি ১৯৮১ করা হয়েছিল (একই বছর আরকানসাস অঙ্গরাজ্যে করা অ্যাক্ট ৫৯০-এর অনুরূপ)। ১৯৮৭ সালের এডওয়ার্ডস্ মামলায় সুপ্রিমকোর্ট এক যুগান্তকারী রায় ঘোষণা করে। এর ফলে আমেরিকার সরকারি স্কুলগুলোর বিজ্ঞান ক্লাসে সৃষ্টিবাদ পড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। আদালত বললেন, 'লুসিয়ানার আইনটি অসাংবিধানিকভাবে ধর্ম-প্রচারের অনুমোদন দিয়েছে এবং এর পিছনে বিধানসভার উদ্দেশ্য ছিল 'এক অলৌকিক সত্ত্বা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছে'–এমন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বেগবান করা। (Edwards, 1987)। এডওয়ার্ড মামলার রায় এখন সৃষ্টিবাদ সংক্রান্ত সকল মামলায় বিচারকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রামাণ্য দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন মতবাদটি আগের যুগের সৃষ্টিবাদের একটি প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি। ১৯৮৭ সালে এডওয়ার্ড মামলা রায় ক্রিয়েশনিস্টদের বিপক্ষে চলে গেলে, ক্রিয়েশনিস্টরা নতুন কৌশল আঁটলেন। সুপ্রিমকোর্টের রায়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একদল ক্রিয়েশনিস্ট নতুন বক্তব্য হাজির করলেন। তাদের মতবাদে ব্যবহৃত পূর্বের পরিভাষার পরিবর্তন ঘটিয়ে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' নামক নতুন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। (Forrest, 2005a, 16-18; 2005b)। সিএসসি'র সদস্য চার্লস থাক্সটন, সহযোগী লেখক '*The Mystery of Life's Origin*' (Thaxton et al., 1984) বইয়ের। তিনিই ১৯৮৮ সালে (এডওয়ার্ড মামলার পরবর্তীতে) 'ক্রিয়েশন' শব্দের পরিবর্তে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' নামক পরিভাষার পরিচিতি ঘটান। (Witham, 2002, 221)। এমন কী, আইডিবাদীদের কাছে বিখ্যাত বই *Of Pandas and People*-এর সহরচয়িতা, সিএসসি সদস্য ডিন এইচ. ক্যানিয়ন যিনি স্বঘোষিত 'সৃষ্টিবাদী বৈজ্ঞানিক' ২০০০ সালে অকপটে স্বীকার করেছেন ' ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আন্দোলন সম্পূর্ণই পূর্বের সৃষ্টিবাদের বৌদ্ধিক অনুগামী।' (Wiker, 2000)।

পূর্বের সৃষ্টিবাদীরা কয়েক যুগ ধরে জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে যেসব বিরোধিতা-সমালোচনা করে আসছেন, আইডিবাদীরাও হুবহু একই ভাষায় সেইসব বিরোধিতা করেন জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে। (Forrest, 2005a, 19-22)। তবে তারা নিজেদের বিপদের ভার কমানো জন্য 'নবীন-পৃথিবী'তে বিশ্বাসীদের বক্তব্য (যেমন পৃথিবীর বয়স মাত্র দশ হাজার বছরের ভিতর, নুহের প্লাবনের গল্প, ইত্যাদি) এড়িয়ে যান। জানা কথা আইডিতে এই ধরনের পুরাতন ধ্যান-ধারণার বক্তব্য থাকলে খুব চট করেই আইডি জনসাধারণের সামনে 'নব্য সৃষ্টিবাদ' হিসেবে প্রতীয়মান হবে এবং নিশ্চিতভাবে আইনি পরাজয়ের সম্মুখীন হবে। এবং এর আইডি'র পৃষ্টপোষকরাও পিছুটান দেবে। আইবাদীদের নব নব কলাকৌশল (যেমন বিজ্ঞানের লেবাস ধারণ করা, জীববৈচিত্র্যের জটিলতা, প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে বর্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা ইত্যাদি সম্পর্কে নঞর্থক অর্থে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরা) ধারণের চেষ্টা থাকলেও আইডি নেতাদের বিভিন্ন সময়ের লেখনীতে খোলসা হয়ে গেছে আইডি'র সাথে ক্রিয়েশনিজমের আত্মার সম্পর্ক। আশা করি নীচের দুটি পয়েন্টে বর্ণিত উদাহরণ এ বিষয়ে বোঝার জন্য যথেষ্ট (Forrest, 2005c) :

*** জৈববিবর্তনের বাস্তবতাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি**

ক্রিয়েশন সায়েন্স : "জৈববিবর্তন কখনো বিজ্ঞানসম্মত গবেষণায় প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও এটিকে বৈজ্ঞানিকভাবে 'সত্য' বলে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। অনেক লেখকই এখনো একে 'জৈববিবর্তন তত্ত্ব' বলে থাকেন। আসলে এটা খুবই সাধারণীকরণ করে বলা। ...কিন্তু জৈববিবর্তন কোন 'বাস্ব ঘটনা' নয়, নয় কোনো 'তত্ত্ব', এমন কী নয় কোনো অনুকল্প (হাইপোথিসিস)। জৈববিবর্তন শুধুই একটি বিশ্বাস, এর থেকে বেশি কিছু নয়। (Henry Morris, *Evolution, Creation and the Public School*, Impact, March 1, 1973)।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : "জীবের বিবর্তন বাস্ব ঘটনা বলে আমাদের এখানে একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে। ...এটি প্রায় শোনা যায় জৈববিবর্তন না-কী নিছক কোনো তত্ত্ব নয়, একটি অনস্বীকার্য বাস্বতা! শুধুমাত্র সময়ের প্রেক্ষিতে চিন্তাধারার বিবর্তনকেই (পরিবর্তনকে) 'বাস্বতা' বলে মানা যায়। ...শিক্ষার্থীদের যদি প্রকৃত বিজ্ঞানশিক্ষা অর্জন করতে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই বাস্বতা এবং অনুমানের মধ্যে পার্থক্য করা শিখতে হবে। (Mark D. Hartwig and Stephen C. Meyer, 1993, *Of Pandas and People*, 154-157)।

*** ফসিল রেকর্ডে বিশাল শূন্যতা (জীবনের উদ্ভব, ঐশ্বরিক সৃষ্টির নির্দশন, আকস্মিকভাবে সৃষ্টির প্রসঙ্গ উপস্থাপন)**

ক্রিয়েশন সায়েন্স : "এককোষী অণুজীব এবং ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডের বহু অমেরুদণ্ডী পর্বের প্রাণীর মধ্যে বিশাল ফারাক রয়েছে। এককোষী অণুজীব থেকে অমেরুদণ্ডী পর্বের প্রাণীর উদ্ভবের কথা বলা হলেও অবিশ্বাস্যভাবে এদের মাঝে কোনো অন্তর্বর্তী ফসিলের (Transitional fossil) সন্ধান পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক গঠনের কোনো নিদর্শন ছাড়াই ফসিল রেকর্ডে আকস্মিকভাবে প্রজাতির আবির্ভাবের নমুনা রয়েছে। জৈববিবর্তনের মডেলে ফসিল রেকর্ডের এই বিশাল শূন্যতার গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা কিভাবে দিবে? ... বর্তমানের ফসিল সম্ভার পর্যবেক্ষণের নিরিখে বলা যায়, ভবিষ্যতে ফসিল সংগ্রহের মাধ্যমে এই শূন্যস্থান পূরণ করা অসম্ভব।" (Henry Morris, 1974, *Scientific Creationism*, 81, 87, 89)।

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : "যদি বলা হয়, ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডে প্রাণীকুলের উদ্ভব 'আকস্মিক' ভৌগলিক পরিবর্তনের কারণে হয়েছে, তাহলে এখানে ক্যাম্ব্রিয়ান ও ক্যাম্ব্রিয়ানপূর্ব যুগের অপেক্ষাকৃত সরল দৈহিক গঠনের প্রাণীদের মধ্যে যোগসূত্রকারী অন্তর্বর্তী ফসিলের অনুপস্থিতির প্রসঙ্গও চলে আসে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের প্রাণীদের কোনো সুস্পষ্ট পূর্বসূরি পাওয়া যায়নি ... এছাড়া সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায়, এই শূন্যতার কারণ হয়তো 'নিছক' মানুষের সংগৃহীত ফসিল রেকর্ডের অপর্যাপ্ত সংগ্রহ নয়।" (Stephen C. Meyer, 2004, *Intelligent Design: The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories*, Proceedings of the Biological Society of Washington 117 (2), 215)।

জৈববিবর্তনের বিরোধিতা করে এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণের মধ্য থেকে নির্বাচিত এই কয়েকটি উদাহরণ প্রমাণ করে আইডি পূর্বের সৃষ্টিবাদী তৎপরতার একটি নিছক ধারাবাহিক রূপ। ৮০'র দশকে আইনি লড়াইয়ে পরাজিত হবার পর থেকে, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ থেকে নিজেদের ধর্মাশ্রয়ী কার্যক্রমকে রক্ষার অভিলাস থেকে এবং সাধারণ জনগণ, বিচারব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের কাছ থেকে বাস্তবতাকে আড়াল করার প্রয়াসে সৃষ্টিবাদীরা তাদের প্রচারণাকে আসলে নব্য পরিভাষা 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' দিয়ে অভিহিত করছেন। (আইডির আইনগত, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণের আদ্যপান্ত বর্ণনার জন্য দেখুন: Brauer et al.,2005)।

৪। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আন্দোলনের লক্ষ্য ও রণকৌশল

ওয়েজ স্ট্র্যাটাজি : ১৯৯৮ সালের দিকে 'The Wedge' শিরোনামে Center for Science and Culture আগামী বিশ বছরের জন্য তাদের কর্মপরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ করেছে। সাধারণভাবে এটি 'ওয়েজ ডকুমেন্ট' নামে বেশি পরিচিত। (Discovery Institute, 1998; Forrest and Gross, 2004a, 2007a, ch. 2)। ফিলিপ জনসন তার গ্রন্থে রূপক অর্থে আইডিকে 'কীলক বা গোঁজের সাথে তুলনা করে বলেছেন ধাতব 'কীলক বা গোঁজ যেমন কাঠের গুড়ি ভেদ করে। আইডিবাদীদের প্রচারণা, আক্রমণাত্মক কার্যক্রমও তেমনি।

বইপত্র, ম্যাগাজিন প্রকাশ, ভিডিও তৈরি, বিভিন্ন ফোরামে লেকচার দানের মাধ্যমে আমেরিকার জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের মধ্যেকার বিজ্ঞানসচেতনতা ভেদ করে (মূলত নষ্ট করে) 'অতিলৌকিক ভাববাদের' ক্ষেত্র তৈরি করতে চায়। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজির শিক্ষক জন হাউট (John Haught) ফিলিপ জনসনের '*The Wedge of Truth*' (Johnson, 2000) বইয়ের রিভিউতে আইডি আন্দোলনের উদ্দেশ্যকে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এভাবে : "সত্যের গোঁজ বা কীলক (Wedge) জৈববিবর্তনের আধুনিক প্রাকৃতিক সংশ্লেষণী তত্ত্বকে অসংখ্য টুকরোয় বিদীর্ণ করবে। এর তীক্ষ্ণ ধারালো প্রান্তে রয়েছেন বুদ্ধিমান এবং উচ্চশিক্ষিত আইডিবাদী যেমন উইলিয়াম ডেম্বস্কি, মাইকেল বিহে এবং ফিলিপ জনসন নিজে। বস্তুবাদের অচলায়তনে জনসনের যুক্তি হাতুড়ির আঘাত করে। ওয়েজের (যা ইভ্যানজেলিক খ্রিস্টিয় সাংস্কৃতিক মতবাদে প্রভাবিত) মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের প্রাচীরে আঘাত হানা হবে, উন্মোচন করা হবে 'সংক্রামক বিবর্তনীয় মতবাদ'—যা বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মূল ভিত্তি।" (Haught, 2000, 11-12)।

দীর্ঘদিন ধরে ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট এবং সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড কালচার-এর আইডি ক্রিয়েশনিস্টরা তাদের ওয়েজ স্ট্র্যাটাজি বাস্তবায়নে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বাদ রেখে। ওয়েজ ডকুমেন্টে বর্ণিত কলাকৌশলগুলোর প্রথমেই রয়েছে 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা'র কথা। কিন্তু এ বিষয়টি সন্দেহজনক উপেক্ষিত রয়েছে তাদের কার্যক্রমে। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট তাদের মতাদর্শের লোকজনের জন্য 'গবেষণা'র সুযোগ প্রদানের কথা বলেছে। (পঞ্চম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ১৯৯২ সাল থেকে আইডি ক্রিয়েশনিস্টরা ব্যস্ কর্মসূচি পালন করে আসছেন। যেমন সম্মেলন, জনসভা, ব্লগিং, ওয়েব সাইট খোলা, রেডিও-টিভির প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ, ইত্যাদি। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, ch. 6-7)। (তাদের ওয়েজ স্ট্র্যাটাজি ডকুমেন্টে বর্ণিত প্রচারণার কৌশল বাস্তবরূপ দান করতে ১৯৯২ সাল থেকেই তহবিল সংগ্রহ করা হয়।) জনসম্পৃক্ততা বেশ ভালোই রয়েছে। সাবেক 'ক্রিয়েটিভ রেসপন্স কনসেপ্ট' (বর্তমানে CRC Public Relations নামে পরিচিত)-এর মত অনেক প্রতিষ্ঠানকে (যাদের গ্রাহকদের মাঝে রয়েছে Microsoft, Time Warner, Inc., the Walt Disney Company এবং অধুনাবিলুপ্ত Swift Boat Veterans) প্রচারণার কাজে ব্যবহার করেছে। (CRC Public Relations, 2007; Boehlert, 2004)। তবে আইডি'র নেতাদের জন্য জনসংযোগের জন্য সবচেয়ে ভালো প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে (যা তারা নিয়মত ব্যবহার করে থাকে)—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন চার্চ, শিক্ষাঙ্গনে নিযুক্ত তরুণ সমর্থক ও প্রতিনিধিবর্গ। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 268-70)।

আইডি'র ওয়েজ স্ট্র্যাটাজি বাস্বায়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় স্পষ্ট প্রতীয়মান। এটা বলা মোটেও অত্যুক্তি হবে না, 'ওয়েজ স্ট্র্যাটাজি' (যা আইডি আন্দোলনকে লজিস্টিক্স সার্পোট দিচ্ছে) সাংবিধানিক অধিকার 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'র পরিকল্পিত বাস্বায়নের নামে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সরকারি এজেন্ডায় ঢুকে পড়ছে। যদিও আইডি'র নেতারা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইডি পাঠদানের বিষয়ে তাদের নিজেদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি অস্বীকার করেন। (West, ২০০৫)। কিন্তু আইডি'র নেতাদের বহু উদ্ধৃতি এবং তথ্যপ্রমাণ রয়েছে যা উল্টোটাই প্রমাণ করে। ওয়েজ ডকুমেন্টে বর্ণিত একটি লক্ষ্য হচ্ছে *'প্রাথমিকভাবে দশটি রাজ্যের শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে 'আদর্শগত ভারসাম্যহীনতা' সংশোধন করবে এবং এ স্থলে ডিজাইন থিওরি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।'* কিছু নথিপত্রে এমনও তথ্য প্রকাশিত হয়েছে 'কৌশলগতভাবে বিজ্ঞানের ক্লাসে আইডি পাঠদান নিয়ে আইনি সমস্যা আছে। সরকারি স্কুলের পাঠ্যসূচিতে আইডি অন্তর্ভুক্ত করার ফলে যদি কোনো ধরনের আইনি সমস্যা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট সম্ভাব্য সকল আইনি সাহায্য দেবে। (Discovery Institute, 1998)। সিএসসি প্রোগ্রামের পরিচালক স্টিফেন সি. মায়ার সরকারি স্কুলের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য আইডি নিয়ে (যৌথভাবে) একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম *Intelligent Design in Public School Curricula: A Legal Guidebook*। (DeWolf et al., 2000)। গোটা বইটিই পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে প্রবন্ধাকারে *Utah Law Review* নামক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। (DeWolf et al., 2000)। *কিট্সমিলার* মামলার বিচার শুরুর কয়েক মাস আগে ২০০৫ সালের আগস্ট মাসে আইডি নেতা উইলিয়াম ডেম্বস্কি সরকারি স্কুলগুলোয় আইডিকে 'বিজ্ঞান' হিসেবে শিক্ষাদানের জন্য তার আকাঙ্ক্ষার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে অভিনন্দন জানান সরকারি বিজ্ঞানশিক্ষাক্রমে জৈববিবর্তনের পাশাপাশি আইডি পাঠদানকে সমর্থন করার জন্য–'প্রেসিডেন্ট বুশ সম্পূর্ণভাবে আইডিকে সরকারি স্কুলগুলোয় বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী।' (Dembski, 2005)। যাহোক, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইডি অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের ক্রিয়েশনিস্টদের নিরলস প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে—ওহিয়ো এবং কানসাস অঙ্গরাজ্যে বিজ্ঞানশিক্ষাক্রমে পরিবর্তন আনার জন্য তাদের সক্রিয় আন্দোলন। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, ch. 8)। রাজ্যজুড়ে তাদের কার্যক্রম, আন্দোলন ব্যাপক পাবলিসিটি পেয়েছে। এমন কী ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের মত প্রতিষ্ঠানও স্থানীয় প্রচারণায় যোগ দিয়েছে। ফলে দেখা যায় মনটানা'র ছোট্ট শহর ডারবি-ও আইডি ইস্যুতে তীব্রভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে। (Forrest and Gross, 2004b; Clark, 2004)।

কিট্সমিলার মামলায় আইডির ভরাডুবির পর ফিলিপ জনসনের মত নেতাও ভোল পাল্টে ফেলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আইডি অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে তার এতদিনকার ভূমিকা বেমালুম চেপে গিয়ে দোষ চাপালেন ডোভার স্কুলবোর্ডের গৃহীত আইডি পলিসির উপর। এমন কী আইডি'র বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বুশের সমর্থন নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন : "*নিজের পরিচিতির বাইরে গিয়ে আলোচনা করা আমি সমর্থন করি, কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশের মুখ থেকে কথাটি (আইডিকে সমর্থন দান) উচ্চারিত হওয়ার কারণে ইস্যুটি এখন অম্লক্ষারক রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে। ...আইডি বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিকভাবে রাজনৈতিক দোলাচলে ভাসতে দেখে আমি খুশি নই, বরং হতাশ হয়েছি।*" (D'Agostino, 2006, 33)।

ফিলিপ জনসন আইডি নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রাদেশিক ও জাতীয় পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে জড়িত। ২০০০ সালের আগস্ট মাসে কানসাস রাজ্যের শিক্ষাবোর্ডের নির্বাচনে তিনি এক ক্রিয়েশনিস্ট প্রার্থীকে অর্থসাহায্য ও জনসমর্থন দিয়ে সহায়তা করেছেন। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 221)। সরকারি স্কুলগুলোয় আইডি পাঠদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস থেকে অর্থ বরাদ্দের দাবিতে 'sense of the Senate' নামে একটি প্রস্তাবও তিনি তৈরি করেন। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 240-42)। প্রাক্তন সিনেটর রিক স্যান্টোরাম প্রস্তাবটি ২০০১ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে উপস্থাপন করেন বলে এর নতুন নাম হয় 'Santorum amendment'। সিনেটে পাশ হওয়ার পর একে 'কোনো শিশুই বাদ যাবে না'-বিলে (No Child Left Behind bill) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিনেটের কনফারেন্স কমিটি প্রস্তাবটির ভাষা সংশোধন করে। শেষে আইন প্রণয়ন সম্বন্ধীয় ইতিহাস বিভাগে পাঠিয়ে দেয়। স্যান্টোরাম আমেন্ডমেন্টের বর্তমান ভাষা হচ্ছে :

> একটি মানসম্মত বিজ্ঞান-শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তোলা যেন তারা বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত এবং পরীক্ষণযোগ্য তত্ত্বের সাথে 'বিজ্ঞানের নামধারী' ধর্মীয় এবং দার্শনিক দাবিগুলোর সাথে পার্থক্য করতে শিখে। বিজ্ঞানের বিতর্কিত বিষয়

(যেমন জৈববিবর্তন তত্ত্ব) শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পাঠ্যক্রম এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যমান সকল বৈজ্ঞানিক মতামত, বিতর্কিত হবার কারণ এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ কিভাবে সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 243)।

বিলটি সিনেটে প্রস্তাবিত হলে আমেন্ডমেন্টটি এরপরও ভাষাগত দুর্বলতার কারণে এটি 'আইন' হিসেবে পাস হয়নি। (Branch and Scott, 2003)। তবু এ ধরনের প্রাপ্তি আইডিপন্থীর কাছে অমূল্য। ফিলিপ জনসন তার কৌশলী রাজনৈতিক প্রচারণায় স্যান্টোরাম আমেন্ডমেন্টের পিছনে নিজের ভূমিকার কথা স্বীকার করে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন স্যান্টোরাম আমেন্ডমেন্টটি সরকারি স্কুলে আইডি অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করবে : "*সরকারি স্কুলগুলো স্যান্টোরাম আমেন্ডমেন্ট মেনে চলবে কিনা তা আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করবে ...কিন্তু এটি চমৎকার একটি শিক্ষানীতি উপস্থাপন করেছে। আইনি বাধ্যবাধ্যকতা না থাকলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের এটি মানা উচিৎ। এ আমেন্ডমেন্টটি সত্যের পক্ষে। সত্য প্রচারে আমাদের সকলের কাজ করা উচিত ...স্যান্টোরাম আমেন্ডমেন্ট (Santorum amendment) যদি শিক্ষাক্রমের গাইডলাইন হয়... তবে শিক্ষকরা ক্লাসরুমে জৈববিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে চলমান বিতর্ক... এবং জৈববিবর্তনের প্রমাণের অভাব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। একবার যদি এ আমেন্ডমেন্টটি শিক্ষাক্রমে নিয়ে আসা যায় তবে জ্ঞানের একটি নতুন দরজা খুলে যাবে, যা বন্ধ করা খুবই কষ্টকর হবে।*" (Johnson, 2003)।

স্বাভাবিকভাবেই এই আমেন্ডমেন্ট নিয়ে ক্রিয়েশনিস্টরা বিভিন্ন স্কুলবোর্ড এবং বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনে নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে একে ব্যবহার করেছে। (Matzke, 2005)। আরো যোগ করে বলা যায়, সরকারি স্কুলগুলোয় আইডিপন্থীরা যেসব সমস্যা তৈরি করছে, এই ফিলিপ জনসন তার পিছনে অনেকাংশেই দায়ী।

ওয়েজ স্ট্র্যাটাজি : শুধুমাত্র আইডিতে সীমাবদ্ধ নয়

সরকারি স্কুলে আইডি পাঠদানের চেষ্টা আইডিপন্থীদের বৃহত্তর লক্ষ্যের একটি নিছক আপাতদৃষ্ট অবয়ব মাত্র। কথিত 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' রক্ষার দাবিতে আন্দোলনরত কয়েকটি সমমনা বন্ধুসংগঠন নিয়ে তারা এমন একটি এজেন্ডা তৈরি করতে চাচ্ছে যা আমেরিকার সকল সেক্যুলার, ধার্মিক ব্যক্তি উভয়ের জন্যই বিরক্তির কারণ হবে। তারা এমন একটি দেশে এমন আন্দোলন করছে যেখানে এগুলি জানা মাত্রই সার্বিকভাবে প্রত্যাখাত হওয়া উচিৎ। সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড কালচার (সিএসসি)-এর পূর্ব নাম ছিল সেন্টার ফর দ্য রিনিউয়াল অব সায়েন্স এন্ড কালচার। এই 'রিনিউয়াল' পরিভাষাটি কয়েক বছর আগে বিজ্ঞানসম্মত এবং ইহজাগতিক ভাবার্থে প্রচার করা হয়েছিল।[৪] সিএসসি নাম পরিবর্তন করলেও তার উদ্দেশ্যকে ঢাকা দিতে পারেনি। সিএসসি ক্রিয়েশনিস্টরা এদেশের সেক্যুলার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঘাত করছে। এ রাষ্ট্রের স্থপতিরা ঈশ্বরবিশ্বাসী-নিরীশ্বরবাদী, ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের জন্যই বসবাসের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় কাঠামো করে ছিলেন। কিন্তু আইডিপন্থীদের এই ধর্মীয় আগ্রাসন খ্রিস্টান-অখ্রিস্টান নির্বিশেষে সকলের জন্যই ক্ষতিকর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্যুলার এবং সাংবিধানিক গণতন্ত্র আলোকায়ন (Enlightenment) বা রেনেসাঁস যুগের ফসল। যাকে ডাকা হয় '*Age of Reason*' বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের (১৭৪৩-১৮২৬) কাছে যৌক্তিক অন্বেষা হল মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অধিকার। তিনি বিশ্বাস করতেন খ্রিস্টান ধর্মের উদ্ভবকে স্বাধীন, যৌক্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় : "*বৌদ্ধিক চেতনা আর এবং মুক্ত অন্বেষা হল অপবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একমাত্র কার্যকর প্রতিনিধি ...রোমান সরকার তৎকালীন মানুষের মুক্ত অন্বেষাকে অনুমোদন না দিলে খ্রিস্ট ধর্ম কখনো দাঁড়াতে হতে পারত না। মানষের মুক্তচিন্তাকে যদি উৎসাহিত করা না হতো তবে খ্রিস্টধর্ম থেকে দুর্নীতি অপসারিত হতো না।*" (Jefferson, 1782)। মার্কিন রাষ্ট্রনায়ক জেফারসন মানুষের বৌদ্ধিক স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার মাঝের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন : "*আমরা গ্রহণযোগ্য বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি সরকারি আদেশ এবং আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা–এই বিশাল কৌতুহলউদ্দীপক প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছি। অভিজ্ঞতার আলোয় দেখেছি প্রত্যেক মানুষের স্বীয় ধর্মের মূলনীতিগুলো মুক্তভাবে এবং প্রকাশ্যে আনুগত্য পালনের সুযোগ প্রদান করলে শান্ত এবং স্বস্তিদায়ক পরিবেশ তৈরি হয়।*" (Jefferson, 1808)। আমেরিকার চতুর্থ প্রেসিডেন্ট (ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত) জেমস ম্যাডিসন (১৭৫১-১৮৩৬) সরকারব্যবস্থা এবং ধর্মের সন্নিবেশে বিপদ ঘটতে পারে বলে আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন ধর্মীয় স্বাধীনতা তখনই বজায় থাকে যখন এ দুটো (রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্ম) পৃথক থাকে : "গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা আর ধর্মীয়নেতাদের (যাজক) অবস্থান আলাদা থাকায় রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ভারসাম্যতা অর্জন করেছে। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সফলতার সাথে পালন করছে। একই সাথে গির্জা এবং রাষ্ট্রের পৃথকী অবস্থানের কারণে যাজকদের সংখ্যা, জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তি, নৈতিকতা, ধর্মীয়বিশ্বাস মোটেও হ্রাস পাচ্ছে না বরং উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।" (Brenner, 2004, 272)।

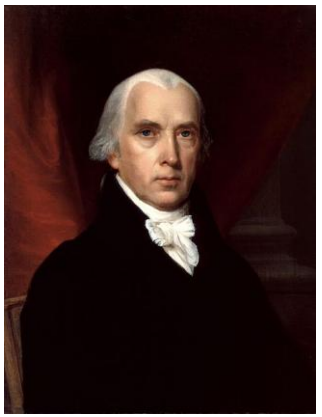

(রক্ষণশীল কিছু ধর্মীয়গোষ্ঠীর মতো) আইডিপন্থীরাও আধুনিক গণতান্ত্রিক আমেরিকা যে ভিত্তিমূলের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই আলোকায়ন (রেনেসাঁস) যুগের ঋণ বেমালুম অস্বীকার করেন। (Forrest and Gross, 2005)। ডেম্বস্কি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলেন : "আলোকায়ন (রেনেসাঁস) যুগের কারণে বৈজ্ঞানিক সফলতা এসেছে এমন ধারণা শুধু ভুল নয়, ব্যাপক পরিসরে তা অসার প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে চিন্তাচর্চার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে মানব সম্পর্কিত বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা'র

ভিত্তি পুনর্বার চিন্া করা উচিৎ।" (Dembski, 1999, 224)। ডেম্বস্কি তার বক্তব্যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন অচিরেই আলোকায়ন যুগের যুক্তিবাদ আর বৈজ্ঞানিক বস্াবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। (Dembski, 1999, 14)। ডেমবস্কি এবং ফিলিপ জনসন উভয়েই ধর্মনিরপেক্ষ-ইহজাগতিক সমাজ, সরকার, শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধী। তারা যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় পরিচয় দেয়ার পক্ষপাতী। ডেমবস্কি বলেন : "*আইডিপন্থীদের উচিৎ ধর্মনিরপেক্ষ ইহজাগতিক বিশ্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। একে কোণঠাসা করে খ্রিস্ট ধর্মের সত্যতার প্রতি নজর ফেরানো। শক্তিশালী যুক্তি এবং সমালোচনার মাধ্যমে সেই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি তুলে ধরা যা ইহজাগতিকতা এড়িয়ে গেছে।*" (Forrest and Gross, 2005, 200)। ফিলিপ জনসন মনে হয় অসৎ উদ্দেশেই নাস্িকতা আর সেক্যুলারিজমকে গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি আমেরিকার ধর্মীয় বৈচিত্র্যময়তা অস্বীকার করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যলয়ের মতো অন্যান্য বিশ্ববিদ্যলয়গুলোর ইহজাগতিকীকরণ নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। এনলাইটেনমেন্টে যুগের মূল্যবোধের (ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বিজ্ঞানমনস্কতা, ইহজাগতিকতা) প্রতি কোনো ধরনের লুকোছাপা না রেখেই ঘৃণা প্রকাশ করেন : "*১৯৫১ সালে যখন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় তার এতোদিনকার খ্রিস্টিয় পরিচয় এবং পরিবেশ ত্যাগ করল ...তখন এটি কথিত সেক্যুলার সংস্কৃতির মুক্তান্বেষা, রাজনৈতিক ভারসাম্য এবং জনসেবার হাল্কা প্রলেপে পরিণত হয়েছে।*" (Forrest and Gross, 2005, 201)। ফিলিপ জনসন এমন কী আমেরিকার সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীদের 'ধর্মত্যাগে'র জন্য অভিযুক্ত করেছেন : "*সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীরা স্বধর্ম ত্যাগ করে খুব আত্মতুষ্টিতে ভুগছিলেন। তারা মনে করছেন ঈশ্বরকে ইতিহাসের ছাইদানিতে ফেলে দিতে কোনো কিছুই আর বাকি রাখেননি।*" (Forrest and Gross, 2005, 202)।

আইডির অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বিশেষ ধর্মের প্রতি এটি পক্ষপাতী। সিএসসি'র সদস্য হেনরি ফ্রিটজ স্কাফেরের মতে অ-খ্রিস্টানদের স্বর্গপ্রাপ্তির সম্ভাবনা খুব কম : "অন্যান্য সকল ধর্ম যিশুকে ঈশ্বরপুত্র হিসেবে স্বীকার করে না... কেউ একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর বিশ্বাস, নিষ্ঠা, প্রবল একাগ্রতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু শুধু নিষ্ঠা আর প্রবল একাগ্রতা দিয়ে 'সত্য' প্রতিষ্ঠিত হয় না।" (Forrest and Gross, 2005, 198)। অপরদিকে ডেম্বস্কি চরম রক্ষণশীল। তিনি খ্রিস্ট ধর্মের 'অলংঘনীয় বিশ্বাস' অস্বীকারের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ব্ল্যাসফেমি আইন প্রচলনের প্রতি সমর্থন করেছেন। এজন্য তিনি বিভিন্ন ধর্মের লোকদের মধ্যে সামাজিক সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বিনষ্টকরণেরও পক্ষপাতী : "*বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে উত্তর আমেরিকায় খ্রিস্ট ধর্মের বিরোধিতা করা একটি কুখ্যাত শব্দে পরিণত হয়েছে। আমরা কি শান্িপূর্ণভাবে বসবাস করে সামনের দিকে এগুতে পারি না? দুঃখজনক হলেও এর উত্তর হচ্ছে না ... ধর্মবিরোধিতা করা আজো (সেক্যুলারদের) অন্যতম বৈশিষ্ট্য।*" (Forrest and Gross, 2005, 199)।

আইডিপন্থীরা আমেরিকার মূলধারার ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধকে অস্বীকারকারী চরমপন্থী খ্রিস্টান সংগঠন এবং অন্যান্য রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সাথে ঐক্য গড়ে তুলেছে। আইডি'র উদ্দেশ্যের সাথে চরমপন্থীদের উদ্দেশ্য কতটুকু মিল তা অবশ্য বিতর্কের বিষয়। কিন্তু খ্রিস্টান চরমপন্থী সংগঠনগুলো যদি ওয়েজ স্ট্র্যাটাজির মূলনীতিমালার সাথে সহানুভূতিশীল না হতো, তাহলে এরা আইডি বাস্বায়নে এরা অগ্রসর হতো না। কাউন্সিল ফর ন্যাশনাল পলিসি (Council for National Policy, CNP) একটি ক্ষুদ্র এবং

গোপন খ্রিস্টান চরমপন্থী সংগঠন। ১৯৮১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বিভিন্ন সরকারি নীতিমালাকে খ্রিস্টিয় মতে প্রভাবিত করতে উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে তাদের সদস্য বানিয়েছে। ফিলিপ জনসন এই সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা রেখেছেন। (Leaming and Boston, 2004, 8)। সিএনপি'র সদস্য তালিকায় খ্রিস্টান সংস্কারবাদীদের গ্রুপ রয়েছে : "এই খ্রিস্টান সংস্কারবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক সংবিধান বাতিল করে এর বদলে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টভিত্তিক সংবিধান তৈরি করতে চায়। এরা ব্যভিচারী, ঈশ্বর-ধর্ম-বিরোধিতারী, অসংশোধনযোগ্য বখে যাওয়া কিশোর-কিশোরী, সমকামী, ডাইনি, মিথ্যা দেবদেবীর উপাসকদের মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পক্ষে।" (Leaming and Boston, 2004, 11)। কিছু আইডি নেতা এইসব চরমপন্থী খ্রিস্টান সংস্কারবাদীদের মৈত্রীর বন্ধন গড়ে তুলেছেন। তাদের সাথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদর্শগত দিক দিয়ে একমত পোষণ করেন। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 266-67; Forrest, 2007b)। হাওয়ার্ড অ্যামেনসন নামের এই ধনাঢ্য ব্যক্তি, যার কাছ সিএসসি মোটা অংকের ডোনেশন পেয়ে থাকে, তিনি আরেকটি খ্রিস্টান সংস্কারবাদী সংগঠন 'Chalcedon Foundation'-এর বোর্ড সদস্য হিসেবে ২৩ বছর কাজ করেছেন। বর্তমানে হাওয়ার্ড অ্যামেনসন ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 264-67; Discovery Institute, n.d.)। পরিচিত আইডি নেতা চার্লস থাক্সটন ২০০৬ সালের মে মাসে আমেরিকার অন্যতম চরমপন্থী সংস্কারবাদী সংগঠন 'আমেরিকান ভিশন' আয়োজিত 'Worldview Super Conference' সম্মেলনে তাদের ফ্যাকাল্টি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। (Forrest, 2007b; Sugg, 2006)।

একইভাবে সিএসসি'র আরেক সদস্য ফ্রান্সিস বেকউইথের সাথেও খ্রিস্টান রক্ষণশীল সংগঠনের যোগাযোগ রয়েছে। তিনি Summit Ministries-এর গ্রীষ্মকালীন সম্মেলনে ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে কাজ করেন। এই সংগঠনের প্রধান ডেভিড নোয়েবল। সাবেক জন ব্রিচ সোসাইটির সদস্য ডেভিড নোয়েবল বর্তমানে আমেরিকায় সমকামীদের রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জড়িত। (Forrest, 2007b)। ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে আন্দোলনরত এসব চরমপন্থী সংগঠনের সাথে ফিলিপ জনসন, থাক্সটন, বেকউইথের ব্যক্তিগত সম্পর্ক মূলত ওয়েজ স্ট্র্যাটাজি বাস্বায়নেরই অংশ। এছাড়া সিএসসি'র আরো অনেকেই এভাবে জড়িত রয়েছে খ্রিস্টান মৌলবাদী সংগঠনগুলোর সাথে। ২০০৬ সালে সিএসসি সদস্য অধ্যাপক মাইকেল বিহে, রিচার্ড ওয়েইকার্ট এবং জোনাথন ওয়েলসকে (ইভানজেলিক সংস্কারবাদী) ড. জেমস কেনেডি প্রযোজিত 'জৈববিবর্তন বিরোধী' একটি টিভি অনুষ্ঠান Darwin's Deadly Legacy-তে 'বিশেষজ্ঞ' হিসেবে পরিচয়

করিয়ে দেয়া হয়। (Coral Ridge Ministries, 2006a)। ফিলিপ জনসন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকলেও অনুষ্ঠানটির ওয়েব সাইটে তাকেও বিশেষজ্ঞের তালিকায় রাখা হয়েছে। জেমস কেনেডি Coral Ridge Ministries এবং Creation Studies Institute-এর প্রতিষ্ঠাতা। প্রচারিত এই টিভিচিত্রে কেনেডি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংগঠিত গণহত্যার জন্য ডারউইনকে দায়ী করেন। তাদের এই টিভিচিত্রটি Anti-Defamation League কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়েছিল। (Anti-Defamation League, 2006)। কেনেডির মুখপাত্র হিসেবে কাজ করা 'বিশেষজ্ঞ' রিচার্ড ওয়েইকার্টের মন্তব্য : "প্রাকৃতিক নির্বাচন হিটলার এবং নাৎসিদের পথপ্রদর্শনকারী চিন্তাধারা ছিল।" (Coral Ridge Ministries, 2006b)। কেনেডি তৎক্ষণাৎ ওয়েইকার্টের মন্তব্যের সাথে (ডারউইন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংগঠিত গণহত্যাকে) মিলিয়ে বলেন : 'no Darwin no Hitler'।

রিচার্ড ওয়েইকার্ট তার বই '*From Darwin to Hitler*' (Weikart, 2004) থেকে এই মন্তব্যগুলো করেছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যারি আর্নহার্ট বইটির একটি নেতিবাচক সমালোচনা করেছেন। তিনি ওয়েইকার্টের বক্তব্যকে ভুল প্রণোদনাকারী বলে মন্তব্য করেছেন। যেহেতু ওয়েইকার্ট ডারউইন ও হিটলারের মধ্যে প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ হাজির করতে পারেননি (যা ওয়েইকার্ট নিজেও স্বীকার করেছেন)। আর্নহার্ট তার রিভিউতে বলেন : "ওয়েইকার্টের বইটি ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের অর্থায়নে ওয়েজ স্ট্র্যাটাজি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে রচিত। ডারউইনীয় জীববিজ্ঞানকে আক্রমণের জন্য রচিত... এই বইটি এখন ক্রিয়েশনিজম এবং আইডি প্রচারকদের কাছে হিটলারের উপর ডারউইনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত।" (Arnhart, 2006)। ইতিহাসবিদ অ্যান টেইলর অ্যালেন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আনহার্টের কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন : "*ওয়েইকার্ট 'ডারউইনিজমের' যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা ডারউইনের দেয়া বক্তব্যগুলো সতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ করে না। এমন কী এগুলো ডারউইনের স্বীয় ধারণার সাথেও মেলে না। বরং তা লেখকের নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডারউইন এবং ডারউইনের কাজকে প্রকাশ করে। ...দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যা ধর্ম এবং বিজ্ঞানের একটি 'সাংস্কৃতিক যুদ্ধের' ফল, যার উভয়পক্ষই ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ...এই অতি সরলীকৃত বক্তব্যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের জটিল ইতিহাসকে সঠিকভাবে প্রকাশ করে না।*" (Allen, 2006, 256-57)।

রিচার্ড ওয়েইকার্টের সিএসসি সহযোগী ফ্রান্সিস বেকউইথ, কনেডির দেয়া বক্তব্য 'no Darwin no Hitler' একইভাবে ইতিহাসকে বিকৃতকরণ প্রচেষ্টার শামিল। তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দমালার ব্যবহার থেকেই তা বোঝা যায়। "ইউজেনিক্স আন্দোলন এবং এ থেকে উদ্ভূত সকল সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলী সংগঠিত হত না যদি সমাজের অভিজাতশ্রেণী জীবন, নৈতিকতা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল স্তরে ডারউইনীয় ভাবাদর্শ অন্তর্ভুক্ত না করতেন। রিচার্ড ওয়েইকার্টের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অকাট্য অভিযোগে তা উপস্থাপিত হয়েছে। অধ্যাপক ওয়েইকার্ট তার বিচক্ষণতা ও যুক্তি দিয়ে আমাদের মনে করে দিয়েছেন, (রক্ষণশীল চিন্তাবিদ) রিচার্ড ওয়েভার কয়েক দশক আগে বলেছিলেন একটি চিরন্তন স্বতঃসিদ্ধ কথা 'প্রত্যেক ধারণারই পরিণাম রয়েছে।'" (Weikart website; see Weikart, 2004)। [৫]

যেসব ক্ষেত্রে আইডিপন্থীরা তাদের মিত্রের সাথে দর্শন-দৃষ্টিভঙ্গি শেয়ার করে এগুলোকে এক রেখায় টানা যায়। যেমন সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক অবস্থানে বাধা প্রদান, আমেরিকার গণতান্ত্রিক-সেক্যুলার সমাজ, শিক্ষা এবং সরকারের কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আনা। তাদের এই লক্ষ্য আমেরিকার সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং শিশুদের সুশিক্ষার প্রতি বড় ধরনের অবজ্ঞা আর অবমাননার চিত্র তুলে ধরে।

আইডি'র প্রতি রাজনৈতিক সমর্থন

আইডিকে সরকারি স্কুলগুলোয় শিক্ষাদানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বুশের সমর্থন এটাই প্রমাণ করে ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট আইডি'র পক্ষে রাষ্ট্রের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করেছে। তাদের সাফল্যের এটি বিরাট প্রমাণ। ওয়েজ ডকুমেন্টের নোটে ডিকোভারি ইনস্টিটিউটের সভাপতি ব্রুস চ্যাপম্যানের পরিচিতি দেয়া আছে 'রাজনীতি, সাংবাদিকতা ও সরকারি পলিসি'র উপর অগাধ জ্ঞান রয়েছে। তিনি একাধারে লেখক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ।' (Discovery Institude, 1998)। আইডি'র রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে এগুনোর জন্য অবশ্যই রাজনৈতিক সহচর্য থাকা প্রয়োজন। ওয়েজ স্ট্রাটেজির শুরু থেকে সাবেক সিনেটর রিক স্যান্টোরাম একে সমর্থন দিয়ে আসছিলেন। আইডিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রকাশ্যেই তিনজন রাজ্য গভর্নর এবং বেশ কয়েকজন সিনেটর, কংগ্রেসম্যান কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের সাংসদেরও এ ব্যাপারে সমর্থন রয়েছে। (Americans United for Separation of Church and State, 2006; Associated Press, 2005a; Karamargin, 2005; Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 239-40; Skeptical Inquirer, 2000)।

ডিসকভারি ইন্সটিটিউটের রাজনৈতিক ঘনিষ্টতা গোপন নয়। আইডি নেতা ফিলিপ জনসন ২০০০ সালে ওয়াশিংটনে কংগ্রেস প্রতিনিধি, সিনেটর এবং বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দুইবার আইডির উপর বক্তব্য রেখেছেন। ২০০৫ সালে ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট ওয়াশিংটনে তাদের অফিস উদ্বোধন করে। পরবর্তীতে এক বার্তায় জানানো হয় 'এই অফিস ডি. আই'কে নতুন শক্তিশালী কণ্ঠস্বর দিয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পলিসি নির্ধারণে ও গণমাধ্যমের সাথে সংযোগ রক্ষায় প্রচুর সুবিধা দিচ্ছে।' (Discovery Institute, 2006b, 1-2)। হয়তো আমেরিকার কংগ্রেসে এখনও ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের পক্ষে সমর্থনের জোয়ার নেই, কিন্তু এই আইডিপন্থীরাই প্রথম যারা ক্রিয়েশনিজম নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে পেরেছে। ইতিমধ্যে তারা রাজনৈতিক সমর্থকদের মাধ্যমে কিছু অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছে। যেমন স্যান্টোরাম সংশোধনী। তাদের কৌশলী প্রচারণা প্রোপাগান্ডার আকর্ষণীয়তায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মকর্তারা (যারা আইডি'র বৃহত্তর

উদ্দেশ্য এবং এর রক্ষণশীল জোট সম্পর্কে ধারণা নেই) বিভ্রান্ত হয়ে যান। তাদের এ কৌশল অবশ্যই উন্মোচন করে দিতে হবে।

৫. কিট্‌সমিলার এবং ডোভার এরিয়া স্কুল ডিসট্রিক্ট মামলা (২০০৫) এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া

২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকার পেনসিলভানিয়া রাজ্যের ডোভার এরিয়া স্কুল ডিসট্রিক্ট বোর্ডের পরিচালকেরা বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাদের স্কুলের শিক্ষার্থীদের ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিবর্তন তত্ত্ব এবং জৈববিবর্তনের অন্যান্য তত্ত্বের দুর্বলতা এবং সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতন করা হবে। তবে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। একই বছরের নভেম্বর মাসে একই বোর্ড আরেকটি নিয়ম তৈরি করে। নবম শ্রেণীর জীববিজ্ঞানের ক্লাসে 'জৈববিবর্তন তত্ত্ব বাস্তব (Fact) নয় এবং ডারউইনের মতের সাথে ভিন্নমতকারী ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভব বিষয়ে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা প্রদান করে'–এমন বক্তব্য দিয়ে শিক্ষকদের পড়াতে হবে। আইডিবাদী বই '*Of Pandas and People*' আগ্রহী শিক্ষার্থীদের কাছে সরবরাহ করা হয়। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে ১১ জন স্কুল শিক্ষার্থীর অভিভাবক স্কুল বোর্ডের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে প্রথম মামলা দায়ের করেন। (Kitzmiller, 2005, 12)

মামলার বিচার কাজ শেষে বিচারক জন ই. জোন্স (III) রায়ে বলেন আইডি কোনো বিজ্ঞান নয়। এটি মূলত পূর্বের সৃষ্টিবাদেরই নবরূপ, যা ধর্মীয় কার্যক্রম থেকে আলাদা নয়।' (Kitzmiller, 2005, 136)। বিচারক তার রায়ে আরো বলেন 'ডোভার স্কুল বোর্ডের আইডি নীতিমালা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীকে লঙ্ঘন করে এবং ...কমলওয়েলথ অব পেনসিলভানিয়ার সংবিধানকেও লংঘন করে।' (Kitzmiller, 2005, 139)। বিচারক জোন্সের এই রায় যদিও কাগজে-কলমে শুধুমাত্র পেনসিলভানিয়া রাজ্যের মিডল ডিসট্রিক্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু এই মামলার ধার এবং গুরুত্বের কারণে সারা দেশ জুড়েই আলোড়িত করেছিল। *কিট্‌সমিলার* মামলায় বিচারক জোন্সের রায় ঘোষণার দুই মাসের কম সময়ের মধ্যে ওহিয়ো রাজ্যের শিক্ষাবোর্ড এ রকম আরেকটি মামলার ভয়ে আগেই (বোর্ড সদস্য দ্বারা অনুমোদিত) আইডি মার্কা পাঠ্যসূচি পরিবর্তন করে ফেলে। আইডি মার্কা এই পাঠ্যসূচিটি ওহিয়ো রাজ্যের বিজ্ঞান শিক্ষার পর্যবেক্ষণ সংস্থা কর্তৃক বড় ধরনের গলদ রয়েছে বলে চিহ্নিত হয়েছিল। (Rudoren, 2006)।

ডোভার স্কুল বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্ত (আইডি সম্পর্কিত) যদিও ডিসকোভারি ইন্সটিটিউটের নিরলস প্রচারণার ফল কিন্তু ডিসকোভারি ইন্সটিটিউট নিজে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেনি। স্কুল বোর্ডকেও এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বলেনি। ডি. আই. কোনো মামলায় পরাজয়কে ভয় পেত। *কিট্‌সমিলার* মামলায় ডোভার স্কুল বোর্ডের পরাজয় বাস্তবে আমেরিকায় সমস্ত আইডি আন্দোলনেরই পরাজয়। স্কুল বোর্ডের পক্ষে ডি. আই.'র বেতনভোগী আইনজীবীরা না লড়ে টমাস মুর ল' সেন্টারের আইনজীবীরা অংশ নেন। আইডি'র বেশ কয়েকজন পরিচিত মুখ সিএসসি সদস্য উইলিয়াম ডেম্বস্কি, স্টিফেন সি. মেয়ার, জন ক্যাম্পবেল, মাইকেল বিহে এবং স্কট মিনিশ ডোভার স্কুল বোর্ডের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে মামলায় অংশ নিতে রাজি হন। কিন্তু পরে তাদের নিজস্ব আইনজীবী ছাড়া মামলা চালাতে অনিচ্ছুক থাকায় এবং প্রতিপক্ষ আইনজীবীদের যুক্তির ভয়ে ডেমবস্কি, মেয়ার এবং ক্যাম্পবেল নিজেদের নাম মামলা থেকে প্রত্যাহার করে নেন। মামলা লড়ার জন্য তখন শুধু মাইকেল বিহে এবং মিনিশ ছিলেন। (Forrest, 2007a; Forrest and Gross, 2007a, 326-27)। স্কট মিনিশের আবেদনপত্রে জোরালো যুক্তি ছিল না। দুর্বল এবং ভুলে ভরা। যদিও মিনিশ একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, তবে আইডি'র পক্ষের তারকা ছিলেন প্রাণরসায়নবিদ অধ্যাপক মাইকেল বিহে।

কিন্তু কাঠগড়ায় মাইকেল বিহের উপস্থাপনা তেমন আকর্ষণীয় ছিল না। এতোদিন 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা'র জোরালো প্রমাণ দাবি করেছিলেন তিনি। তার প্রচারিত আইডি'র প্রমাণ 'ব্যাকটেরিয়ার ফ্লাজেলা', 'রক্ত জমাটবদ্ধ হওয়া' মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইমিউন সিস্টেম–এ সবগুলোই একের পর এক (অ্যাটর্নি এরিক রথ্‌সচাইল্ডের নেতৃত্বাধীন) বাদীপক্ষের আইনজীবীদের প্রশ্নের বাণে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এডুকেশন'র (সংক্ষেপে NCSE) সহযোগিতায় রথসচাইল্ড অধ্যাপক বিহের আইডি'র তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দাবিগুলোর অসারতা উন্মোচন করেন। যা বিগত কয়েক দশক ধরেই জৈববিবর্তন-বিজ্ঞানীরা করে আসছেন। *নেচার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বিজ্ঞানী ম্যাট ইনলে ও আন্দ্রিয়া বোটারো এবং NCSE-এর জনসংযোগ কেন্দ্রের পরিচালক নিক মাতস্কে মাইকেল বিহের দাবিকৃত 'মেরুদণ্ডী প্রাণীর অসংক্ষেপণীয় জটিলতা' (Irreducible Complexity of Vertebrate) বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন :

> মাইকেল বিহের জৈববিবর্তন-বিরোধী যুক্তি 'Irreducible Complexity'-এর উপর নির্ভর করে। 'Irreducible Complexity'

বলতে বোঝায় কোনো নির্দিষ্ট জটিল সিস্টেমের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ একত্রে যদি বর্তমান থাকে। এবং সকল যন্ত্রাংশই যদি একত্রে কাজ করতে পারে তবে ঐ জটিল সিস্টেমে 'Irreducible Complexity' ক্রিয়াশীল থাকে। মাইকেল বিহে দাবি করেন মেরুদণ্ডী প্রাণী খুবই জটিল সিস্টেমের সাথে তুলনীয়। কোন একক উপাদানের ক্রমান্বয়িক বৃদ্ধি বা পরিবর্তনের দ্বারা কোনো সরলতম পূর্বসূরি থেকে মেরুদণ্ডী এই জটিল সিস্টেম উদ্ভূত হতে পারে না। এবং এতে করে জৈববিবর্তনের ব্যাখ্যাকে খণ্ডন করা যায়।

Darwin's Black Box গ্রন্থে (১৯৯৬ সালে রচিত) মাইকেল বিহে দাবি করেন মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইমিউন সিস্টেম Irreducible Complexity এর সাথে পুরোপুরি তুলনীয়। এই ইমিউন সিস্টেম বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত হয়নি।

অ্যাটর্নি রথ্সচাইল্ডের প্রশ্নবাণে বিধ্বস্ত মাইকেল বিহে বলেন কোনো বৈজ্ঞানিক রচনায় পাওয়া যাবে না র‍্যান্ডম মিউটেশন আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে কেমন করে এই মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইমিউন সিস্টেম গড়ে উঠল।' অ্যার্টনি রথ্সচাইল্ড তখন বিহের সামনে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইমিউন সিস্টেমের বিবর্তন নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার প্রকাশনা তুলে ধরেন। সাথে সাথে তিনি আরো কিছু বই ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ তুলে ধরেন। ...তখন বিহে স্বীকার করতে বাধ্য হন তিনি এ প্রকাশনাগুলোর অনেক কিছুই পড়েননি। ... তবে একই সাথে এই বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সন্তুষ্টজনক নয় দাবি করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এবং এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে কোনো লাভ নেই বলেও মত দেন। (Bottaro et al., 2006, 434)।

মামলার শুনানি কার্যক্রমে অধ্যাপক বিহের দেয়া টেস্টিমনি গ্রহণযোগ্য ছিল না। আইডিকে 'বিজ্ঞান' প্রমাণ করতে তিনি বিজ্ঞানে 'থিওরি' যে নমনীয় সংজ্ঞা দেন তাতে জ্যোতিষশাস্ত্রও বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত হয়ে যায়! (Kitzmiller, 2005a, 38-39)।

আদালতের পরিবেশ সম্পর্কিত এ বর্ণনার শেষাংশে বলা যায়, আইডি'র পক্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী মাইকেল বিহে। তিনি দশ বছরের অধিক সময় জুড়ে আইডি আন্দোলনের প্রধান বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত। কোর্টে তার প্রত্যেকটি দাবিই বিশেষজ্ঞ-বিজ্ঞানীদের দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। নেচারে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, বর্তমান জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মাইকেল বিহের দাবি মত ইমিউন সিস্টেমের 'irreducible complexity' সম্পূর্ণ ভুল। বিহে অবশ্য তা অস্বীকার করেছেন। (Bottaro et al., 2006)।

মাইকেল বিহের দাবি অনুসারে 'চাবুকের মতো যে ফ্লাজেলার সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া সাঁতার কাটে তা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নয়।' তার এই দাবি কিট্সমিলার মামলায় জৈববিবর্তন পক্ষের সাক্ষী বিশিষ্ট কোষবিজ্ঞানী কেন্থ মিলার এবং অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। (Miller, 1999)। মাইকেল বিহের উদ্ভট যুক্তি খণ্ডন করে, আইডি'র বিভিন্ন দাবির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা উন্মোচন করে জৈববিবর্তনের পক্ষে বেশ কিছু ভালো প্রবন্ধ, মতামত জনসাধারণের জন্য ইন্টারনেটে সহজ লভ্য রয়েছে। যেমন Talkorigins.org, 2007; Talkreason.org।[২]

কিট্সমিলার মামলা পরবর্তী ওয়েজ স্ট্র্যাটাজির পথচলা

৪ নভেম্বর ২০০৫, যখন *কিট্সমিলার* মামলায় উভয় পক্ষের শুনানি শেষে বিচারক জোন্স যখন রায় ঘোষণা করছিলেন তখন আইডিপন্থী ৯ জন ডোভার স্কুল বোর্ডসদস্যই শুধু নয় আইডি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিণতি সহজেই বোঝা যাচ্ছিল। (Associated Press, 2005b)। *কিট্সমিলার* মামলার পরেও আইডি আরো অনেক মামলায় পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। যেমন কানসাস এবং ওহিয়ো রাজ্যে তাদের পরাজয়। ডিসকোভারি ইন্সটিটিউট Cobb Co., GA-মামলাতে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল। ঐ মামলায় জীববিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে জৈববিবর্তনের বিরোধিতা করে স্টিকার লাগানোকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করা হয় এবং এই স্টিকার প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়া হয়। (Discovery Institute, 2006a)। বিচারে কিছু প্রয়োজনায় তথ্যের ঘাটতি থাকায় আপিল বিভাগ তা পুনরায় জেলা আদালতে পাঠালে বাদীপক্ষ এবং বিবাদীপক্ষ আদালতের বাইরে মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উভয়পক্ষের মীমাংসায় সিদ্ধান্ত হয় জৈববিবর্তন-বিরোধী এ ধরনের স্টিকার আর কখনো বইয়ে সংযুক্ত করা হবে না এবং স্কুলবোর্ড কর্তৃপক্ষও ভবিষ্যতে জৈববিবর্তন পাঠ্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এমন উদ্যোগ বা নীতি কখনো গ্রহণ করবেন না। (National Center for Science Education, 2006a)।

আইডি আন্দোলনের এতসব বড় বড় পরাজয়ের পরও ওয়েজ ডকুমেন্ট বাস্বায়ন পূর্বপরিকল্পনা মতই চলতেছে। বোঝাই যায় না কোনো ধরনের রাজনৈতিক ও আইনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন তারা হয়েছিল কিনা কখনো। ওয়েজ পরিকল্পনা ভোঁতা হয়ে গেলে ভেঙে যায়নি। এখনও কিছু সংগঠন 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'র নামে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং রাষ্ট্র ও ধর্মের সাংবিধানিক সীমারেখা অতিক্রম করার চেষ্টায় লিপ্ত। সিএসসি'র বেশিরভাগ সদস্যই তরুণ। ডেম্বস্কি, মায়ার, ওয়েস্ট তাদের সারাটা জীবন ধরে ওয়েজ কৌশল বাস্বায়নে কাজ করে চলছেন। তাদের মধ্যে ব্যতিক্রম মাইকেল বিহে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সূত্রে তিনি ভিন্নভাবে আইডি প্রচারণায় লিপ্ত। যাইহোক, ক্রিয়েশনিস্টদের মত আইবাদীরাও একের পর এক পরাজয়ের ফলে এখন তাদের রণকৌশলে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হয়েছেন।

কিট্সমিলার মালার পূর্বেই আইডি'র নব্য-ক্রিয়েশনিজম রূপ উন্মোচিত হলেও তারা ছদ্মবেশের আড়ালে তাদের প্রচারণা চালাতে থাকেন। যেমন 'Objective Origins', 'Teach

the Controversy' (ডিসকোভারি ইন্সটিটিউটের অত্যন্ত প্রিয় শব্দ এটি) ইত্যাদি মুখরোচক শব্দসমষ্টির আড়ালে কাজ চলতো। (Forrest and Gross, 2004b)। বলা যায় সুভাষণের এক ভাণ্ডারই আছে তাদের কাছে। এরকম প্রচুর 'সুভাষণ' এখন তারা আইডি'র বিকল্প হিসেবে প্রচার করছে, যার কয়েকটি নীচে তুলে ধরা হল। তবে এই কথাগুলো অবশ্য নতুন নয়। পূর্বের ক্রিয়েশনিস্টরাও এগুলোকে দশকের পর দশক ধরে ব্যবহার করে এসেছে। যদিও নিচের তালিকাটি পুরোপুরি সম্পূর্ণ নয়। তবে এই শব্দসমষ্টিগুলোই সবচেয়ে বেশি ঘুরেফিরে আসে আইডিপন্থীদের মুখে। যথাযথ বিজ্ঞান-আন্দোলন কর্মী, ইহজাগতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরা এসব 'মুখভরা সুবচন' শুনলেই চিনতে পারবেন মুখোশের আড়ালের ব্যক্তিটা কে? বলা হচ্ছে, কিট্‌সমিলার মামলায় ভূমিধ্বস পরাজয়ের পর আইডিপন্থীরা এখন এভাবেই আইডিকে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। (Scott, 2006, 24-27)। যেমন ২০০৭ সালে নিউ মেক্সিকোর আইনসভার প্রথম অধিবেশনের প্রথম অধিবেশনে উপস্থাপিত (শিক্ষার নীতিমালা শীর্ষক) বিলে এরকম কয়েকটি শব্দসমষ্টি ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। (Thomas, 2007)।

বিতর্ক শেখানো : আইডি নেতারা শুরু থেকে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে আসছে, 'মূলধারার বিজ্ঞানের সাথে জৈববিবর্তন তত্ত্বের দ্বন্দ্ব আছে'। পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং জীবজগতের বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সন্দেহ-অবিশ্বাস সৃষ্টির জন্যই আইডিবাদীরা এ মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছেন। আইডিবাদীরা এমনও প্রচার করেন 'ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন একটি মৃতপ্রায় তত্ত্ব।' (Miller, 2001)। আইডি'র এ ধরনের দাবির মধ্যে জৈববিবর্তন সম্পর্কে সমালোচনার চেয়ে সত্যের ঘাটতিই বেশি। ফলপ্রসু বিতর্ক অবশ্যই জৈববিবর্তন তত্ত্বের জন্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু (১) মূলধারার বিজ্ঞানে জৈববিবর্তনের বাস্তবতা বা সত্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। আইডিপন্থীরা এক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জৈববিবর্তন নিয়ে চলা সাংস্কৃতিক বির্তক পুনরায় চাঙ্গা করতে চাচ্ছেন। (২) আইডি এখানে একটি ধর্মীয় এজেন্ডা নিয়ে বিতর্কের মঞ্চে প্রবেশ করে। যা আবার মূলধারার বিজ্ঞানীদের কাছে অস্বীকার করে। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সামনে এটি প্রকাশ করে না। পাছে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু তাদের সমমনা সমর্থকগোষ্ঠী-দর্শকদের সাথে এই ধর্মীয় এজেন্ডা নিয়ে আলোচনাও করে। আইডি'র এ ধর্মীয় ফ্লেভার (গন্ধ) অবশ্য সহজ গবেষণায় পাওয়া যায়। আইডি'র সমালোচনা বিজ্ঞানী-মহলে হরহামেশাই প্রকাশিত হয়। স্বীকৃত বিজ্ঞান পত্রিকা, বিজ্ঞানভিত্তিক ওয়েবসাইটে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।[২] তবে আইডি'র নেতরাও জানেন সাধারণ জনগণ এতসব গবেষণা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। বিজ্ঞান তারা জানেন কম, বোঝেন আরো কম। তাই সাধারণ জনগণকে খুব সহজে ভোলানো যায়, বিজ্ঞানের জগতে ডারউইনের জৈববিবর্তন নিয়ে এখনও বির্তক রয়েছে। এ অবস্থায় অনেক আমেরিকান, এদের মধ্যে অনেক উচ্চশিক্ষিতও রয়েছেন, যারা মনে করেন 'দুই পক্ষের মতামতই গ্রহণ করা উচিৎ।' কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ইস্যুটি এভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হতে পারে না। (Isaak, 2005)। যার একপাশে রয়েছে সু-প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসম্মত জৈববিবর্তন থিওরি এবং অন্য পাশে আছে ডিসকোভারি ইন্সটিটিউটের ধর্মীয় এজেন্ডা।

সম্পূর্ণ পরিসরে বিজ্ঞান-দর্শন : স্যান্টোরাম সংশোধনীর রিভাইসড সংস্করণে সবচেয়ে বেশিবার উদ্ধৃত হয়েছে এই বক্তব্যটি। কোন আইনগত ভিত্তি না থাকলেও ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট-ও এটি ব্যবহার করেছে। আইডি সমর্থকরা বিভিন্ন রাজ্যের স্কুলের বোর্ড মিটিংয়ে বারে বারে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আইডিবাদী আইন-প্রণেতারা শিক্ষা সংক্রান্ত তাদের প্রস্তাবিত আইনে নীতিমালার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আইডিবাদীরা এটা ভালোই বোঝেন, আপাতদৃষ্টিতে সাদামাটা কথাটির অর্থ হচ্ছে 'এর মাধ্যমে জৈববিবর্তনের সাথে আইডিকে একটি যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে তুলে ধরবে।' ২০০৬ সালে ওকালহোমার আইনসভার প্রস্তাবিত আইনে তেমনটি করা হয়েছিল। (National Center for Science Education, 2006)।

সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ : আমাদের এখানে একজন শিক্ষকের মতামতকেই অনেকে 'বিজ্ঞানের মানদণ্ড' বলে মনে করে। এটি একটি প্রচলিত অভ্যাস। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক-চিন্তাধারা বা ক্রিটিকাল থিংকিং জাগিয়ে তোলা অবশ্যই যৌক্তিক শিক্ষণের উদ্দেশ্য। কিন্তু পূর্বতন ক্রিয়েশনিস্টদের মত আইডিবাদীরাও এখন ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের নামে ক্লাসের পাঠ্যসূচিতে জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে আইডি প্রচার করে। (Matzke and Gross, 2006)। ক্রিটিকাল থিংকিংয়ের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে মিথ্যা থেকে সত্যকে আলাদা করার ক্ষমতা। শিশুদেরকে অবশ্যই বিজ্ঞান সম্পর্কে সত্য জানাতে হবে। তাই 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা' মতবাদটি জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে একটি যৌক্তিক বৈজ্ঞানিক বিকল্প–এরকম প্রচারণায় অবশ্যই শিশুদের মিথ্যা শেখানো হয়। এ ধরনের প্রচেষ্টায় মোটেও শিশুদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তার দক্ষতা গড়ে ওঠবে না।

জৈববিবর্তনের 'শক্তি ও দুর্বলতা' পক্ষে-বিপক্ষে প্রমাণ : কয়েক দশক ধরে এটি ক্রিয়েশনিস্টদের মুখে মুখে ঘুরে ফিরেছে। এখন আইডি'র মন্ত্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। (ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট কিভাবে এইসব পুরানো বাগাড়ম্বরপূর্ণ কথার পুনঃপ্রচলন ঘটাচ্ছে তা জানতে দেখুন : Witt, Jonathan. 2005)। আসল কথা হচ্ছে আইডিবাদীদের কাছে আইডিকে সমর্থন করার মত কোনো ইম্পিরিকাল ডেটা (প্রায়োগিক উপাত্ত) নেই। পূর্বের ক্রিয়েশনিস্টদের মতো তারাও ভুল দ্বি-বিভাজন তৈরি করেছে। যার এক পাশে রয়েছে জৈববিবর্তন এবং অন্য পাশে আইডি। তাদের কৌশল হচ্ছে যতবেশি জৈববিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে কুৎসা রটাতে পারবে ততবেশি আইডি জনগণের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর কৌশলকে আদালতও 'কূটচাল' বলে রায় দিয়েছেন। ১৯৮২ সালের *ম্যাকলিন* মামলায় বিচারক ওভারটন তাদের এই অপকৌশলকে আখ্যায়িত করেছেন 'নীল নক্সার দ্বৈতবাদ'। এখন পর্যন্ত আইডির পক্ষে প্রায়োগিক উপাত্তের ঘাটতি থাকায় তাদের তৎপরতার একমাত্র কৌশলই হচ্ছে কুৎসা রটানো। ১৯৬৮ সালে *ইপারসন* মামলায় স্কুলে জৈববিবর্তনের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে এবং ১৯৮৭ সালে *এডওয়ার্ডস্* মামলায় বিজ্ঞানের ক্লাসে ক্রিয়েশনিজমের জন্য সমান সময় বরাদ্দের দাবি বাতিল হয়ে গেলে আইডিবাদীরা জৈববিবর্তনের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর কৌশল বেছে নেয়। অবশ্য এই

অপকৌশলের উৎসমূল পাওয়া যায় আরেক জায়গায়। পূর্বসূরি ক্রিয়েশনিস্টরা এই কৌশল এডওয়ার্ডসের আগেই আবিষ্কার করেছিলেন : "*বৈজ্ঞানিক ক্রিয়েশনিস্টরা মনে করে জৈববিবর্তনকে ক্লাসে পড়ানো উচিৎ, কিন্তু শুধুমাত্র তখনই যখন এর শক্তি ও দুর্বলতাকে সৃষ্টিবাদের সাথে তুলনা করে আলোচনা করা হবে।*" (Bliss, 1983)।

একাডেমিক স্বাধীনতা : ডিসকোভারি ইসস্টিটিউট কিছুদিন আগে এক ভাষণে জানিয়েছে, "আমরা আইডি নিয়ে বির্তকে নতুন এক ফ্রন্টে প্রবেশ করেছি। এবং তা সম্ভব হয়েছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শিক্ষার স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে।" দুঃখের বিষয় হল তাদের এই একাডেমিক ফ্রিডমের নামে 'নতুন ফ্রন্ট' আদৌ নতুন নয়। আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগে হেনরি মরিস (ইনস্টিটিউট ফর ক্রিয়েশন রিসার্চ-এর প্রতিষ্ঠাতা) ঠিক একই পথ অবলম্বন করেছিলেন। (Morris, 1975)। আইডি নেতারা তাদের এই 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা' মতবাদকে 'শিক্ষার স্বাধীনতা' ইস্যুর সাথে তুলনা করে। যাতে করে তারা সংবিধানের প্রথম সংশোধনী লঙ্ঘনের অভিযোগ এড়াতে পারে। (West, 2005)। কিন্তু বিভিন্ন অসিলা হাজির করে আইডি পড়ানো আর 'শিক্ষার স্বাধীনতা' বিষয় এক নয়। গত দেড়শ বছরে জৈববিবর্তন তত্ত্ব বিজ্ঞানের সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষাগুলো পার করে এসেছে। বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে বিভিন্ন গবেষণায়। আর গত দশকে আইডি'র উপর বিভিন্ন বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও বিশেষজ্ঞদের পরিচালিত গবেষণার পর কোনো বিজ্ঞান শিক্ষকেরই আর আইডি নিয়ে অজ্ঞাত থাকার কারণ নেই। যখন একজন শিক্ষক তার ছাত্রকে বলেন 'আইডি একটি বিজ্ঞান' তখন এর পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। হয় ঐ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান পড়ানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত নন; অথবা শিক্ষক ইচ্ছাকৃতভাবেই শিক্ষার্থীদের ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন। যার কোনোটাই শ্রেণীকক্ষে কাম্য নয়।

আইডি মতবাদের হাস্যকর দিক হচ্ছে তারা একদিকে 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সার নামে পূর্বের ধর্মীয় ভাবমূর্তিকে ঢাকার চেষ্টা করছে। আবার একই সাথে তাদের প্রচারণায় খ্রিস্ট ধর্মের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। ২০০৬ সালের নভেম্বরে সিএসসি'র সদস্য ওয়াল্টার ব্র্যাডলি ও পল নেলসন এবং তাদের দীর্ঘদিনের সমর্থক টম উডওয়ার্ড ফ্লোরিডা চার্চে (আইডি'র ভেন্যু বলে বহুল পরিচিত) অনুষ্ঠিত 'Evidence of Design Conference'-এ প্রধান বক্তা ছিলেন। 'Apologetics Events in the U.S. and Beyond' নামের এ সম্মেলন ঘিরে বিশাল বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে দাবি করা হয় 'জীবনের অবশ্যই একজন ডিজাইনার আছেন। তিনি হলেন যিশু খ্রিস্ট।' (Apologetics.org, 2006)।

বায়োলজিক ইনস্টিটিউট : আইডি মতবাদকে 'বিজ্ঞান' দাবি করা হলেও সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছে এবং আইডিবাদীদের সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক সত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে বারেবারে যে কারণে তা হল আইডি'র 'বৈজ্ঞানিক বন্ধ্যাত্ব'। ফিলিপ জনসনের প্রদত্ত সংঙ্গানুসারে '*আস্কিীয় বাস্তবাদ*'কে (*ঈশ্বর অবশ্যই স্রষ্টা হিসেবে বাস্ত*) আইডি'র কার্যক্রমের মূলমন্ত্র বানানোর ফলে তাদের কাছে এমন কোন বৈজ্ঞানিক বা প্রায়োগিক তথ্য-উপাত্ত নেই যা দেখাতে পারে '*ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানে বিশেষ করে জীববিজ্ঞানে প্রমাণসম্মত*'। (Forrest, 2005a, 31)। গুটিকয়েক আইডিবাদী আছেন, যারা বিজ্ঞানী পরিচয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন যেমন মাইকেল বিহে কিন্তু একজন আইডিবাদী বিজ্ঞানীও তার পেশাগত বৈজ্ঞানিক কাজে আইডিকে 'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' হিসেবে ব্যবহার করেন না। *কিট্সমিলার* মামলায় পরাজয়ের পর আইডিবাদীরা বিশাল আর্থিক ও রাজনৈতিক সমর্থন হারিয়েছে। এখন তারা সমগোত্রীয় বিভিন্ন ক্রিয়েশনিস্ট দলের (ইনস্টিটিউট ফর ক্রিয়েশন রিসার্চ, ক্রিয়েশন রিসার্চ সোসাইটি, প্রভৃতি) মত '*বায়োলজিক ইনস্টিটিউট*' নামের একটি 'গবেষণা' পতিষ্ঠান তৈরি করেছে।

২০০৫ সালের আগস্টে নিউ ইয়র্ক টাইম্স-এর এক নিবন্ধে বায়োলজিক ইনস্টিটিউট (বিআই)-এর ঘোষণা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। (Chang, 2005)। ডগলাস এক্স (Douglas Axe) একজন আণবিক জীববিজ্ঞানী, যার নাম সিএসসি'র আণবিক জীববিজ্ঞান কর্মসূচির প্রধান হিসেবে উল্লেখ আছে। ঐ নিবন্ধে তিনি জানান বায়োলজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট বিশাল অর্থ সহায়তা দিয়েছে। ডগলাস এক্সের এই ঘোষণা মূলত উদ্দেশ্যমূলক, সুযোগ-সন্ধানী। কারণ *কিট্সমিলার* বিচার শুরুর এক মাস আগে এই নিবন্ধটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে সময় আইডিবাদীদের প্রচারণার জন্য 'বৈজ্ঞানিক প্রমাণ' হাজিরের খুবই প্রয়োজন ছিল। ইংল্যান্ডে ডগলাস এক্স (১৯৯৮ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ সিএসসি'র সদস্য) বিজ্ঞান-গবেষণা পরিচালনা করে আসছিলেন; পাশাপাশি ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের অর্থায়নের সাথে যুক্ত। *জার্নাল অব মলিকুলার বায়োলজি*তে তার দুটি প্রবন্ধ (২০০০ এবং ২০০৪ সালে) প্রকাশ হয়। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 40-42, 127; Biever, 2006)। যদিও ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট কখনোই বায়োলজি ইনস্টিটিউটের কথা তাদের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করেনি।

২০০৭ সালের মে মাসের শেষের দিকে যখন এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বায়োলজি ইনস্টিটিউটের কোন ফোন নম্বর দেওয়া ছিল না। ঐ বছরের জুলাই মাসে বিআই একটি ফোন নম্বরসহ Redmond, WA (আর কোন তথ্য নেই) উল্লেখ করে ওয়েব সাইট খুলে। (Biologic Institute, 2007)। ওয়েব সাইটটি আবার ইন্টারনেটের কোনো সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে খুঁজে পাওয়া যেত না। ডিরেক্টরির সাহায্যেও ফোন নাম্বারের সাড়া পাওয়া যায় না। গুগল সাইটে সার্চ দিয়ে শুধু নাম্বারটি সম্বন্ধে জানা যায় এটি একটি 'লিপিবদ্ধহীন' ল্যান্ড ফোন নাম্বার। মজার বিষয় হচ্ছে রেজিস্ট্রিকৃত ফোন নাম্বারটি বায়োলজিক ইনস্টিটিউটের বলে প্রকাশিত, কিন্তু যে স্থানটির কথা বলা হয়েছে তা Redmond নয়, হবে সিয়াটল। (US Search, 2007)। ওয়েব সাইটে প্রকাশিত তথ্যে কোনো বাস্ব ঠিকানা পাওয়া যায়নি। জনগণকে বিআই-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানানো ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের সিদ্ধান্ ছিল না। *নিউ সায়েন্টিস্ট* পত্রিকার এক রিপোর্টার বিআই-এর অফিস দেখেন রেডমন্ডে এবং একটি ল্যাব দেখেন ফ্রেমন্টে (সিয়াটলের কাছের এক স্থান)। (Biever, 2006)। একমাত্র জর্জ ওয়েবার (যিনি এ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেয়ার পর বিআই ছেড়ে দেন) ছাড়া আর কোন কর্মকর্তাই ঐ সাংবাদিকের সাথে কথা বলেননি।

রেডমন্ড অফিসে সাংবাদিকের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমন আচরণ মূলধারার বিজ্ঞানীদের আচরণের সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বিজ্ঞানীরা তো সাধারণত আগ্রহ নিয়েই তাদের কাজ সম্পর্কে আগ্রহী সাংবাদিকের সাথে কথা বলেন।

ডিসকোভারি ইনস্টিটিউট 'বিআই' প্রতিষ্ঠার খবর প্রকাশে অতি উৎসাহিত হয়ে বলেছিল 'এই প্রতিষ্ঠানের গবেষকরা সব নিষ্ঠাবান বিজ্ঞানী, এবং এদের চমৎকার গবেষণার রেকর্ড রয়েছে।' (Dicovery Institute, 2006c)। যাহোক, তাদের এ বড়াই যথেষ্ট অপরিণত, পুরোপুরি সত্যও ছিল না। *জার্নাল অব মলিকুলার বায়োলজি*তে প্রকাশিত ডগলাস এক্সের প্রবন্ধ দুটি মূলধারার বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের কাছে 'আইডি ঘরানার' বলেই বিবেচিত হয়। (Inlay, 2005; Hunt, 2007; Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 40-42, 127)। ডগলাস অ্যাক্স অবশ্য নিজেও দ্বিচারিতার পরিচয় দেন। ২০০০ সালে তিনি তার গবেষণাকে 'আইডি ঘরানার' বলতে অস্বীকৃতি জানান। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 42)। কিন্তু এখন তিনি নিজেকে আইডি-সমর্থক দাবি করেন (West, 2007)। *নিউ সায়েন্টিস্ট*-এর আর্টিকেল অনুসারে ডগলাস অ্যাক্স এবং গবেষণা সহকারী অ্যান গজার এবং ব্রেন্ডন ডিক্সন দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন 'বায়োলজিক ইন্সটিটিউটের গবেষকরা নিশ্চিত যে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের ধারণা একটি ভালো বিজ্ঞান হতে পারে'। (Axe et al., 2007)। কিন্তু গজারের প্রাণীবিজ্ঞানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি থাকার পরও গজার এবং ডিক্সন সফল হতে পারেননি। ডিসকোভারি ইন্সটিটিউটের 'ডারউইনবাদ বিরোধী' স্বাক্ষরদানকারী বিজ্ঞানীদের তালিকায় গজারের নাম রয়েছে। (Discovery Institute, 2007)। ২০০৭ সালের মে মাসে বৈজ্ঞানিক ডেটাবেজে খোঁজ করলে গজারের নামে তিনটি মাত্র স্বীকৃত আর্টিকেল পাওয়া যায়। লেখাগুলো হয়েছিল ১৯৮৫, ১৯৮৭ ও ১৯৯৩ সালে। সবগুলো আর্টিকেলই বিজ্ঞানের মানদণ্ডে 'সেকেলে' বলে বিবেচিত হয়। (Gauger et al., 1985; Gauger et al., 1987; Gauger and Goldstein, 1993)। ব্রেন্ডন ডিক্সন নিজেকে সফটওয়ার প্রকৌশলী বলে পরিচয় দিলেও বৈজ্ঞানিক ও কম্পিউটার ডেটাবেজে সার্চ দিয়ে তার নামে কোনো গবেষণা প্রবন্ধই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বায়োলজিক ইনস্টিটিউট যদি প্রকৃত বিজ্ঞানের গবেষণা করে থাকে তবু এতে আইডি'র বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে না। আইসিআর এবং সিআরএস'র প্রচারিত 'নবীণ পৃথিবী সৃষ্টিবাদ'-এর মতোই এর অবস্থান থাকবে। বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা এবং নবীন পৃথিবী সৃষ্টিবাদ উভয়েই অতি-প্রাকৃত অলৌকিক সত্ত্বা 'ঈশ্বর' বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যা কোনো রকম ইম্পিরিকাল ডেটা নেই। আইডি'র নেতারা সিরিয়াস হলে তারা হয়তো ১৯৯২ সালের দিকেই বায়োলজিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে ফেলতেন। (যে সময় তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা শুরু করে)। হয়তো তারা কিছু নিদর্শন দেখাতেও পারতেন! বিজ্ঞানের জগতের বাইরে এক অতিপ্রাকৃত পরিকল্পনাকারীর কর্মকাণ্ডের পক্ষে কিছু সাফাই গাওয়া ছাড়া ওগুলো আর কিছুই নয়। মাইকেল বিহে কয়েকটি বই আর আর্টিকেল লিখে সস্তা জনপ্রিয়তামুখী না হয়ে এ কাজটি নিজেই করতে পারতেন। ওয়েজ স্ট্যাটাজি'র তের বছর পার হওয়ার পর সম্ভাব্য শেষ মুহূর্তে ২০০৫ সালে এসে *বায়োলজিক ইনস্টিটিউট* খোলার অর্থ হচ্ছে *কিট্সমিলার* মামলায় পরাজয়ের পর আইডির ভিত্তি ও আনুগত্যকে কোনো রকমে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো এবং তাদের আর্থিক যোগানের গতিকে ধরে রাখা। এতে করে হয়তো তাদের সমর্থকরাও স্কুলে আইডি পড়ানোর আড়ালে 'জৈববিবর্তনের শক্তি ও দুর্বলতা' বিষয়ক কূটচালে বাড়তি কিছু কথা যোগ করতে পারবে!

আইডি'র অন্যান্য কর্মসূচি

কিট্সমিলার মামলায় পরাজয়ের পর থেকে আইডিবাদীরা তাদের ওয়েজ ডকুমেন্ট আমেরিকার বাইরে ইসরায়েল, যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য প্রভাবশালী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। আইডিবাদীরা তাদের মতবাদকে আন্তর্জাতিকীকরণের পথে হাঁটছে। আমেরিকার বাইরে যুক্তরাজ্য থেকে তাদের সবচেয়ে বেশি সমর্থন আদায় হয়েছে। যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটি একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে সমস্যাটিকে আরো বড় করে তোলে। (Royal Society, 2006)। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আইডি'র রিপোর্টে ক্রিয়েশনিজমের পক্ষে পূর্ব-পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো থেকে সমর্থনের খবর প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে ইউরোপের জনসাধারণকে আগে এই সমস্যা থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রয়েছে বলে ধারণা করা হত। (Graebsch and Schiermeier, 2006; Forrest and Gross, 2007b, 337)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের বিজ্ঞান-সচেতনতা এমনতিতেই নিম্নমুখী, সেখানে আইডিবাদীদের তৎপরতা সমস্যাটিকে আরো ঘণীভূত করছে। সাধারণ জনগণকে টার্গেট বানাচ্ছে। মাইকেল বিহে তার '*The Edge of Evolution: The Search for the Limits of Darwinism*' বইয়ে 'বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা' মতবাদকে জোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞানের সব আবিস্কারের সাথে মিলিয়ে মহাবিশ্বের এক গম্বুজস্বরূপ থিওরি দাঁড় করিয়েছেন। ডারউইন-সমর্থকদের কথিত ভুল পেডিকশনকে কাউন্টার করার জন্য নিজে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে একটি গবেষণা কর্মসূচি শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। (Behe, 2007)। হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা পূর্বের আইডিপন্থী বই '*Of Pandas and People*' এর স্থান দখল করেছে উইলিয়াম ডেম্বস্কি ও জোনাথন ওয়েলসের '*The Design of Life: Discovering Signs of Intelligence in Biological Systems*' বইটি। (Dembski and Wells, 2007)। (*কিট্সমিলার* মামলায় এটি ক্রিয়েশনিস্ট বই হিসেবে চিহ্নিত হওয়া সত্ত্বেও (Forrest, 2005b), '*Of Pandas and People*' বইটি এখনও ফাউন্ডেশন ফর থট এন্ড ইথিক্স কর্তৃক স্কুল টেক্সটবুক আকারে বিক্রি হচ্ছে। তাদের জবাব 'এই বইটি হাজার হাজার সরকারি স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে উন্নত করেছে।' [Foundation for Thought and Ethics, n.d.])।

ডিসকভারি ইন্সটিটিউট নিজেও আইডি'র উপর বই প্রকাশ করছে। নবম শ্রেণী থেকে কলেজ ছাত্রদের টার্গেট করে রচিত এসব বই। যেমন *Explore Evolution: The Arguments for and Against Neo-Darwinism*। (Meyer et al., 2007)। বইটিতে আইডি'র পরিচিত কথাই লেখা রয়েছে। এ বইয়ে লেখক আইডি আন্দোলনের নেতা স্টিফেন সি. মায়ার, স্কট

মিনিশ এবং পল নেলসন। সাথে রয়েছেন সাবেক সিএসসি সদস্য জোনাথন মানিমেকার এবং রাল্‌ফ সিঙ্কে। '*Of Pandas and People*' বইটির মত এই বইটিও সরকারি স্কুলের

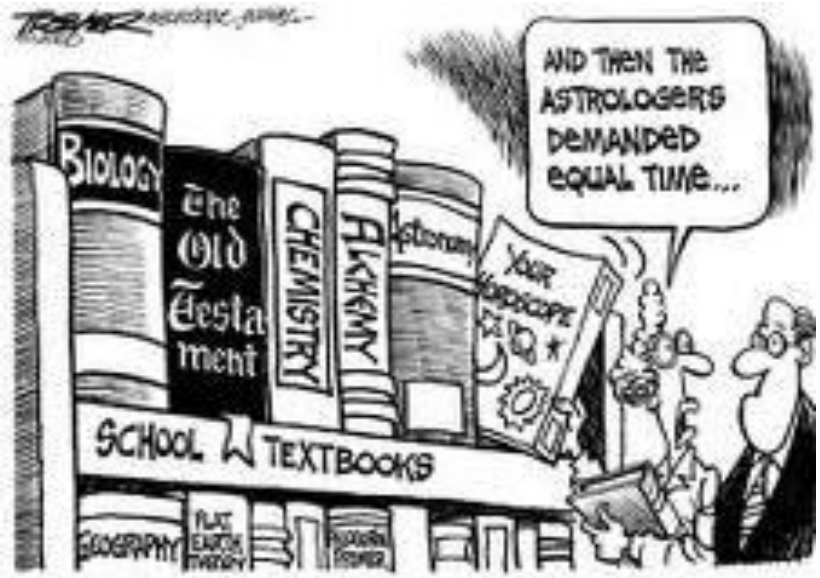

শিক্ষকদের জন্য অতিরিক্ত পাঠ্যবই বলে প্রচার করা হচ্ছে। সিএসসি'র সিনিয়র সদস্য মাইকেল নিউটনের লেখাও ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের 'নতুন সম্পূরক জীববিজ্ঞান কারিকুলাম' সহায়িকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 164-165)। জুলাই, ২০০৭ সালে বায়োলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের সায়েন্স এন্ড রিলিয়জন প্রোগ্রামের ওয়েব সাইটে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। ঐ লেখাতে আগস্ট মাসে (২০০৭) অনুষ্ঠিতব্য 'টিচিং বায়োলজিক্যাল অরিজিন' শিরোনামের এক সভায় বিজ্ঞান শিক্ষকদের অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হয়। (বায়োলা বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকজন সিএসসি সদস্যকে তাদের ফ্যাকাল্টি সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে)। '*Explore Evolution*' বইটিকে বর্ণনা করে হয়েছে 'এক নতুন ধরনের রচনা বলে যা ক্রিটিকাল থিংকিংকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করে।' আইডিবাদী জোনাথন ওয়েলসকে এই সভায় বক্তা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ওয়েজ স্ট্র্যাটাজির লক্ষ্য দাবি করা হয় 'বস্তুবাদী ব্যাখ্যাসমূহ পরিবর্তন করে এই বিশ্বাস জনসাধারণের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করা যে প্রকৃতি এবং জীবজগৎ ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট।' সভার একটি অধিবেশনের আলোচ্যসূচি হচ্ছে 'বিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ের বস্তুবাদী ধারণাগুলো সম্পর্কে ক্রিটিকাল থিংকিং করা'। এখান থেকেই এই সভার ধর্মীয় ভিত্তি সহজভাবেই বোঝা যায়। সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলা হয়, অনুষ্ঠিতব্য এই আলোচনা সভা জীববিজ্ঞানের বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে সরকারের দেয়া নির্দেশ বাস্ বায়নে সাহায্য করবে।' এবং এও দাবি করা হয় আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের বিজ্ঞান শিক্ষার মানদণ্ড থেকে পরিস্কার দেখা যায় সম্পূর্ণ পরিসরে বিজ্ঞান বুঝতে, এবং বিজ্ঞানের বিশেষ কিছু বিষয় কেন বিতর্কিত, তা শিক্ষার্থীর জানতে এ কারিকুলাম তাদের সাহায্য করবে। (Biola, 2007)। এই ধরনের দাবি স্যান্টোরাম সংশোধনীর মতোই শোনায়। কিন্তু স্যান্টোরাম সংশোধনী সরকারি নির্দেশ–এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। (Forrest and Gross, 2004a, 2007a, 240-252)।

আইডি'র এই ধরনের ছদ্মবেশধারী কথিত 'বিজ্ঞানের বই' এবং অন্যান্য প্রকাশনার কারণে স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় যথেষ্ট গুরুত্ব, শ্রম এবং সময় সাপেক্ষে বিবেচনা করতে হয়। আমেরিকার বিজ্ঞান-আন্দোলন কর্মী, সেক্যুলার ব্যক্তিরা এ পর্যন্ত অবর্ণনীয় সময়, শ্রম, অর্থ ব্যয় করে আইডিকে স্কুলের আঙিনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। জনগণের বিজ্ঞানসচেতনতায় আইডি'র প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে ভূয়সী ভূমিকা রেখেছেন। কানসাস সিটিজেনস ফর সায়েন্স-এর মত বিজ্ঞান সংগঠনগুলো এখন এক ডজনেরও বেশি রাজ্যে গঠিত হয়েছে। নিরলস পরিশ্রমে তারা কাজ করে যাচ্ছে।

৬। উপসংহার

উপরের এ আলোচনা স্পষ্ট যে আইডি সম্পূর্ণরূপেই কূটচালী ক্রিয়েশনিজম ছাড়া আর কিছু নয়। যদিও আইডিকে 'ক্রিয়েশনিজম' থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে রাখতে নেতারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তারা সাধারণত মুক্ত বিতর্ক এড়িয়ে চলেন। যেমন ক্রিয়েশনিজমের পক্ষে একটি গোষ্ঠী হচ্ছে নবীন পৃথিবীতে বিশ্বাসী। বাইবেলের একটি চরিত্র নূহ এবং মহাপ্লাবনকে তাদের বিশ্বাসের অনত্যম অংশ মনে করে। নবীন-পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের এই 'প্লাবন জিওলজি' বিষয়ে আইডিপন্থীরা নিশ্চুপ। পূর্বের ক্রিয়েশনিজম থেকে আইডি'র পরিভাষা, শব্দসমষ্টি, ভাষাকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত করার প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায় বারে বারে ব্যর্থ হওয়ার পর তারা এখন আইডিকে আমেরিকার সংবিধানসম্মত ও জনগণের কাছে বিজ্ঞান-উপযোগী করে তুলতে চাচ্ছে। আমেরিকানদের সৌজন্যবোধের অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে জৈববিবর্তনের সাথে 'বৈজ্ঞানিক বির্তক' সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। আইডিপন্থীদের সরকারি স্কুলগুলোয় বৈজ্ঞানিক বির্তক শেখার আহ্বান, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পূর্ণ পরিসরে বোঝানো দাবি–এসবই তাদের রণকৌশল।

যাহোক, একমাত্র সত্য হচ্ছে আইডি কর্মসূচি বাস্বায়নে বারেবারে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। বাস্বে আইডি এবং জৈববিবর্তনের মধ্যে কোনো বৈজ্ঞানিক বির্তক নেই। (কারণ দুটি বিষয়গতভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি ধর্মাশ্রয়ী-উদ্দেশ্যবাদী (Teleological) মতবাদ এবং অন্যটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান—অনুবাদক)। জৈববিবর্তনের বাস্বতা নিয়ে জীববিজ্ঞানীমহলেও কোনো সন্দেহ বা বির্তক নেই। (এটি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় প্রমাণিত হয়েছে)। তাই আমাদের মত হচ্ছে, শিক্ষাবিদ, স্থানীয় ও প্রাদেশিক শিক্ষাবোর্ড এবং সরকারি কর্মকর্তাদের উচিৎ শ্রেণীকক্ষে বিজ্ঞানের নামে আইডিকে চালিয়ে দেয়ার যে কোনো প্রচেষ্টা রোখা। সরাসরি আইডি উপস্থাপন করা হোক অথবা আরো বেশি ছদ্মবেশ ধারণ করেই হোক। একে প্রতিহত করতে হবে। জীববিজ্ঞান ক্লাসে 'বিরুদ্ধমত' পড়ানো,

জীববিজ্ঞানের বইয়ে 'সুভাষিত মন্তব্যে'র স্টিকার লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা—এসবই বিজ্ঞানকে খাঁটো করার নামান্তর। আইডি একটি বিশেষ গোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস। সরকারি স্কুলে বিজ্ঞানের ক্লাসে এর চর্চা মানে সাংবিধানিকভাবে রক্ষিত 'ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকৃত অবস্থান' নির্দেশনামাকে লঙ্ঘন করা। শ্রেণীকক্ষে আইডি পড়ানো প্রকৃত বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য ক্ষতিকর। আধুনিক বিজ্ঞান গত তিন শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সাফল্য অর্জন করে আসছে। আমেরিকার বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রার সচল গতি অব্যাহত করতে, বিশেষ করে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি বিজ্ঞান জগতে অবদান রাখতে হয়, তবে অবশ্যই আমাদের শিশুরা যাতে বিজ্ঞান বিষয়ে যথাযথা জ্ঞান আহরণ করতে পারে তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। এ পরিবেশ আমাদের তৈরি করে দিতে হবে।

এটা ঠিক, আইডি'র হুমকিকে অতিরঞ্জিত করে দেখার সুযোগ নেই। কিট্সমিলার, কানসাস, ওহিয়ো অঙ্গরাজ্যে আইডি'র পরাজয় দেখিয়েছে আইন এবং বিজ্ঞান পক্ষে থাকায় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা, সাধারণ মানুষ সংবিধান ও বিজ্ঞানশিক্ষা উভয়কেই রক্ষা করতে পারে। (Forrest and Gross, 2007a, 318-21)। কিন্তু পাশাপাশি বিরুদ্ধপক্ষের হুমকি উপেক্ষা করাও যাবে না। আইডিবাদী ও বিভিন্ন রক্ষণশীল গোষ্ঠীর বিভ্রান্তিকর প্রচারণা আমেরিকার গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং বহুত্ববাদী মুক্ত সমাজ গঠনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আইডি'র প্রবক্তরা এবং তাদের ডানপন্থী মিত্ররা সেক্যুলারিজমকে বিকৃত করতে অপপ্রচার চালাচ্ছে। সেক্যুলারিজমকে ধর্ম-বিদ্বেষের সমার্থক বলে প্রচার করা হচ্ছে। 'সেক্যুলার' বলতে 'ইহজাগতিক'-'অধার্মিক' বোঝায় কিন্তু ধর্ম-বিদ্বেষী নয়। আবার আইডিকে বিজ্ঞানের কোনো থিওরি'র চেয়ে 'ধর্মীয় বিশ্বাস' বলে সমালোচনা করা মানে—কোনো বিশেষ ধর্মের সমালোচনা করা নয়। অর্থ-বিকৃতির মাধ্যমে ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে যেভাবে সেক্যুলারিজমের বিরোধিতা করে, তাতে সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণীর বিরুদ্ধাচারণ করা হয়। সংবিধানের এ রক্ষাকবচটি জনগণকে ধর্মমত পালন করে অথবা ধর্মমত পালন না করেও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা ও কাজ করার অধিকার দেয়। একজন ব্যক্তিকে নিজের ইচ্ছানুসারে কোনো কিছুর উপাসনা করা বা না করার অধিকার প্রদান করে। একজন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্মীয় পছন্দ অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ারও অধিকার দেয়। (Forrest, 2004)।

আইডি-ক্রিয়েশনিস্টরা 'ধর্মীয় স্বাধীনতা'র সুযোগে ব্যক্তিগত ধর্মীয় মতকে সরকারি নীতিতে বাস্তবায়নের সুযোগ খুঁজে। আইডি'র সৃষ্টিবাদ সরকারি স্কুলে অন্তর্ভুক্তির মানে বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্য তৈরি করা। আইডিবাদীদের অবস্থান শুধু অযৌক্তিকই নয়, আমেরিকান এক বিরাট অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য-ও নয়। যারা বোঝেন–নিরপেক্ষতার সহিত সরকারের বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়গুলোয় সম্মান দেখানোর মধ্যেই জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসের নিরাপত্তা বেশি নির্ভর করে। সরকার কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসকে (বা ধর্মবিরোধী বিশ্বাস) অনুমোদন দিলে, লালন করলে কী আমরা ধর্ম ও সামাজিক সৌহার্দ্য, পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে পারবো? সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারব? সরকারি নীতির উন্নয়নে যৌক্তিক অন্বেষা বজায় রাখা যাবে? এসব বিষয়ে আইডি-গোষ্ঠী মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নয়। তারা আমেরিকার সেক্যুলার (ইহজাগতিক) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাস করে, এর সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, মুক্ত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ব্যবহার করেও আমেরিকার সংস্কৃতি, বিজ্ঞানশিক্ষাকে পেছনের দিকে ঠেলে এক প্রাক-আধুনিক যুগে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

সামাজিক সৌহার্দ্য বা পারপস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বলতে বোঝায় যুক্তিসঙ্গতভাবে অন্য একজন নাগরিকদের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা থাকা, যাতে করে তার প্রতি এই আস্থা রাখতে পারা যায়। কোনো ব্যক্তি নিজ ধর্মীয় আদর্শের অনুসারী না হয়েও, এমন কী হয়তো কোনো ধর্মের অনুসারী না হয়েও সে একজন ভাল মানুষ, ভাল প্রতিবেশী বা ভাল নাগরিক হতে পারে। সামাজিক সৌহার্দ্যের প্রত্যাশা তৈরি হয় (ইউরোপের) আলোকায়ন যুগের কেন্দ্রীয় উত্তরসূরিগুলোতে। যেখানে আরও রয়েছে ধর্মীয় বহুমুখী সহনশীলতা এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসু মনন–যা কোন নাগরিকের নৈতিক অবস্থানকে ধ্বংস করে না। বরং আরো বেশি সুসংহত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্টিফেন এম. ডিলিউ তার '*Public Reason and Democracy: The Place of Science in Maintaining Civic Friendship*' বইয়ে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন (DeLue, 2005, 26, 38-39) :

> আলোকায়ন যুগে (The Enlightenment) এমন এক সরকার প্রতিষ্ঠার আশাকে বাস্তবরূপ দিয়েছিল যারা জনগণকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস এবং রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত রাখে, যাতে জনগণ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে সমাজের উন্নয়নে উপযোগী জ্ঞান সৃষ্টিতে ব্যবহার করতে পারে। ...আলোকায়নের পর থেকে আমাদের আধুনিক বিশ্ব এক সার্বজনীন সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত হয়েছে। এটা এই বিশ্বাস ও দর্শনকে ধারণ করে, যুক্তিবাদী বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার বিজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান সৃষ্টিতে যেমন দরকার, তেমনি এই জ্ঞান যে শুধু মানবিক উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হবে তা নিশ্চিত করতেও দরকার। এ থেকে এটা বোঝা যায়, সমাজ এসব লক্ষ্য তখনই অর্জন করতে পারবে, এই সমৃদ্ধি তখনই আসবে যখন বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাতন্ত্রকে সামাজিক এবং সার্বজনীন ক্ষেত্রে প্রতীয়মান হতে দেয়া হবে। অর্থাৎ সামাজিক সৌহার্দ্যের পর্যায়ে উপনীত হওয়া (একটি উদার গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে যা অপরিহার্য) সেই মাত্রার উপর নির্ভর করে যেখানে বিজ্ঞানকে জীবনের সকল পরিসরের অগ্রযাত্রায় প্রয়োজনীয় বলে ধরা হয়। যখন এই বোধ শক্ত হয় তখন সামাজিক সৌহার্দ্যের সংস্কৃতির প্রতি এক নিবিড় সম্মান তৈরি হবে। যা স্বাতন্ত্র এবং এর সহযোগী বৈশিষ্টাবলী যেমন মুক্তি, স্বাধীনতা, সমালোচনামূলক চিন্তার চর্চা, বুদ্ধিবৃত্তিক ভিন্নতা এবং সহনশীলতার গুণাবলী ধারণ করে।

সমাপ্তি টীকা

১. 'Apologetics' হল ধর্মশাস্ত্রের একটি শাখা যা খ্রিস্টান মতবাদের সাথে জড়িত। (Webster's Online Dictionary at at http://www.websters-online-dictionary.org/definition/apologetics. Accessed 4 February 2007.)

২. আইডির অগণিত বই সম্পর্কে আরো জানতে পাঠকবৃন্দ আইডির সম্পর্কিত বিভিন্ন বইয়ের সমালোচনামূলক রিভিউ এবং আইডির সকল বিষয় সম্পর্কে আসল লেখা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন ইন্টারনেট সাইট দেখতে পারেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : Talkorigins.org (www.talkorigins.org), Talkdesign.org (www.talkdesign.org), Talkreason.org (www.talkreason.org), and the Panda's Thumb weblog (www.pandasthumb.org). The National Center for Science Education (www.ncseweb.org).

৩. ২০০৫ সালের নভেম্বরে আমেরিকার কানসাস রাজ্যের স্কুলবোর্ড জৈববিবর্তন তত্ত্বকে বিজ্ঞানের মানদণ্ডে বির্তকিত করার জন্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে ফেলেছিল। এমন কী তারা অতিপ্রাকৃত শক্তিকে জীববৈচিত্র্যের উদ্ভবের পিছনে 'অধিক উপযুক্ত' ব্যাখ্যা হিসেবে প্রচার করেছিল। আইডিপন্থীরা বিজ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করেছিল এভাবে 'প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে উপযুক্ত ব্যাখ্যা অনুসন্ধানের এক সুসংঘবদ্ধ প্রণালী; যা পর্যবেক্ষণ, অনুকল্প পরীক্ষণ, পরীক্ষা, পরিমাপ, গবেষণা, যৌক্তিক বিতর্ক এবং তত্ত্ব-নির্মাণের আশ্রয় নেয়। (Forrest and Gross, 2007a, 318)। পরে ২০০৬ সালের নভেম্বরে কানসাস অঙ্গরাজ্যে শিক্ষাবোর্ডের নির্বাচনে উদারপন্থী, বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের জয় হয়। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে শিক্ষাবোর্ডের নতুন কমিটি জৈববিবর্তন তত্ত্বকে সঠিকভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞা পুনরায় গ্রহণ করে। (National Center for Science Education, 2007)।

৪. রিনিউয়াল (renewal) বা 'নবায়ন' শব্দটির সাথে স্পষ্ট ধর্মীয় সংযোগ আছে। ওয়েজ ডকুমেন্টে লেখা রয়েছে :

আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক রিনিউয়াল :

- রিনিউয়াল আন্দোলন বুদ্ধিদীপ্ত নক্সা মতবাদে অন্তর্দৃষ্টি দেয়। বস্তুবাদে প্রভাবিত থিওলজিকে অস্বীকার করে।
- মূলধারার খ্রিস্টান ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো চিরায়ত সৃষ্টিবাদে বিশ্বাস করে এবং ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে।
- ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক পরিসরে প্রকৃতিতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।
- যৌনতা, গর্ভপাত, ঈশ্বরে বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ে পরিচালিত জনমত জরিপে (ডিসকোভারি ইনস্টিটিউটের পক্ষে) ইতিবাচক ফলাফল উঠে এসেছে। (Discovery Institute, 1998)।

References

❖ Allen, Ann Taylor. 2006. Review of *From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany*. By Richard Weikart. 78 (1): 255-57. Available at http://www.journals.uchicago.edu/cgi-bin/resolve?JMH78010743. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Americans United for Separation of Church and State. Doc. 601. *Science, Religion and Public Education: An Evolving Controversy*. Faith & Freedom Series. Available at http://www.au.org/site/DocServer/creationism_brochure.pdf?docID=601. (Accessed 3 February 2007.)

❖ Americans United for Separation of Church and State. Doc. 623. *Prayer and the Public Schools: Religion, Education and Your Rights*. Faith & Freedom Series. Available at http://www.au.org/site/DocServer/public_schools_brochure.pdf?docID=623. (Accessed 3 February 2007.)

❖ Americans United for Separation of Church and State. 2006. "Governors Advocate Teaching 'Intelligent Design' in Public School Science Classes." *Church & State*. 59 (2): 18-19.

❖ Anti-Defamation League. 2006. "ADL Blasts Christian Supremacist TV Special & Book Blaming Darwin for Hitler." Press release. 22 August. Available at http://www.adl.org/PresRele/HolNa_52/4877_52.html. (Accessed 7 February 2007.)

❖ Apologetics.org. 2006. "Evidence of Design Conference, November 3-4, 2006 — Clearwater and Tampa, Florida." Available at http://www.apologetics.org/recent-events.html. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Arnhart, Larry. 2006. "A Review of Richard Weikart's *From Darwin to Hitler*." *Darwinian Conservatism by Larry Arnhart*, weblog. 25 February. Available at http://darwinianconservatism.blogspot.com/2006/02/review-of-richard-weikarts-fromdarwin.html. (Accessed 7 February 2007.)

❖ Associated Press. 2005a. "First Voices Support for 'Intelligent Design.'" MSNBC. 19 August. Available at http://www.msnbc.msn.com/id/9008040/. (Accessed 6 February 2007.)

❖ Associated Press. 2005b. "Dover Voters Oust Intelligent Design Supporters." 9 November. Available at http://www.msnbc.msn.com/id/9973228. (Accessed 10 February 2007.)

❖ Axe, Douglas; Dixon, Brendan; and Gauger, Ann. 2007. "Good Science Will Come." *New Scientist*. 13 January. 2586: 18. Available at http://www.newscientist.com/article/mg19325860.100-good-science-will-come.html. (Accessed 10 February 2007.)

❖ Behe, Michael J. 1998. "Tulips and Dandelions." *Books and Culture*. September-October. Available at http://web.archive.org/web/20001208124700/http://www.christianitytoday.com/bc/8b5/8b5034.html. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Center for Inquiry, May 2007 35 (Amended July 2007)

❖ Behe, Michael J. 2007. *The Edge of Evolution: The Search for the Limits of Darwinism*. Free Press. (See http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=4029&program=CSC.) (Accessed 9 February 2007.)

❖ Benen, Steve. 2000. "Science Test." *Church & State*. 53 (7): 8-14. Available at http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3944/is_200007/ai_n8913453. (Accessed 5 May 2007.)

❖ Biever, Celeste. 2006. "Intelligent Design: The God Lab." *New Scientist*. 15 December. 2582: 8-11. Available at http://www.newscientist.com/channel/opinion/mg19225824.000-intelligentdesign-the-god-lab.html. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Biola University. 2007. "Science Teacher Symposium: Teaching Biological Origins." Available at http://www.biola.edu/academics/scs/scienceandreligion/symposium/. (Accessed 26 July 2007.)

❖ Biologic Institute. 2007. "Welcome." Available at http://www.biologicinstitute.org/. (Accessed 20 July 2007.)

❖ Bliss, Richard. 1976. "A Two-Model Approach to Origins: A Curriculum Imperative." *Impact*. 1 June. Available at http://www.icr.org/article/82/. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Bliss, Richard. 1983. "Evolutionary Indoctrination and Decision-Making in Schools." *Impact*. 1 June. Available at http://www.icr.org/article/213/. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Boehlert, Eric. 2004. "Swift Boat Flacks Attack CBS." *Salon*. 10 September. Available at http://dir.salon.com/story/news/feature/2004/09/10/forgery/index_np.html. (Accessed 10 February 2007.)

❖ Bottaro, Andrea; Inlay, Matt A.; and Matzke, Nicholas J. 2006. "Immunology in the Spotlight at the Dover 'Intelligent Design' Trial." *Nature Immunology*. 7 (5): 433-35. Available at http://www.nature.com/ni/journal/v7/n5/full/ni0506-433.html. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Branch, Glenn, and Scott, Eugenie C. 2003. "The Antievolution Law that Wasn't." *American Biology Teacher*. 65 (3): 165-66. Available at http://www2.ncseweb.org/pdfs/03-Scott-Branch-ABT-santorum.pdf. (Accessed 5 May 2007.)

❖ Brauer, Matthew J.; Forrest, Barbara; and Gey, Steven G. 2005. "Is It Science Yet? Intelligent Design Creationism and the Constitution." *Washington University Law Quarterly*. 83 (1): 1-149. Available at http://law.wustl.edu/WULR/83-1/p 1 Brauer Forrest Gey book pages.pdf. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Brenner, Lenni. 2004. *Jefferson & Madison on Separation of Church and State: Writings on Religion and Secularism*. Fort Lee, NJ: Barricade Books, Inc.

❖ Center for Science and Culture. 2007. "Information About Center Fellows and the Research Fellowship Program." Discovery Institute. Available at http://www.discovery.org/csc/fellowshipInfo.php. (Accessed 5 February 2007.)

❖ Center for Inquiry, May 2007 36 (Amended July 2007)

❖ Chang, Kenneth. 2005. “In Explaining Life’s Complexity, Darwinists and Doubters Clash.” *New York Times*. 22 August. Available at http://www.nytimes.com/2005/08/22/national/22design.html. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Clark Victoria. 2004. “Shall We Let Our Children Think?” *Reports of the National Center for Science Education*. 24 (2). Available at http://www.ncseweb.org/resources/rncse_content/vol24/5568_shall_we_let_our_children_thin_1

❖ 2_30_1899.asp. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Coral Ridge Ministries. 2006a. *Darwin’s Deadly Legacy: The Chilling Impact of Darwin’s Theory of Evolution*. List of experts available at http://www.coralridge.org/darwin/experts.asp?ID=crm&ec=I1301. (Accessed 6 February 2007.)

❖ Coral Ridge Ministries. 2006b. Preview of *Darwin’s Deadly Legacy*. Available at http://www.coralridge.org/darwin/preview.asp?bw=dsl&id=crm&ec=I1301. (Accessed 7 February 2007.)

❖ CRC Public Relations. 2007. “Clients.” Available at http://www.crcpublicrelations.com/clients.aspx. (Accessed 7 February 2007.)

❖ Creation Research Society. 2007. “CRS Van Andel Creation Research Center.” Available at http://creationresearch.org/vacrc.html. (Accessed 9 February 2007.)

❖ D’Agostino, Michelangelo. 2006. “In the Matter of Berkeley v. Berkeley.” *Berkeley Science Review*. Spring: 31-35. Available at http://sciencereview.berkeley.edu/articles/issue10/evolution.pdf (Accessed 14 May 2007.)

❖ DeLue, Steven M. 2005. “Public Reason and Democracy: The Place of Science in Maintaining Civic Friendship.” In Noretta Koertge, ed., *Scientific Values and Civic Virtues*, pp. 25-39. New York: Oxford University Press. (Available through Ingenta connect.)

❖ Dembski, William A. 1999. *Intelligent Design: The Bridge Between Science and Theology*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

❖ Dembski, William A. 2005. *Why President Bush Got It Right About Intelligent Design*. 4 August. Available at

❖ http://www.designinference.com/documents/2005.08.Commending_President_Bush.pdf. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Dembski, William A., and Wells, Jonathan. 2007 (forthcoming). *The Design of Life*. See http://www.overwhelmingevidence.com/id/design-of-life. (Chapter 1 available at http://www.overwhelmingevidence.com/id/design-of-life/ChapterOne.pdf.) (Accessed 14 May 2007.)

❖ DeWolf, David K.; Meyer, Stephen C.; and DeForrest, Mark E. 1999. *Intelligent Design in Public School Curricula: A Legal Guidebook*. Foundation for Thought and Ethics. Available at http://www.arn.org/docs/dewolf/guidebook.htm. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Center for Inquiry, May 2007 37 (Amended July 2007)

❖ DeWolf, David K.; Meyer, Stephen C.; and DeForrest, Mark E. 2000. “Teaching the Origins Controversy: Science, Or Religion, Or Speech? *Utah Law Review*. 39 (1): 39-110. Available at http://www.arn.org/docs/dewolf/utah.pdf. (Accessed 6 May 2007.)

❖ Discovery Institute. n.d. Howard Ahmanson, Board of Directors. Available at http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=23&isFellow=true. (Accessed 14 May 2007.)

❖ Discovery Institute. 1998. *The Wedge*. Center for the Renewal of Science and Culture. Available at http://www.seattleweekly.com/2006-02-01/news/the-wedge.php#intro. (Accessed 3 February 2007.)

❖ Discovery Institute. 2006a. *Background Information on Cobb County School District v. Selman.* Available at http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=2290. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Discovery Institute. 2006b. *Discovery Institute Views*. Winter. Available at http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&program=DI%20Main%20Page%20-%20News&id=3217. (Accessed 6 February 2007.)

❖ Discovery Institute. 2006c. “Intelligent Design Research Lab Highlighted in *New Scientist*.” *Evolution News & Views*. 19 December. Available at http://www.evolutionnews.org/2006/12/intelligent_design_research_la.html. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Discovery Institute. 2007. *A Scientific Dissent from Darwinism*. Available at http://www.dissentfromdarwin.org/. (Accessed 9 February 2007.)

❖ *Edwards v. Aguillard* 482 U.S. 578. 1987. U.S. Supreme Court. Available at http://supct.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0482_0578_ZO.html. (Accessed 5 May 2007.)

❖ *Epperson v. Arkansas*, 393 U.S.97. 1968. U.S. Supreme Court. Available at http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=393&invol=97. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Forrest, Barbara. 2004. “A Defense of Naturalism as a Defense of Secularism.” In Matthew J. Cotter, ed., *Sidney Hook Reconsidered*, pp. 69-116. Amherst: Prometheus Books. Available at http://www.creationismstrojanhorse.com/Defense_of_Naturalism.pdf. (Accessed 5 May 2007.)

❖ Forrest, Barbara. 2005a. Expert Witness Report. *Kitzmiller et al. v. Dover Area School District*. Available at http://www.creationismstrojanhorse.com/FORREST_EXPERT_REPORT.pdf. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Forrest, Barbara. 2005b. Supplement to Expert Witness Report. *Kitzmiller et al. v. Dover Area School District*. Available at http://www.creationismstrojanhorse.com/Forrest_supplemental_report.pdf. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Center for Inquiry, May 2007 38 (Amended July 2007)

❖ Forrest, Barbara. 2005c. *From “Creation Science” to “Intelligent Design”: Tracing ID’s Creationist Ancestry*. Available at http://www.creationismstrojanhorse.com/Tracing_ID_Ancestry.pdf. (Accessed 10 February 2007.)

❖ Forrest, Barbara. 2007a. “The ‘Vise Strategy’ Undone: *Kitzmiller et al. v. Dover Area School District*.” *Skeptical Inquirer*. 31 (1): 40-46. Available at http://www.csicop.org/intelligentdesignwatch/kitzmiller.html. (Accessed 6 February 2007.)

❖ Forrest, Barbara. 2007b (forthcoming). “The Non-Epistemology of Intelligent Design: Its Implications for Public Policy.” *Synthese*.

❖ Forrest, Barbara, and Gross, Paul R. 2004a. *Creationism’s Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design*. New York: Oxford University Press. (See http://www.creationismstrojanhorse.com/.)

❖ Forrest, Barbara, and Gross, Paul R. 2004b. “The Evolution of Intelligent Design.” Available at http://www.creationismstrojanhorse.com/ST_News_Online.pdf. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Forrest, Barbara, and Gross, Paul R. 2005. “The Wedge of Intelligent Design: Retrograde Science, Schooling, and Society.” In Noretta Koertge, ed. *Scientific Values and Civic Virtues*, pp. 191-214. New York: Oxford University Press. (Available through Ingentaconnect.)

❖ Forrest, Barbara, and Gross, Paul R. 2007a. *Creationism’s Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design*. 2nd ed. New York: Oxford University Press.

❖ Forrest, Barbara, and Gross, Paul R. 2007b. “Biochemistry by Design.” *Trends in Biochemical Sciences*. 32 (7): 301-310.

❖ Foundation for Thought and Ethics. n.d. “Of Pandas and People: The Central Question of Biological Origins” (website). Available at http://www.fteonline.com/pandas-people.html. (Accessed 5 May 2007.)

❖ Gauger, Ann; Fehon, Richard G.; and Shubiger, Gerold. 1985. Preferential binding of imaginal disk cells to embryonic segments of *Drosophila*. *Nature*. 313 (31 January): 395-97.

❖ Gauger, A; Glicksman, MA; Salatino, R; Condie, JM; Shubiger, G; and Brower, DL. 1987.

❖ Segmentally repeated pattern of expression of a cell surface glycoprotein in Drosophila embryos.

❖ *Development*. 100 (2): 237-44.

❖ Gauger, AK, and Goldstein, LS. 1993. The Drosophila kinesin light chain. Primary structure and interaction with kinesin heavy chain. *Journal of Biological Chemistry*. 268 (18): 13657-66.

❖ Graebsch, Almut, and Schiermeier, Quirin. 2006. “Anti-evolutionists Raise Their Profile in Europe.” *Nature*. 444 (23): 406-407. Available at http://www.vilaweb.cat/media/attach/vwedts/docs/creacionisme.pdf. (Accessed 14 May 2007.)

❖ Center for Inquiry, May 2007 39 (Amended July 2007)

❖ Haught, John. 2000. Review of *The Wedge of Truth*. By Phillip E. Johnson. *Reports of the National Center for Science Education*. 20 (6): 11-13. Available at http://www.ncseweb.org/resources/rncse_content/vol20/8399_ithe_wedge_of_truthi_by_p_12_30_1899.asp. Accessed 4 February 2007.)

❖ Hunt, Arthur. 2007. “Axe (2004) and the Evolution of Enzyme Function.” *Pandasthumb.org.* 14 January. Available at http://www.pandasthumb.org/archives/2007/01/92_second_st_fa.html. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Inlay, Matt. 2005. “Bill Dembski and the Case of the Unsupported Assertion.” *Pandasthumb.org*. 16 February. Available at http://www.pandasthumb.org/archives/2005/02/bill_dembski_an.html. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Institute for Creation Research. 2007. “Research.” Available at http://www.icr.org/research. (Accessed 9 February 2007.)

❖ Isaak, Mark. 2005. “Claim CA041” [Teach the Controversy]. *Talkorigins.org*. Available at http://www.talkorigins.org/indexcc/CA/CA041.html. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Jefferson, Thomas. 1782. *Notes on the State of Virginia*. Available at http://www.yale.edu/lawweb/avalon/jevifram.htm. (Accessed 5 February 2007.)

❖ Jefferson, Thomas. 1808. “Reply to the Virginia Baptists.” *Thomas Jefferson on Politics & Government: Quotations from the Writings of Thomas Jefferson.* Thomas Jefferson Digital Archive. University of Virginia. Available at http://etext.virginia.edu/jefferson/quotations/jeff1650.htm. (Accessed 5 February 2007.)

❖ Johnson, Phillip E. 1991. *Darwin on Trial*. Washington, DC: Regnery Gateway.

❖ Johnson, Phillip E. 2000. *The Wedge of Truth*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.

❖ Johnson, Phillip E. 2003. “Intelligent Design, Freedom, and Education.” *Breakpoint.org*. 9 May. Available at http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=1484. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Karamargin, C. J. 2005. “McCain Sounds Like Presidential Hopeful.” *Arizona Daily Star*. 24 August. Available at http://www.azstarnet.com/sn/politics/90069. (Accessed 6 February 2007.)

❖ *Kitzmiller et al. v. Dover Area School District*. 2005. Memorandum Opinion. Available at http://www.pamd.uscourts.gov/kitzmiller/kitzmiller_342.pdf. (Accessed 4 February 2007.)

❖ *Kitzmiller et al. v. Dover Area School District.* 2005a. Testimony of Michael Behe. 18 October, afternoon session. Available at http://www2.ncseweb.org/kvd/trans/2005_1018_day11_pm.pdf. (Accessed 9 February 2007.)

❖ Leaming, Jeremy, and Boston, Rob. 2004. "Behind Closed Doors." *Church & State*. October: 8-12. Available at http://www.au.org/site/News2?page=NewsArticle&id=6949&abbr=cs_. (Accessed 5 February 2007.)

❖ Center for Inquiry, May 2007 40 (Amended July 2007)

❖ Matsumura, Molleen. 2001. *Ten Major Court Decisions Against Teaching Creationism as Science*. Updated 22 March 2007. National Center for Science Education. Available at http://www.ncseweb.org/resources/articles/1464_10_major_court_decisions_again_2_15_2001.asp. (Accessed 6 May 2007.)

❖ Matzke, Nick. 2005. "Antievolution Resolution Proposed in the Kansas Legislature." National Center for Science Education. 15 February. Available at http://www.ncseweb.org/resources/news/2005/KS/237_antievolution_resolution_propo_2_15_2005.asp. (Accessed 7 February 2007.)

❖ Matzke, Nicholas J., and Gross, Paul R. 2006. "Analyzing Critical Analysis: The Fallback Antievolutionist Strategy." In Eugenie C. Scott and Glenn Branch, eds., *Not in Our Classrooms: Why Intelligent Design Is Wrong for Our Schools*, pp. 28-56. Boston: Beacon Press.

❖ *McLean v. Arkansas Board of Education*. 1982. 529 F. Supp. 1255. Available at http://www.talkorigins.org/faqs/mclean-v-arkansas.html. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Meyer, Stephen C.; Minnich, Scott; Moneymaker, Jonathan; Nelson, Paul A.; and Seelke, Ralph. 2007. *Explore Evolution: The Arguments for and Against Neo-Darwinism*. Melbourne, Australia: Hill House Publishers.

❖ Miller, Jon D.; Scott, Eugenie C.; and Okamoto, Shinji. 2006. "Public Acceptance of Evolution." *Science*. 313: 765-766.

❖ Miller, Kenneth R. 1999. *Finding Darwin's God: A Scientist's Search for Common Ground Between God and Evolution*. New York: Cliff Street Books.

❖ Miller, Kenneth R. 2001. "A 'Dying Theory' Fails Again." 21 September. National Center for Science Education. Available at http://www.ncseweb.org/resources/articles/6945_km-3.pdf. (Accessed 5 May 2007.)

❖ Morris, Henry. 1975. "Resolution for Equitable Treatment of Both Creation and Evolution."

❖ *Impact*. 1 August. Available at http://www.icr.org/article/72/. (Accessed 8 February 2007.)

❖ Moser, Bob. 2005. "Holy War." *Intelligence Report*. 117 (Spring). Available at http://www.splcenter.org/intel/intelreport/article.jsp?aid=522. (Accessed 5 February 2007.)

❖ National Center for Education Statistics. 2005. "Digest of Education Statistics." Available at http://nces.ed.gov/programs/digest/d05/tables/dt05_001.asp. (Accessed 3 February 2007.)

❖ National Center for Science Education. 2006a. "Praise for the *Selman* Settlement." 21 December. Available at

❖ http://www.ncseweb.org/resources/news/2006/GA/659_praise_for_the_emselmanem_12_21_2006.asp. (Accessed 8 February 2007.)

❖ National Center for Science Education. 2006b. "Respite in Oklahoma." 29 June. Available at http://www.ncseweb.org/resources/news/2006/OK/68_respite_in_oklahoma_6_29_2006.asp. (Accessed 10 February 2007.)

❖ Center for Inquiry, May 2007 41 (Amended July 2007)

❖ National Center for Science Education. 2007. "Evolution Returns to Kansas." 14 February. Available at http://www.ncseweb.org/resources/news/2007/KS/286_evolution_returns_to_kansas_2_14_2007.asp. (Accessed 5 May 2007.)

❖ Nelson, Paul A. 2002. "Life in the Big Tent." *Christian Research Journal*. 24 (2): 1-7. Available at http://web.archive.org/web/20060413141332/http://www.equip.org/free/DL303.pdf. (Accessed 5 May 2007.)

❖ Royal Society. 2006. "Royal Society Statement on Evolution, Creationism and Intelligent Design." 11 April. Available at http://www.royalsoc.ac.uk/news.asp?year=&id=4298. (Accessed 9 February 2007.)

❖ Rudoren, Jodi. 2006. "Ohio Board Undoes Stand on Evolution." *New York Times*. 15 February, A14. Available at http://www.nytimes.com/2006/02/15/national/15cndevolution.html?ex=1297659600&en=b4c20e545855c59d&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss. (Accessed 5 May 2007.)

❖ Schoch, Russell. 1991. "The Evolution of a Creationist." *California Monthly*. November. Available at http://www.origins.org/pjohnson/testmony.html. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Scott, Eugenie C. 2004. *Evolution vs. Creationism: An Introduction*. Berkeley, CA: University of California Press.

❖ Scott, Eugenie C. 2006. "The Once and Future Intelligent Design." In Eugenie C. Scott and Glenn Branch, eds., *Not in Our Classrooms: Why Intelligent Design Is Wrong for Our Schools*, pp. 1-27. Boston: Beacon Press.

❖ *Skeptical Inquirer*. 2000. "'Intelligent Design' Goes to Washington: Evolution Opponents Brief Congress." July. Available at http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2843/is_4_24/ai_63692996. (Accessed 6 February 2007.)

❖ Smith, Peter. 2005. "Seminary Site to Explore Cosmic Designer Concept." *Louisville (KY) Courier-Journal*. 20 February.

❖ Sugg, John. 2006. "Warped Worldview." *Church & State*. 59 (7): 11-13. Available at http://www.au.org/site/News2?abbr=cs_&page=NewsArticle&id=8314. (Accessed 6 February 2007.)

❖ Talkorigins.org. 2007. "Irreducible Complexity and Michael Behe: Do Biochemical Machines Show Intelligent Design?" Available at http://www.talkorigins.org/faqs/behe.html. (Accessed 10 February 2007.)

❖ Talkreason.org. n.d. "Behe, Michael." Available at http://www.talkreason.org/evolinks/eng/antievolution/persons/MichaelBehe/index.html. (Accessed 5 May 2007.)

❖ Center for Inquiry, May 2007 42 (Amended July 2007)

❖ Tennessee Evolution Statues. 1925. House Bill No. 185. Sixty-fourth General Assembly. Available at http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ftrials/scopes/tennstat.htm. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Thaxton, Charles B.; Bradley, Walter L.; and Olsen, Roger L. 1984. *The Mystery of Life's Origin: Reassessing Current Theories.* Dallas, TX: Lewis and Stanley.

❖ Thomas, Dave. 2007. "'Creationism' Measure Tabled in New Mexico—One Down, Three to Go." *Pandasthumb.org*. 30 January. Available at http://www.pandasthumb.org/archives/2007/01/creationism_mea.html. (Accessed 10 February 2007.)

❖ US Search. 2007. Search for "425-296-4400." Available at http://www.ussearch.com. (Accessed 20 July 2007.)

❖ Washington State. n.d. "Corporations Division-Registration Research Data." Secretary of State. Available at http://www.secstate.wa.gov/corps/search_detail.aspx?name=BIOLOGIC+INSTITUTE&ubi=602546515. (Accessed on 8 February 2007.)

❖ Weikart, Richard. 2004. *From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany*. New York: Palgrave Macmillan. See Weikart's website at http://web.csustan.edu/History/Faculty/Weikart/FromDarwintoHitler.htm. (Accessed 8 February 2007.)

❖ West, John G. 2005. "Intelligent Design Is Sorely Misunderstood." *Seattle Post-Intelligencer*. 9 August. Available at http://seattlepi.nwsource.com/opinion/235729_idesign09.html. (Accessed 4 February 2007.)

❖ West, John G. 2007. "Scientist Says His Peer-Reviewed Research in the *Journal of Molecular Biology* 'Adds to the Case for Intelligent Design.'" *Evolution News & Views*. 10 January. Available at http://www.evolutionnews.org/2007/01/journal_of_molecular_biology_a.html. (Accessed 9 February 2007.)

❖ Wiker, Benjamin. 2000. "A New Scientific Revolution." *Catholic World Report*. July. Available at http://www.catholic.net/rcc/Periodicals/Igpress/2000-07/intrview.html. (Accessed 4 February 2007.)

❖ Witham, Larry A. 2002. *Where Darwin Meets the Bible: Creationists and Evolutionists in America*. New York: Oxford University Press.

❖ Witt, Jonathan. 2005. "The Intelligent Approach: Teach the Strengths and Weaknesses of Evolution." Discovery Institute. 25 July. Available at http://www.discovery.org/scripts/viewDB/index.php?command=view&id=2743. (Accessed 8 February 2007.)

ঈশ্বর বিশ্বাস বনাম জৈববিবর্তন পাঠ

অনন্ত বিজয় দাশ*

মানুষ ধর্ম-ঈশ্বর বিশ্বাস বা ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পর্কিত বদ্ধমূল ধারণাগুলি মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়। মানুষের ঈশ্বরে বিশ্বাস নির্ভর করে ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কোনো শাখাতেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা হয় না; এটা দর্শনবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস কিংবা ধর্মীয় বিশ্বাস কবে-কিভাবে মানুষের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে মনোবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান।

জীববিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'-এর আলোচ্য বিষয় প্রজাতির উদ্ভব, বিকাশ, প্রকরণ, অভিযোজন, জীবজগতে বৈচিত্র্য, জীবের বিলুপ্তি ইত্যাদি। ডারউইনের এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে '*নাস্তিকতা*' প্রচারের অভিযোগ এর জন্মকাল থেকেই। অভিযোগ রয়েছে '*এ তত্ত্ব মানুষকে জীবজগতে ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ করে তোলে।*' পৃথিবীতে যেভাবেই জীবনের উৎপত্তি ঘটুক, পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষ উদ্ভবের পর থেকে সেটি কী করে পদে পদে বিকশিত হল, উদ্ভব ঘটল বৈচিত্র্যের, নতুন নতুন প্রজাতির, এসবই জৈববিবর্তন তত্ত্বের আলোচ্য। পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে কাজ করে রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানের বিকশিত ভিন্ন শাখা—প্রাণ-রসায়ন (Bio-Chemistry), ভূ-রসায়ন (Geo-Chemistry) এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিকশিত শাখা জ্যোতির্জীববিজ্ঞান।[১] প্রাণের উৎপত্তির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক-বির্তক থাকলেও বিজ্ঞানের ঐসব শাখার কোথাও 'ঈশ্বর কর্তৃক প্রাণ সৃষ্টি'-কে কোনো 'অনুকল্প' (Hypothesis) বা ধারণা (Idea) হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। (বিজ্ঞান এখনও কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বলে 'অতিলৌকিক' কোনো ধারণা বা বক্তব্য (যেমন ঈশ্বর) গ্রহণ করা-মেনে নেয়া মোটেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়)। ১৯২০ সালে রাশিয়ার প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার অপারিন এবং ইংরেজ বংশগতিবিদ জীববিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেন গবেষণা দ্বারা সর্বপ্রথম

ইংরেজ বংশগতিবিদ জীববিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেন

* অনন্ত বিজয় দাশ : শিক্ষার্থী, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট। সম্পাদনা : বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার ছোটকাগজ *যুক্তি*।

[১] প্রাণের উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে জানতে দেখুন : Robert M. Hazen, *Genesis: The Scientific Quest for life's Origin*, Joseph Henry Press, 2005.

স্বতন্ত্রভাবে এ পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভবের রাসায়নিক ভিত্তি রয়েছে দেখালেন। ১৯৫৩ সালে হ্যারল্ড ইউরি-স্ট্যানলি মিলারের গবেষণার পাশাপাশি আরো অনেক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন 'পৃথিবীতে জীবনের উদ্ভবের আগে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জৈব-রাসায়নিক উপাদানগুলোর উদ্ভব ঘটেছিল পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করেই। উপযুক্ত শক্তির উৎস (Energy source), রাসায়নিক উপাদানসমূহ (Chemicals), উপযুক্ত দ্রাবক (Solvent), উপযুক্ত তাপমাত্রা, একটি বিজারক বায়ুমণ্ডল (Reducing) ইত্যাদির সহঅবস্থান তিনশ' কোটি বছর আগে পৃথিবীতে ছিল। অতএব এ সময় জৈবযৌগ এবং জীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব ছিল।'[২] তবে জীবনের উদ্ভবের বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি।

ডারউইনের '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' প্রকাশের পর গত দেড়শ' বছরের ইতিহাসে বহু ধার্মিক-ঈশ্বর বিশ্বাসী বিজ্ঞানী জৈববিবর্তনকে বাস্ব বলে মেনে নিয়েছেন, ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বকে গবেষণাগারে, গবেষণাগারের বাইরে (যেমন *Biston betularia* প্রজাতির মথ নিয়ে গবেষণায়) প্রমাণ করেছেন। নিজেদের ডারউইনের তত্ত্বের সমর্থক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। জৈববিবর্তন তত্ত্ব কখনোই তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস-ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়নি। নিজেদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অভিরুচি, ধর্মীয় পরিচয় কখনোই বিজ্ঞানের প্রতি তাদের নিষ্ঠা, ঐকান্তিক ভালোবাসা, পেশাদারিত্বের উপর চেপে বসতে পারেনি। উদাহরণস্বরূপ নাম উল্লেখ করা যায়, পপুলেশন জেনেটিক্স (জনপুঞ্জ বংশগতিবিদ্যা) এবং পরিসংখ্যানবিদ্যার প্রবক্তা স্যার রোনাল্ড ফিশারের (Sir Ronald Aylmer Fisher, 1890-1962) নাম। যিনি একাধারে বিবর্তন-তাত্ত্বিক, পাশাপাশি খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী; নিয়মিত ধর্মীয় প্রবন্ধ লিখেছেন চার্চের ম্যাগাজিনগুলোতে। থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি (Theodosius Dobzhansky, 1900-1975) বিশ্বের খ্যাতনামা আরেক বিবর্তন-তাত্ত্বিক। ডবঝানস্কি সারা জীবন রাশিয়ার অর্থোডক্স চার্চের সদস্য ছিলেন, একই সাথে মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রের সাথে ডারউইনের প্রাকতিক নির্বাচন তত্ত্বের সংযোগ সেতু তৈরিতে সাহায্য করেন বিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্বের (The Modern Synthesis Theory of Evolution) মধ্য দিয়ে। ডারউইন প্রস্পাবিত ধারণার অসম্পূর্ণতা দূর করেন। ১৯৩৭ সালে ডবঝানস্কির সেই বিখ্যাত গ্রন্থ '*Genetics and the Origin of Species*' প্রকাশের পর জীববিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে জৈববিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে সকল সংশয় দূর হয়। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের শিরোনাম '*জৈববিবর্তনের বোধ ব্যতীত জীববিজ্ঞানে কোন কিছুই অর্থবোধক নয়*' (Nothing in Biology Makes any Sense Except in the Light of Evolution) এখনো জৈববিবর্তন তত্ত্বের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মুখে মুখে ফিরে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> "এটা মনে করা ভুল যে সৃষ্টি এবং জৈববিবর্তন পরস্পরের বিপরীত। আমি সৃষ্টি এবং জৈববিবর্তন উভয়ের সমর্থক। জৈববিবর্তন হচ্ছে ঈশ্বর বা প্রকৃতির সৃষ্টির একটি প্রক্রিয়া। সৃষ্টি কিন্তু চার হাজার চারশো খ্রিস্ট

[২] মনিরুল ইসলাম, *জৈববিবর্তনবাদ : দেড়শ' বছরের দ্বন্দ্ব বিরোধ*, ঢাকা, সংহতি প্রকাশন, পৃ ৫৭-৫৮

পূর্বে ঘটে নি। এই প্রক্রিয়াটি দশ বিলিয়ন বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে এবং আজো তা চলছে।"[৩]

মানব-জিনোম প্রকল্পের প্রাক্তন পরিচালক ফ্রান্সিস কলিন্স (Francis Collins) জৈববিবর্তন তত্ত্বের সমর্থক, একই সাথে খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসী। জৈববিবর্তন পাঠ বা গবেষণা কখনোই ফ্রান্সিসের ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি যেমন জৈববিবর্তনকে 'বাস্তব' বলে মেনে নিয়েছেন, ডারউইনের তত্ত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন গবেষণার সাহায্যে, একই সাথে তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস অটুট আছে কোনো ধরনের সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই। কলিন্স লিখেছেন :

> "Many People who have considerd all the scientific and spiritual evidence still see God's creative and guiding hand at work. For me, there is not a shred of disappointment or disillusionment in these discoveries about the nature of life-quite the contrary! How marvelous and intricate life turns out to be! How deeply satisfying is the digital elegance of DNA! How aesthetically appealing and artistically sublime are the components of living things, from the ribosome that translates RNA into protein, to the metamorphosis of the caterpillar into butterfly, to the fabulous plumage of the peacock attracting his mate! Evolution, as a mechanism, can be and must true. But that says nothing about the nature of its author. For those who believe in God, there are reasons now to be more in awe, not less."[৪]

রোনাল্ড ফিশার, ডবঝানস্কি, কিংবা ফ্রান্সিস কলিন্সই শুধু নন, গত দেড়শ' বছরে ধর্মের প্রতি আস্থাশীল অনেক জীববিজ্ঞানীই ডারউইন তত্ত্বের ভিত মজবুত করেছেন নিজেদের বৈজ্ঞানিক পেশাদারিত্ব আর বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা থেকে। ফরাসি খ্রিস্ট-ধর্মপ্রচারক পিয়ের টেইলহার্ড দ্যা শার্ডিন (Pierre Teilhard de Chardin, ১৮৮১-১৯৫৫)-এর মত খ্যাতিমান প্রত্নবিজ্ঞানী ও ভূতাত্ত্বিক মনে করতেন—'ঈশ্বর বিবর্তন প্রক্রিয়ায় এ পৃথিবীতে জীব পরিচালনা করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন।' বর্তমানকালের পরিচিত জীববিজ্ঞানী আমেরিকার ব্রাউন ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক কেন্‌থ আর. মিলার (Kennth R. Miller) ব্যক্তিগত জীবনে ক্যাথলিক খ্রিস্টান; ২০০৫ সালে তিনি পেনসিলভানিয়া রাজ্যের *Kitzmiller et al. v. Dover Area School District* মামলায় জৈববিবর্তন তত্ত্বের পক্ষের অন্যতম একজন সাক্ষী ছিলেন। জৈববিবর্তন তত্ত্ব নিয়ে যারা একটু খোঁজখবর রাখেন, তারা জানেন পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষ করে আমেরিকাতে সংঘবদ্ধ ডানপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো কী-রকম মরিয়া হয়ে

[৩] Theodosius, Dobzhansky, "Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution", *American Biology Teacher* 35(1973): 125-29

[৪] F. S. Collins, *The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief*, New York, Free Press, 2006, pp. 106-107

জৈববিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে ওঠে পড়ে লেগেছে। গত দেড়শ' বছরে বিভিন্ন ধরনের অসিলা নিয়ে হাজির হলেও সমসাময়িককালে তারা পূর্বতন কৌশল (সরাসরি ধর্মকে বিজ্ঞানের বিপক্ষে উপস্থাপন) পরিবর্তন করে 'বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা' (intelligent design) নাম দিয়ে বিজ্ঞানের মোড়কে অপবিজ্ঞানকে উপস্থাপন করতে চাচ্ছে। আশার কথা এই যে, সংঘবদ্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর এ অপচেষ্টা রুখে দিতে ইতিমধ্যেই পশ্চিমা বিজ্ঞান সমাজ ধর্মবিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে একজোট হয়েছেন, এমনটা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। যে বিজ্ঞানীরা একসময় সমাজজীবন থেকে একরকম বিচ্ছিন্ন হয়েই নিজের গবেষণাগারে ব্যস্ত সময় কাটাতেন, 'মুখ গুঁজে থাকতেন মাইক্রোস্কোপে'—সেই বিজ্ঞানীরা এখন বিভিন্ন পাবলিক ফোরামে, গণমাধ্যমে হাজির হয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন, লেকচার দিচ্ছেন, প্রেস কনফারেন্স করছেন, পত্রিকায় কলাম লিখছেন। জৈববিবর্তনকে সাধারণের বোধগম্য করার জন্য বিজ্ঞানের জটিল পরিভাষা যতটা সম্ভব এড়িয়ে বই লিখছেন। অধ্যাপক কেন্‌থ মিলারের এরকম দুটি বেস্ট সেলার বইয়ের নাম হচ্ছে : *Only A Theory: Evolution and the Battle for America's Soul* এবং *Finding Darwin's God: A Scientist's Search for Common Ground Between God and Evolution*। উক্ত গ্রন্থ দুটিতে মিলার ধর্মবিশ্বাসের অবজ্ঞা না করে জৈববিবর্তনের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থাপন করে *ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন*-প্রবক্তাদের মুখতোড় জবাব দিয়েছেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকোলজি এবং ইভলুশনারি জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ফ্রান্সিসকো আয়ালা (Francisco J. Ayala)। ব্যক্তিগত জীবনে খ্রিস্টধর্মবিশ্বাসী। ডক্টরেট করেছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ জীববিজ্ঞানী থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কির অধীনে। অধ্যাপক আইআলা বর্তমানে ডারউনিয় বিবর্তনের রেনেসাঁস মানুষ হিসেবে বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত। দক্ষিণ আমেরিকায় *Trypanosoma cruzi* নামের পরজীবী দ্বারা ভয়াবহ Chagas রোগের গবেষণায় তার আবিষ্কার রোগ-প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধক তৈরিতে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া সরাসরি পর্যবেক্ষণ করার জন্য কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে একটি পরীক্ষণ চালিয়েছিলেন। ড্রসোফিলা বা ফলের মাছির এক বিরাট পপুলেশনকে তিনি একটি উৎস থেকে সংগ্রহ করে দুই ভাগে আলাদা করে রেখেছিলেন। অর্ধেক অংশ রাখা হলো ১৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এবং অন্য অর্ধেক রাখা হলো ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়। বাহির থেকে খাদ্য প্রদানসহ অন্য সব কিছু তাদের একই রকম ছিল। তাদের নতুন সন্তান উৎপাদন করতে দেয়া হতে লাগলো বছরে প্রায় দশটা বংশ হারে। বারো বছর পরে দেখা গেল যে শীতল তাপমাত্রায় যে মাছিগুলোকে রাখা হয়েছিল তাদের প্রজন্মের গড় আকৃতি শতকরা দশভাগ বেশি বড় হয়েছে উষ্ণতর কক্ষের মাছির প্রজন্মের তুলনায়। পৃথক তাপমাত্রায় থাকতে থাকতে দুই পপুলেশন পৃথক হয়ে গিয়েছে প্রতি বংশে শতকরা ০.০৮ হারে। অধ্যাপক আইআলার লেখা *Darwin's Gift to Science and Religion* বইটিতে ক্রিয়েশনিজম এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে শুধু ভ্রান্ত এবং ছদ্মবিজ্ঞানই বলেন নি, ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকেও এগুলোকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলেছেন। ব্রিগহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন, অধ্যাপক ডেনিয়েল জে. ফেয়ারব্যাঙ্কস্ (Daniel J. Fairbanks) ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু তাঁর *Relics of Eden: The Powerful Evidence of Evolution in*

Human DNA বইটি 'মানব-জিনোম প্রকল্পের' ডিএনএ গবেষণার ফলাফল নিয়ে রচিত মানব-বিবর্তনের উপর লেখা এক মাইলস্টোন বলা চলে।

এরকম উদাহরণ ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ করা যায়। মূল কথা হচ্ছে, *'জৈববিবর্তন তত্ত্ব আক্ষরিক অর্থে গোটা ধর্মের বিরোধিতা করছে না।'* তবে নিশ্চিৎভাবে এটি ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ডটেস্টামেন্টের জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্যকে অস্বীকার করছে, কিন্তু থিওডোসিয়াস ডবঝানস্কি'র মত অনেক ধর্মবিশ্বাসী বিজ্ঞানীই জেনেসিসের প্রথম অধ্যায়ের বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে মেনে নিতে রাজি নন; তারা মনে করেন ১৬৫৪ সালে আইরিশ ধর্মযাজক জেমস আসার (James Ussher, 1581-1656) 'ঈশ্বর কর্তৃক পৃথিবী সৃষ্টি'র যে হিসাব (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সাল, রবিবার, সকাল নয় ঘটিকায়) দেখিয়েছেন তা 'অভ্রান্ত' নয়। তারা মনে করেন, বাইবেলের এই অধ্যায়ের ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে; ঈশ্বর ছয় দিনে নয়, বহু কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারাই জগৎ-জীবন সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি জৈববিবর্তন জীবের উদ্ভবের পিছনে কোনো ধরনের উদ্দেশ্যময়তা, নির্দিষ্ট বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা'র অস্তিত্ব ইত্যাদিকে বাতিল করে দিচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের এ বিষয়টিতেও আপত্তি নেই। অর্থাৎ ঈশ্বরকে জগতের 'আদি কারণ' হিসেবে স্বীকার করেও জীবজগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা বস্তুগত ব্যাখ্যা তারা স্বীকার করে নিচ্ছেন। (দ্রষ্টব্য : http://www.talkorigins.org/faqs/faq-god.html)। ১৯৯৬ সালে খ্রিস্ট ধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু পোপ জন পল-২ এক বিবৃতিতে বলেছেন : "no opposition between evolution and the doctrine of the faith about man and his vocation, on condition that one did not lose sight of several indisputable points." (দ্রষ্টব্য : John Paul II, "Message to the Pontifical Academy of Sciences, *The Quarterly Review of Biology*, Vol. 72, No. 4 (December 1997), pp. 382–383)।

ধীরে ধীরে বিজ্ঞানীরা ছাড়াও খ্রিস্ট ধর্মের প্রচুর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন যাজক, ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় সংগঠন, খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও এগিয়ে এসেছেন 'জৈববিবর্তন' তত্ত্বের প্রতি তাতে তাদের সমর্থন জানাতে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় ২০০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া বাটলার বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী মাইকেল ঝিমারম্যান (Michael Zimmerman) কর্তৃক পরিচালিত '*Clergy Letter Project*'-এর কথা। ঐ প্রকল্পের উদ্দেশ্য আমেরিকার বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী রক্ষণশীল ধর্মীয়গোষ্ঠী কর্তৃক বিজ্ঞানের নামে প্রচারিত 'অপ্রাকৃত-অপবিজ্ঞান'-এর বিরোধিতা করা, বিজ্ঞান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পাবলিক স্কুলগুলোতে বিজ্ঞানের ক্লাসে সৃষ্টিবাদ ও ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন ধারণাগুলি দূরে রাখার জন্য জনমত সংগ্রহ। ২০১০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এ প্রজেক্টের মূল বিষয় এবং উদ্দেশ্যের সাথে সহমত পোষণ করে স্বাক্ষর করেছেন ১২৫০৮ জন আমেরিকান খ্রিস্টান যাজক, ৪৭১ জন ইহুদি রাব্বিসহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।[৫] পরিষ্কার বুঝা যায়, জৈববিবর্তনের প্রমাণ মোটেই তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর কোনো হুমকি হয়ে দাঁড়ায় নি। (দ্রষ্টব্য : Carrie Sager, *Voices for Evolution*, National Center for Science Education, Inc 2008)।

প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের অন্যতম ব্যাখ্যাদাতা চার্লস ডারউইন নিয়েও রয়েছে ধর্মান্ধ আর নিরীশ্বরবাদী দলের মধ্যে টানাটানি। এক পক্ষ যেমন তাকে নিবিড়ভাবে ঈশ্বর-বিশাসী খ্রিস্টান বানাতে চায়, অন্যপক্ষও তাকে 'নিরীশ্বরবাদী' বানাতে ব্যস্ত। কিন্তু কথা হচ্ছে ডারউইন খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাসী কিংবা নিরীশ্বরবাদী যাই হোন না কেন, এর দ্বারা জৈববির্তন তত্ত্বের কোনো কিছু প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয় না। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বটি ব্যক্তিগত আবেগ-বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি; বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা সংগৃহীত প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। তারপরও কথা থেকে যায়। পাঠকমনের কৌতূহল নিবারণের জন্য এ বির্তকের ইতি টানা জরুরি।

১৮৫৯ সালে ২৪ নভেম্বর ডারউইনের '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' বাজারে আসার প্রথমদিনই বিজ্ঞানের জগতে বিশাল আলোড়ন ফেলে দেয়।[+] পাশাপাশি ডারউইন আজ অব্দি রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আক্রমণের শিকার হয়ে আসছেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে। জৈববিবর্তনের মূল সুর, জীবজগতের সকল জীবই একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ধর্মান্ধসহ অনেক সাধারণ মানুষ জৈববিবর্তনকে না বুঝেই রটিয়ে দেয় 'ডারউইন বলেছেন, মানব জাতি বানর থেকে এসেছে।' চারিদিক থেকে নিন্দা, অপমান, অপবাদের ঢেউ আসতে থাকে তাঁর দিকে। ১৮৬০ সালে অক্সফোর্ড বিতর্কে বিশপ স্যামুয়েল উইলবারফোর্স ডারউইন-প্রতিনিধি টমাস হাক্সলির পূর্বপুরুষকে বাঁদরকূলের বলে ব্যঙ্গ করেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন ডিজরায়েলি এক সভায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছিলেন এভাবে : 'মানুষ বাঁদর না

[৫] Clergy Letter Project, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Clergy_Letter_Project

[+] ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিজ* সম্পর্কে খুব জনপ্রিয় একটি মিথ হচ্ছে '*অরিজিন অব স্পিসিজ প্রকাশের প্রথম দিনই প্রকাশিত ১২৫০ কপির সবই বিক্রি হয়ে যায়*'। বিষয়টি পুরোপুরি তা নয়। প্রকাশক জন মারি (John Murray) *অরিজিন অব স্পিসিজ*-এর প্রথম সংস্করণে ১২৫০ কপি প্রকাশ করেছিলেন। এখান থেকে প্রকাশক ডারউইনকে 'লেখকের কপি' হিসেবে ১২টি, ৪১টি কপি বইটির রিভিউয়ের জন্য বিভিন্ন সমালোচককে, ৫টি কপি নিজেদের প্রকাশনীর গ্রন্থস্বত্ব হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ডারউইন আরো ২০টি কপি উপহারস্বরূপ নিয়েছিলেন। বাকি ১১৭২ কপি বই বিক্রির জন্য বুক স্টগুলোতে দেয়া হয়েছিল এবং ঐগুলোই বাজারে আসার প্রথম দিন (২৪ নভেম্বর) বিক্রি হয়ে যায়। বই বিক্রির এ ভুল হিসাবের প্রচলন মূলত ডারউইনের ডায়রির একটি ভুল ব্যাখ্যা হতে। হয়তো ডারউইন নিজের অজান্তে কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন; যেমন তার ডায়রিতে লেখা রয়েছে, '১২৫০ কপি ছাপা হয়েছে। প্রথম সংস্করণ বাজারে এসেছে ২৪ নভেম্বর এবং সবগুলো কপি বিক্রি হয়ে গেছে প্রথম দিনেই।' ২৪ নভেম্বর ডারউইন হাক্সলিকে একটি চিঠিতে নিজের বই সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন 'আমি জন মারি (প্রকাশক) থেকে খবর পেয়েছি, প্রথম দিনেই বইটির সম্পূর্ণ সংস্করণ বিক্রি হয়ে গেছে।' (দ্রষ্টব্য : http://darwin-online.org.uk/EditorialIntroductions/Freeman_OntheOriginofSpecies.html)।

দেবদূত, কোনটা? আমি তো দেবদূতের পক্ষে। আমি ঘৃণা করি আজকের ভুঁইফোঁড় সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে।'[+]

'*ডারউইন একজন কট্টর বর্ণবাদী (Racist), অরিজিন অব স্পিসিজ গ্রন্থের উপশিরোনামেই (the preservation of favored races) প্রকাশ পেয়েছে ডারউইনের বর্ণবাদী মানসিকতা*'–এরকম অভিযোগ এক সময় ডারউইন-বিরোধীদের কাছ থেকে শুনা যেত। কিন্তু বিরোধীরা ভুলে যান, জৈববিবর্তন একটি বাস্তবতা এবং 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' জীববিজ্ঞানের প্রমাণিত তত্ত্ব; জনসাধারণের মতামতের উপর ভিত্তি করে এটি গড়ে ওঠেনি। স্পষ্টই, ডারউইন বর্ণবাদী নাকি মানবদরদী, এর মাধ্যমে জৈববিবর্তনের সত্য-মিথ্যা প্রমাণিত হয় না। বিজ্ঞানের যে কোন তত্ত্বের মতো প্রাকৃতিক নির্বাচনকে খণ্ডন করতে হলে অবশ্যই এর বিপক্ষে প্রমাণ হাজির করতে হবে, ডারউইনের চরিত্রে কালিমা লেপন করলে সাধারণের কাছে মূল আলোচ্য বিষয় (জৈববিবর্তন জানা ও বোঝা) থেকে দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো ছাড়া আর কিছুই হয় না। *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থটি পাঠ না করে, বোঝার কোনো চেষ্টা না করে, শুধুমাত্র উপশিরোনাম দেখেই বিরোধিতা করে যাচ্ছেন কতিপয় রক্ষণশীল মতাদর্শের ব্যক্তি। ডারউইনের বইটির পুরো নাম '*The Origin of Species by Means of Natural Selection, Or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life*', বাংলা করলে দাঁড়ায় : 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির উৎপত্তি, বা জীবন সংগ্রামে আনুকূল্যপ্রাপ্ত জাতিগোষ্ঠীর সংরক্ষণ।' যদিও প্রচলিত অর্থে 'Race' বলতে উপ-প্রজাতি (sub-species) বুঝিয়ে থাকে এবং মানব-প্রজাতির উপপ্রজাতিগুলো হচ্ছে পীত

[+] ডারউইনের পূর্বপুরুষের হদিস খুঁজতে পরিচালিত ডিএনএ গবেষণার ফলাফল এ বছরের (২০১০) ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকের উদ্দেশ্য খবরটি তুলে ধরা হল : "চার্লস ডারউইন সরাসরি ক্রো-ম্যাগনন মানবগোষ্ঠীর বংশধর ছিলেন। ৩০ হাজার বছর আগে নিয়ান্ডার্থাল প্রজাতি বিলুপ্তির পর্যায়ে ইউরোপে তাদের বিকাশ ঘটে। অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। মানব প্রজাতির ক্রম-অগ্রগতির ইতিহাস নিয়ে গবেষণাকারী সংস্থা জেনোগ্রাফিক প্রজেক্টের পরিচালক স্পেন্সার ওয়েলস জানান, ইউরোপীয়দের অন্যতম সাধারণ বংশানুক্রম হেপলো গ্রুপ আর১বি (Haplogroup R1b)-এর বংশধর ছিলেন ডারউইন। ওয়েলস বলেন, যেসব মানুষ হেপলো গ্রুপ আর১বি-এর বংশোদ্ভূত, তারা সরাসরি ক্রো-ম্যাগনন জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। তাদের বংশানুক্রম ৩০ হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল। ...ডারউইনের তৃতীয় প্রজন্মের নাতি চেরিস ডারউইনের (৪৮) ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে এর পরীক্ষার মাধ্যমে (বিজ্ঞানীরা) এ তথ্য জেনেছেন। চেরিস বর্তমানে (অস্ট্রেলিয়ার) সিডনি শহরতলিতে বাস করছেন। ওয়েলস বলেন, ডারউইনের বংশানুক্রমের একটি চিহ্ন দেখা গেছে, তাঁর পিতৃপুরুষেরা প্রায় ৪৫ হাজার বছর পর নতুন বংশানুক্রমে ভাগ হয়ে ইরান বা দক্ষিণ মধ্য এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম ইউরোপে অভিমুখে যাওয়ার আগে তাদের আরেকটি রূপান্তর ঘটে, যা নতুন বংশানুক্রম হিসেবে পরিচিত। এই বংশানুক্রম ৩৫ হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, 'দক্ষিণ ইংল্যান্ডের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ হেপলো গ্রুপ আর১বি-এর বংশোদ্ভূত। এছাড়া আয়ারল্যান্ড ও স্পেনে এ সংখ্যা ৯০ শতাংশেরও বেশি'। (দ্রষ্টব্য : রুশো তাহের (সম্পাদক), *টেলিস্কোপ*, ২০১০, সংখ্যা ৭, এপ্রিল ১০, পৃ ৩৩ এবং http://www.physorg.com/news184484254.html)।

বা মঙ্গোলিয়ান, সাদা বা ককেশিয়, কালো বা নিগ্রো। কিন্তু শিরোনামে উল্লেখিত প্রজাতির উৎপত্তি বইয়ে Races বলতে ডারউইন মোটেই মানুষের বর্ণ বা দেহের রঙ নিয়ে কোনো কিছু বুঝান নি। Races বলতে স্পষ্টই জীবের প্রকরণ (varieties)-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জীবজগতে শুধুমাত্র প্রাকৃতিকভাবে ঘটা প্রকরণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক প্রাণী জীবন সংগ্রামে লড়াই করে টিকে থাকতে পারে।

এটা সত্য যে, ডারউইন যুগে অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান যুগে সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে এবং বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় ইউরোপ-আমেরিকায় সাদাদের তুলনায় কালো মানুষেরা অনেক পিছিয়ে ছিল। এজন্য তাদেরকে প্রতিনিয়ত নির্যাতন-নিপীড়নের পাশাপাশি প্রচুর পরিমাণে বৈষম্যের শিকার হতে হতো। ডারউইনের কঠোর সমালোচক হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ লুইস আগাসিজ (Louis Agassiz, ১৮০৭-১৮৭৩)-এর মতো ব্যক্তিরা পর্যন্ত কালো মানুষদের 'ভিন্ন প্রজাতি' হতে উদ্ভূত বলে অভিহিত করেছেন। ভিক্টোরিয়ান যুগের এই কুৎসিৎ অধ্যায়ের কথা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। এখানে আর তা পুনরুক্তি করা হলো না। ডারউইন এই সময়েরই সন্তান। ভিক্টোরিয়ান যুগের সমাজ-বাস্তবতায় তার সামাজিকীকরণ ঘটেছে। কিন্তু ডারউইন যে রেসিস্ট ছিলেন, কালো মানুষদের প্রতি ছিল তীব্র ঘৃণা, দাস-প্রথার প্রতি ছিল সমর্থন, এমনটা মোটেও নয়। বরং বিপরীত তথ্যটাই সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে, ডারউইন বা তার পরিবার দাস-প্রথার বিরোধিতায় সরব কণ্ঠস্বর।[৬] ইতিহাস হতে জানি, যুগে যুগে কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি সমাজের সংস্কার প্রথায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন না; স্থান-কালের উর্দ্ধে ওঠে নিজেদের জ্ঞানের আলো বিলিয়ে দেন নিঃশেষে। চার্লস ডারউইনও সেরকম এক ব্যক্তি।

যাহোক, *অরিজিন অব স্পিসিজ* মানুষের চিন্তার জগতে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে তার পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ডারউইনের দিকে খ্রিস্ট ধর্মনেতা-বিশপ, গবেষক, বিজ্ঞানী, লেখকগোষ্ঠীর তরফ হতে নির্বিশেষে অজস্র প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। আজও অবধি তা অব্যহত আছে। বিজ্ঞানের আর কোনো তত্ত্ব নিয়ে ডানপন্থী ধর্মীয়গোষ্ঠীর এত দীর্ঘসময় ধরে নিরবিচ্ছিন্ন বিরোধিতা-বিদ্বেষ দেখা যায় নি। *অরিজিন অব স্পিসিজ* প্রকাশের পর ডারউইনের দিকে ধর্মবিরোধিতার অঙ্গুলি ওঠে, কেউবা বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাবি জানান, কেউবা পাল্টা যুক্তি হাজির করে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রপঞ্চকে ভ্রান্ত প্রমাণের চেষ্টা করেন। ঐ সময় তার কাছের লোক বলে পরিচিত অনেকেই যেমন ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েল (*Principles of Geology* গ্রন্থের লেখক), ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন স্টিভেন্স হেনস্লো, ভূতত্ত্বের অধ্যাপক অ্যাডাম সেজউইক, ডাল্টন, হুকার প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেননি। শুরু থেকে ডারউইন ধর্মবিরোধিতার অভিযোগের বিষয়ে মৌননীতি অবলম্বন করেন; ধর্মের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয় এমন কাজ থেকে সব সময় দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। যথা সম্ভব বির্তক এড়িয়ে তিনি শুধু 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু কিছু চিঠির জবাব

[৬] Adrian Desmond & James Moore, *Darwin's Sacred Cause: How a Hatred of Slavery Shaped Darwin's Views on Human Evolution*, Houghton Mifflin Harcourt, 2009.

দিতেন। *অরিজিন অব স্পিসিজ*-এর পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার কিছু সংক্ষিপ্ত জবাবও দিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে সে যুগে তার জৈববিবর্তন বক্তব্যে বেশকিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, বিশেষ করে বংশগতির সঞ্চরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায় জীবদেহে ভ্যারিয়েশন বা বৈচিত্র্য উদ্ভবের প্রক্রিয়া তিনি সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। ১৮৫৯ সালের প্রথম সংস্করণের পর ১৮৬০ সালের (৭ জানুয়ারি) দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় সংস্করণ ১৮৬১, চতুর্থ সংস্করণ ১৮৬৬, পঞ্চম সংস্করণ ১৮৬৯, ষষ্ঠ সংস্করণে (১৮৭২) পাঠকের প্রতিক্রিয়ার জবাব, মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধন করেছেন, কিছু কিছু জায়গায় নতুন বক্তব্য-বাক্য যোগ করেছিলেন যা তার বইয়ের প্রথম সংস্করণে ছিল না। এ কাজটি করতে গিয়ে ডারউইন ১৮৬০ সালের দিক থেকেই দুঃখজনকভাবে নিজের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় ধরে রাখতে পারেন নি। তিনি বংশগতির সঞ্চরণ ব্যাখ্যা করতে লামার্কের ভুল অনুকল্পকে গ্রহণ করে 'প্যানজিন' ধারণা হাজির করেন, পরবর্তীতে এটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। *অরিজিন অব স্পিসিজ*-এর দ্বিতীয় সংস্করণের উপসংহারে সরাসরি 'ঈশ্বরকে বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন'; যা তার মতো নিষ্ঠাবান বৈজ্ঞানিকের দীর্ঘদিনের লব্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কিছুটা হলেও খাটো করে ফেলে। বোঝা যায়, রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীর দুর্বার চাপে তিনি কিছুটা আপোস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সারা জীবনই তিনি চেয়েছেন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে, ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থানে যাওয়া তার কখনোই উদ্দেশ্য ছিল না।

ডারউইন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন : "আমার বিশ্বাস ত্যাগ করতে আমি খুবই অনিচ্ছুক ছিলাম। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কারণ আমার বেশ মনে আছে যে আমি বেশ ঘন ঘন অলীক কল্পনার জাল বুনে চলছিলাম যে গসপেলের প্রতিটি বাণীকেই উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিপাদন করেছে সেইসব প্রাচীন চিঠিপত্র বা বিশিষ্ট রোমানদের মধ্যে লিখিত হয়েছিল এবং সেইসব পাণ্ডুলিপি যা পম্পেই বা অন্যত্র আবিস্কৃত হয়েছিল। আমার কল্পনাকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার পরে আমি টের পেলাম যে আমার বিশ্বাসকে বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণের উদ্ভাবনা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠেছে। এই অবিশ্বাস খুব ধীরে ধীরে আমার মধ্যে আমার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত পাকাপোক্ত হয়েছিল। এই গতি এত ধীর ছিল যে আমি কোন বেদনাবোধ করি নি, এবং তখন থেকে আমার সিদ্ধান্তের সঠিকতায় মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ পোষণ করিনি। আমি আদৌ বুঝি না কিভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে খ্রিস্টধর্মের সঠিকতায় আস্থা রাখা উচিৎ। কারণ এটা সত্য হলে বাইবেলের সরল অর্থ অনুযায়ী অবিশ্বাসীরা অনন্তকালব্যাপী শাস্তি ভোগ করবে এবং এই অবিশ্বাসীদের মধ্যে আছেন আমার বাবা, ভাই এবং প্রায় সব শ্রেষ্ঠ বন্ধুরা।"[৭]

[৭] আনোয়ারুল হক খান (অনুদিত), *চার্লস ডারউইনের আত্মচরিত*, ১ম সং, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৯, পৃ ৬২

ডারউইনই প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের মাধ্যমে উইলিয়াম প্যালের (১৭৪৩-১৮০৫) 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব'-এর পক্ষে বহুল ব্যবহৃত উদ্দেশ্যবাদী বক্তব্যগুলোকে (Teleological Argument) দক্ষতার সাথে খণ্ডন করেন। চোখের মত জটিল অঙ্গ উদ্ভবের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইটি প্রকাশের প্রায় মাস ছয়েক পর ১৮৬০ সালের ২২ মে ডারউইন তার সতীর্থ আমেরিকার হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ আসা গ্রে (১৮১০-১৮৮৮)-কে লেখা এক চিঠিতে নির্দ্বিধায় বলেন :

> "...নিরীশ্বরবাদীদের মত লেখার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু একথা স্বীকার করব যে অন্যরা যেমন সহজেই চারদিকে পূর্ব-পরিকল্পনা আর মঙ্গলময়তার সাক্ষ্য খুঁজে পায়, আমিও তা দেখতে চাই, কিন্তু পাই না। ...বিশ্ব যেন বড় বেশি দুর্গত বলে মনে হয়। আমি কিছুতেই নিজেকে বোঝাতে পারি না যে একজন মঙ্গলময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কেন এমনভাবে পরিকল্পনা করবেন যাতে ...বেড়ালরা ইঁদুরদের নিয়ে খেলা করবে? এটা যেহেতু মানতে পারি না, তাই চোখ জিনিসটাও যে সুনির্দিষ্টভাবে পূর্বপরিকল্পিত তা বিশ্বাস করার প্রয়োজন দেখি না।"[৮]

এমন কী, ঐ সময় জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান-দার্শনিক বলে পরিচিত জন হার্শেলের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের' সমালোচনা প্রসঙ্গে ডারউইন সুহৃদ চার্লস লায়েলকে একটি চিঠিতে (১ আগস্ট, ১৮৬১) লিখেছেন : "... জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তো একথা কখনো বলেন না যে ঈশ্বর প্রতিটি ধূমকেতু আর গ্রহের চলার পথ নির্দেশ করে দেন। ঈশ্বরই (জীবজগতে) প্রতিটি ভ্যারিয়েশন তৈরি করেছেন, এ মত মানতে হলে তো প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাপারটাই অকারণ হয়ে ওঠে, এবং শুধু তাই নয়, নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়টি বিজ্ঞানের আওতার বাইরে চলে যায়। ...আমার ভাবতে বেশ অবাক লাগে, হার্শেল কি মনে করেন, কোন পাহাড় শেষ পর্যন্ত কতটুকু উঁচু হবে সেটা ঈশ্বর আগে থেকেই হুকুম দিয়ে রেখেছেন?"[৯] ধর্মপ্রাণ বিজ্ঞানীদের জীবজগতে বৈচিত্র্যের মধ্যে পূর্বপরিকল্পনা, নক্সা, ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ খোঁজার প্রবণতার তীব্র বিরোধিতা করেছেন নিজের বিজ্ঞানচেতনা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তথ্যের আলোকে। মৃত্যুর তিন বছর আগে, ১৮৭৯ সালে জে ফর্ডিসকে লেখা এক চিঠিতে ঈশ্বর সম্পর্কে নিজের অবস্থান খোলসা করেন এভাবে :

> "In my most extreme fluctuations I have never been an Atheist in the sense of denying the existence of God. I think that generally (and more and more as I grow older), but not

[৮] http://www.darwinproject.ac.uk/entry-2814

[৯] আশীষ লাহিড়ী, *বিজ্ঞান ও মতাদর্শ*, কলকাতা, অবভাস, ২০০৯, পৃ ৬৯-৭০ এবং http://www.darwinproject.ac.uk/entry-3223

always, that an Agnostic would be the more correct description of my state of mind."[১০]

এক বছর পর (১৮৮০), ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী এডওয়ার্ড অ্যাভেলিং (Edward Aveling) '*The Student's Darwin*' নামের একটি বই লিখে ডারউইনকে উৎসর্গের জন্য চিঠি লিখে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। বইটি ছিল কট্টরভাবে ধর্মবিরোধী, র‍্যাডিকেল নাস্তিকতার ওপর লেখা। বইটির লেখক জৈববিবর্তন তত্ত্ব দ্বারা ধর্মীয়ভাবনাকে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডারউইন অ্যাভেলিং-এর এ ধরনের প্রচেষ্টায় রাজি হননি এবং তাঁকে চিঠি লিখে মত প্রকাশ করেছিলেন (১৩ অক্টোবর, ১৮৮০) : "It appears to me (whether rightly or wrongly) that direct arguments against Christianity & theism produce hardly any effect on the public; & freedom of thought is best promoted by the gradual illumination men's minds which follo[s] from the advance of science. It has, therefore, been always my object to avoid writing on religion, & I have confined myself to science." শেষে নিজের সম্পর্কে বলেন : "I may, however, have been unduly biased by the pain which it would give some members of my family, if I aided in any way direct attacks on religion." (দ্রষ্টব্য : Stephen Jay Gould, "A Darwinian Gentlenmen at Marx's Funeral," *Natural History*, September 1999)। এডওয়ার্ড অ্যাভেলিং হলেন কার্ল মার্কসের মেয়ে ইলিয়ানোর মার্কস (Eleanor Marx)-এর জীবনসঙ্গী।

ডারউইন সম্পর্কে এরকম একটি প্রচারণা রয়েছে : '*মার্কস ব্যক্তিগতভাবে ডারউইনকে তাঁর দ্যাস ক্যাপিটাল বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠিয়েছিলেন এবং বইটি তিনি ডারউইনকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডারউইন অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মার্কসকে চিঠি লিখে না করেন।*' যতদূর জানা যায়, ১৯৩১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পত্রপত্রিকাতে এ রকম একটি 'উড়ো-চিঠি'র খবর প্রথম ছাপা হয়েছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সাংবাদিক Francis Wheen-এর লেখা বহুল প্রচারিত কার্ল মার্কসের আত্মজীবনীতেও এ খবরটি প্রকাশ পায়।

১৯৭০ সালের দিকে ক্যালফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্গারেট ফায় (Margaret Fay) এবং লিউইস ফিউয়ার (Lewis Feuer) এডওয়ার্ড অ্যাভেলিং-এর '*ডারউইনের ছাত্র*' (The Student's Darwin, ১৮৮১ সালে প্রকাশিত) নামক অখ্যাত বইটি সামনে নিয়ে এসে 'ডারউইন-মার্কস প্রচারণা'র রহস্য উন্মোচন করেন। তারা জানান, '১৮৯৫ সালের দিকে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের কাছ থেকে ইলানোর মার্কস-এডওয়ার্ড অ্যাভেলিং কার্ল মার্কসের লেখা যাবতীয় চিঠিপত্র, কাগজপত্র উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ১৮৯৭ সালে অ্যাভেলিং ডারউইন-মার্কসকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেন, সেখানে ডারউইনের সাথে তার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথাও উল্লেখ করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ডারউইনকে লেখা চিঠি ও তার জবাব সংযুক্ত করে দেন।'[১১] পরবর্তীতে লোকমুখে-পত্রপত্রিকায় '*ডারউইনের ছাত্র*' বই উৎসর্গের বিষয়ে অ্যাভেলিংকে লেখা ডারউইনের এই চিঠির কথাই '*দ্যাস ক্যাপিটাল বইটি উৎসর্গ বিষয়ে মার্কসকে লেখা ডারউইনের চিঠি*' হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে। কার্ল মার্কস অবশ্য ডারউইনের জৈববিবর্তন তত্ত্বের একজন আন্তরিক অনুরাগীই ছিলেন। জৈববিবর্তন তত্ত্ব থেকে মার্কস তার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দর্শনের (বিশেষ করে শ্রেণী সংগ্রামের) জৈবিক ভিত্তি দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। ১৮৭৩ সালে দ্যাস ক্যাপিটাল বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের একটি কপি উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন ডারউইনকে ঠিক, তবে তাদের মধ্যে বই উৎসর্গের কোনো বিষয় ছিল না। ডারউইনও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে একটি জবাব দিয়েছিলেন মার্কসকে ঐ বছরের অক্টোবর মাসে :

"Dear Sir, I thank you for the honour which you have done me by sending me your great work on Capital; & I heartily wish that I was more worthy to receive it, by understanding more of the deep and important subject of political Economy. Though our studies have been so different, I believe that we both earnestly desire the extension of Knowledge, & that this is in the long run sure to add to the happiness of Mankind."

ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত, ফ্লোরিডা স্টেইট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক-জৈববিবর্তন-দার্শনিক মাইকেল রুজ (Machael Ruse, born 1940) *Darwinism Defended* (Addition-Wesley Publ. Co, London, 1982) গ্রন্থে জানিয়েছেন : 'ডারউইনের বাড়ির লাইব্রেরিতে *দ্যাস ক্যাপিটাল* বইটি তিনি পেয়েছেন। কিন্তু এই বইয়ের অনেকগুলো পৃষ্ঠার প্রান্তভাগ কাটা ছিল না (uncut)।' অর্থাৎ ডারউইন *দ্যাস ক্যাপিটাল* বইটি পুরোটা পড়েন নি। অধ্যাপক রুজের মতে, 'ডারউইনের 'জীবনের জন্য সংগ্রাম'কে যারা শ্রেণী সংগ্রামের সমার্থক মনে করতেন, তারা যে আদৌ ডারউইনের তত্ত্বকে বুঝতে পারেননি, তা ডারউইন ভালভাবেই জানতেন।' তাই হয়তো জৈববিবর্তন তত্ত্বকে মার্কসের সমাজ পরিবর্তনের দর্শনে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিলেন না, হয়তো সম্ভব নয় বলেও মনে করতেন। যাহোক, ডারউইনকে বিচার করতে হলে অবশ্যই সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে, খণ্ডিতভাবে বিচার করলে ডারউইনের প্রতি কোনোভাবেই ন্যায় বিচার করা হবে না।

পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাই। বিজ্ঞান গবেষণা আর আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা আমেরিকার জনসাধারণের উপর পরিচালিত ঈশ্বর বিশ্বাস আর জৈববিবর্তন তত্ত্বের প্রতি আস্থা নিয়ে বহু বছর ধরেই জরিপ হয়ে আসছে। এ রকম কিছু জরিপের চুম্বক অংশ তুলে ধরা হল : ১৯৯৬ সালের জরিপ হতে জানা গেছে, আমেরিকার শতকরা ৩৯ ভাগ

[১০] Letter to J. Fordyee reprinted in Gavin De Beer, "Further Unpublished Letters of Charles Darwin", *Annals of Science*, 14, 1958, p. 88

[১১] The Friends of Charles Darwin, Marx of Respect, http://friendsofdarwin.com/articles/2000/marx/ (accessed on 24th May, 2010)

বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, ১৯৯৭ সালের আরেক জরিপ হতে দেখা যায় শতকরা ৯৯ ভাগ বিজ্ঞানীই জৈববিবর্তন তত্ত্বকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন; এই বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেমন রয়েছেন ধর্মবিশ্বাসী, তেমনি সংশয়বাদী, নিরীশ্বরবাদী। তাদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্থানে জৈববিবর্তন তত্ত্ব কোনো অন্তরায় নয়।

আমেরিকার সাধারণ জনসাধারণের উপর পরিচালিত ২০০১ সালের গ্যালআপ জরিপ হতে দেখা যাচ্ছে শতকরা ৪৫ ভাগ মনে করে ঈশ্বর বর্তমান রূপেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন মাত্র ১০ হাজার বছর বা ঐ রকম কিছু বছর আগে। শতকরা ৩৭ ভাগ আমেরিকান মনে করে, খুব সরল অবস্থার জীবন থেকে মানুষ মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে বিবর্তিত হয়ে এসেছে; এবং এ প্রক্রিয়াটিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন ঈশ্বর। মাত্র ১২ ভাগ মনে করে ঈশ্বরের কোনো ধরনের ভূমিকা ছাড়াই মানুষ মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে বিবর্তিত হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে। ২০০৫ সালে পিউ গবেষণা কেন্দ্র (Pew Research Centre) হতে পরিচালিত জরিপে ফুটে উঠেছে, শতকরা ৪২ ভাগ আমেরিকান মনে করেন সময়ের শুরু থেকেই সকল জীব বর্তমান কাঠামোতেই সৃষ্টি হয়েছিল। শতকরা ৪৮ ভাগ মনে করেন মানুষ সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়েছে।[১২] ২০০৯ সালে ডারউইনের দ্বিশত জন্মবার্ষিকীর একদিন আগে প্রকাশিত গ্যালআপ জরিপ হতে জানা গেছে, শতকরা ৩৯ ভাগ আমেরিকান জনগণ জৈববিবর্তন তত্ত্বে আস্থা রয়েছে। ২৫ ভাগ জনগণের জৈববিবর্তন তত্ত্বে কোনো আস্থা নেই। অবশ্য শতকরা ৩৬ ভাগ কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেনি। এ জরিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন পাশের ওয়েব সাইট থেকে : http://www.gallup.com/poll/114544/darwin-birthday-believe-evolution.aspx। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান কোনো গণতন্ত্রের বিষয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠের মতের উপরও নির্ভরশীল নয়। বিজ্ঞান সম্পূর্ণ পরীক্ষণ-গবেষণা-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।

এবার আলো ফেলা যাক মুসলিম জনমানসে। ইউরোপ-আমেরিকার খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর মধ্যে জৈববিবর্তন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি গণমাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে প্রচারিত হলেও এ বিষয়ে বিশ্বের বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থান সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা ছিল না। অর্থাৎ ২০০৯ সালের আগ পর্যন্ত অন্তত এ বিষয়ে ইম্পিরিকল কোনো ডেটা কারো হাতে ছিল না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে (যেমন মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার কিছু দেশ) যেখানে গোটা বিজ্ঞানকে 'পশ্চিমা পণ্য' বিবেচনা করে আসছে শতাব্দীকাল ধরে, সেখানে আলাদা করে জৈববিবর্তন সম্পর্কে আলাদা করে কি ভাবনা আর থাকতে পারে, তা মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। এটা সহজেই বোধ্যগম্য এবং চাক্ষুস যে কোরান শরিফে বর্ণিত আল্লাহর সৃষ্টির বিবরণের সাথে জৈববিবর্তন তত্ত্বকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই দেখা হয়েছে এবং বিরুদ্ধ প্রচারণা চালানো হয়েছে। গেল বছর (২০০৯) যখন মানুষের পূর্বপুরুষ 'আর্ডি' (*Ardipithecus ramidus*) সম্পর্কিত গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হল, তখন আল-জাজিরা'র মত কথিত 'নিরপেক্ষ'-'উদারপন্থী' সংবাদসংস্থার (৩ অক্টোবর, ২০০৯) আরবি সংস্করণের ওয়েব সাইটে পরিবেশন করা হল সম্পূর্ণ ভুল বক্তব্য : '*আর্ডির ফসিল প্রমাণ করেছে ডারউইনের থিওরি ভুল ছিল। আর্ডির ফসিল গবেষকেরা জানিয়েছেন, আর্ডির আবিষ্কার নিশ্চিৎ করেছে শিম্পাঞ্জিসদৃশ কোনো পূর্বপুরুষ থেকে মানুষ বিবর্তিত হয় নি।*'

বাংলা ভাষায় ডারউইনের *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইটি প্রথম অনূদিত হয়েছে '*প্রজাতির উৎপত্তি*' শিরোনামে। ভাষান্তর করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ম. আখতারুজ্জামান। প্রকাশিত বাংলা একাডেমী থেকে ২০০০ সালে। পশ্চিম বঙ্গ থেকে ২০০১ সালে *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইয়ের ভাষান্তর করা হয়েছে দুই খণ্ডে। অনুবাদ করেছেন শান্তিরঞ্জন ঘোষ, প্রকাশ করেছে দীপায়ন। অর্থাৎ সারাবিশ্বের জ্ঞানের জগতে পচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টিকারী ডারউইনের এ বইটি বের হওয়ার প্রায় ১৪০ বছর পর বাংলা ভাষায় আমরা এর অনূদিত সংস্করণ পেয়েছি। অথচ আমরা হয়তো অনেকেই জানি না আরবি ভাষায় *অরিজিন অব স্পিসিজ* বইটি অনূদিত হয়েছে ১৯২০ সালের দিকে। যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন মিশরের ইয়াকুব সেরুউফ এবং ইসমাইল মাজহার।[১৩] পশ্চিমা মিডিয়া আর কতিপয় মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীর কারণে ইসলাম ধর্মের কঠোর অনুশাসন আর রক্ষণশীল ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে চারিদিকে, সে হিসেবে এই খবরটি একটু ব্যতিক্রমই বলা যায়।

প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞানীরা যদি ধর্মবিশ্বাসী-অবিশ্বাসী হওয়ার পরও জৈববিবর্তন তত্ত্বকে পরীক্ষণ-গবেষণা-প্রমাণের মাধ্যমে মেনে নিতে পারেন জীবজগতের বাস্তবতা হিসেবে তবে সাধারণ মানুষ পারবে না কেন? এর কারণ বহুমাত্রিক। ছোট করে বলা যায়, বিজ্ঞানীরা স্পষ্টই সমাজের প্রাগ্রসর পর্যায়ে রয়েছেন, জ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য নিমিষেই আহরণ করা তাদের জন্য মোটেও দুর্লভ বা অসম্ভব কিছু নয়। আর মেধা আর বুদ্ধির চর্চার কারণে কায়েমী শাসকগোষ্ঠীর রাজনীতি তাদের সহজে মতান্ধ করতে পারে না।

পার্থিব জগতের অভিজ্ঞতা, পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, গবেষণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় না। বিজ্ঞান মানবীয় আবেগ নিরপেক্ষ, গবেষণার মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সংঘাত ঐতিহাসিক কাল হতেই চলে আসছে। ধর্মের যূপকাষ্ঠে নির্যাতিত-নিগৃহীত হয়েছেন হাইপেশিয়া, ব্রুনো, গ্যালিলিওসহ কত শত মনীষী। '*অরিজিন অব স্পিসিজ*', '*ডিসেন্ট অব ম্যান*' গ্রন্থদ্বয় লেখার কারণে ডারউইনও কম নিগ্রহের শিকার হন নি। কিন্তু আজকের যুগের সামাজিক বাস্তবতা ভিন্ন। বিজ্ঞান এ যুগে মানুষের জীবনধারা, চিন্তার জগৎ এত ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে যে, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতীত একটি দিন অতিবাহিত

[১২] পিউ গবেষণার কেন্দ্রের জৈববিবর্তন সম্পর্কিত জরিপের তথ্য পাওয়া যাবে পাশের ওয়েব সাইটে : http://people-press.org/reports/display.php3?ReportID=254

[১৩] Ghassan F. Abdullah, New Secularism in the Arab World, http://www.ibn-rushd.org/forum/content3.htm.

করাই দুরূহ। ফলে ধর্ম নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বিজ্ঞানের সাথে আপোস করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ইতিমধ্যে 'বিজ্ঞানসম্মত' হয়ে ওঠার চেষ্টায় নিজের বিভিন্ন মতবাদ শুধরে নিচ্ছে বিভিন্ন ধার্মিকেরা। অর্থাৎ এ যুগে ধর্মবিশ্বাসের সাথে খাপ খায় না, কিংবা ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী বলে বিজ্ঞানের কোনো গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বাদ দেয়া বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা নিজের পায়ে কুড়াল মারার শামিল। জৈববিবর্তন তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান; ঔষধশিল্পে ব্যাকটেরিয়ার প্রতিষেধক নিয়ে গবেষণা, জৈবপ্রযুক্তি, আণবিক জীববিজ্ঞান ইত্যাদির মূল বিষয়ই হচ্ছে জৈববিবর্তন তত্ত্ব। এমতাবস্থায় ধর্ম-বিরোধী অপবাদ দিয়ে জৈববিবর্তন পাঠ ও গবেষণা বন্ধ রাখা দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক কিছু বয়ে আনবে না।